ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
সুনন্দ ভট্টাচার্য
জি. এ. ই. পাবলিশার্স
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট (ফ্ল্যাট নং-১১)
কলিকাতা-৭০০০০৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামের
শহীদদের স্মৃতির
উদ্দেশে

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশের অর্থ হল ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ক্রমবিকাশ। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি সব সময়ে এক রকমের ছিল না। প্রথমে ইংলণ্ডের বাণিজ্য পুঁজি, পরে শিল্প পুঁজি এবং শেষে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ও ফিনান্স পুঁজির যুগের অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি বদলেছে। সেই সঙ্গে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতেও পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন এসেছে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে গণ-আন্দোলনে উত্তরণ এই সাক্ষ্য বহন করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে, দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন গণ-আন্দেলনে সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি পর্বে গণ-আন্দোলন শুরু হয় নি। আঠারো শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষন ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের কৃষক, আদিবাসী ও নিম্নবর্গের গরীব মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্বের সূচনা করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। ১৮৫০-এর দশকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল গদিচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত সামন্ত প্রভুদের একটি অংশ, তাঁদের পিছনে কৃষক জনতার সংগ্রামী সমর্থন ছিল। ১৮৫৭-এ সিপাহীদের নেতৃত্বে মহাবিদ্রোহ ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত কাঁপিয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এ কথা ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে পুরাণো সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল এবং বুর্জোয়া, শ্রমিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, আধুনিক স্বাধীন পেশার মানুষ, বিভিন্ন স্তরের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ছাত্র প্রভৃতি নতুন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। সামন্ত, আধাসামন্ত ও ঔপনিবেশিক স্বার্থপুষ্ট মানুষেরা ছাড়া ভারতের শহর ও গ্রামের সমস্ত স্তর ও পেশার মানুষের ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছিল।

পরস্পরবিরোধী দু'টি বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাত ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিকাশের বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ভারতে সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীন বিকাশের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের শিল্প, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন পেশার স্বাধীন বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। স্বাধীন বিকাশের স্বার্থে ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতের পরিস্থিতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছিল এইরকম সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। বিকাশমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানের কাছে জার-শাসিত রাশিয়ার সামরিক পরাজয় ও জার শাসনে রাশিয়ায় প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব; বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা; পুঁজিবাদী বিশ্বে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থা এবং একই সময়ে নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের পরাজয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ে গণ-আন্দোলনের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশের অর্থ হল জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ক্রমবিকাশ। আন্তর্জাতিক অনুকূল ঘটনাবলীর বিকাশের ফলে, জাতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজনে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও আক্রমণের প্রত্যুত্তরে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন, হোমরুল আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে শ্রমিক-কৃষক-নৌ-সেনা-ছাত্র সমেত সর্বস্তরের মানুষের সংগঠিত আন্দোলনের ফলে ভারতীয়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংরাজী শিক্ষিত উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবদান নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের অবদান। জনগণ ইতিহাসের স্রষ্টা এবং তারাই ইতিহাসের মুখ্য আলোচ্য বস্তু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ক্রমবিকাশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল সর্বস্তরের জনগণ। অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্ব এবং আবেদন-নিবেদনমূলক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পর্বে জনগণের সংগঠিত ভূমিকা ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এবং বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে জনগণের সক্রিয় ও সংগঠিত অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও তার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দেশ ও বিদেশের কোনো কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যক্তিবিশেষের অবদান বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ব্যক্তি যতই প্রতিভাবান বা ক্ষমতাসম্পন্ন বা জনপ্রিয় হোন না কেন তিনি তাঁর পছন্দমত ইতিহাস বা গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেন না। অবশ্য সমাজেতিহাস ও অসাধারণ নেতার মধ্যে সম্পর্কটা নেহাতি যান্ত্রিক নয়। সমাজেতিহাসের বাস্তব অবস্থা এবং চাহিদা যেমন অসাধারণ নেতার সৃষ্টি করে; ঠিক তেমনি অসাধারণ নেতা পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের স্তর, আর্থ-সমাজ ব্যবস্থার চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবে গান্ধীজীর মত অসাধারণ নেতার উদ্ভব হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভারতের গ্রাম ও শহরের আপামর জনসাধারণের সমাবেশ ঘটেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি হবে সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে জাতীয় কংগ্রেসের তিন দশকের বেশি সময় লেগেছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত সময়কালে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্ব-শাসন অর্জন', 'আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণের জন্য স্বরাজ্য অর্জন' এবং পরিশেষে ১৯২৯ সালে 'পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে'র লক্ষ্যকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চের বাইরে বাংলার চরমপন্থী নেতারা ও জাতীয়-বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংশ্রব-বর্জিত পূর্ণ স্ব-শাসনে'র লক্ষ্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়। জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত কোন কোন আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল না। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সাড়া দিয়ে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিল তাকে অহিংস আন্দোলন বলা যায় না। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করে।

শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পদ্ধতিই স্বাধীনতা সংগ্রামে একমাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল না। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে তৃতীয় দশক পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়-বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করে বিদেশী শাসকদের উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয়-বিপ্লবীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম গণ-আন্দোলনকে পরিহার করে সন্ত্রাসবাদী পথে এগিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে বৈপ্লবিক সন্ত্রাস-বাদীদের অবদান স্বীকার করতেই হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাতীয়-বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস ভারতের বাইরে অব্যাহত ছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থবাহী কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী সমেত সমগ্র বামপন্থী আন্দোলন। বামপন্থী পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর্থনীতিক ও সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিশ্বে প্রথম সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই ভারতে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগঠনের উদ্ভব হলেও তিরিশের দশক থেকে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ ঘটতে দেখা যায়।

মোট কথা, প্রাক্-কংগ্রেস পর্বে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক-আদিবাসী আন্দোলন ও মহাবিদ্রোহ, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রাক্-১৯০৫ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেসের নরমপন্থী-চরমপন্থী নেতৃত্ব পরিচালিত স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন, বালগঙ্গাধর তিলক পরিচালিত হোমরুল আন্দোলন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ-আইন অমান্য 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী আন্দোলন, কংগ্রেসের বাইরে জাতীয়-বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী সমেত সমগ্র বামপন্থী আন্দোলন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম এবং যুব-ছাত্র আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতপাত, ধর্মীয় সম্প্রদায়, ভাষাগোষ্ঠীর তারতম্য নির্বিশেষে গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্ববোধের নীতির ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধের বিকাশ ঘটেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কাছে বিকাশমান জাতীয় ঐক্য একটা গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। জনসাধারণের এই ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য বিনষ্ট করবার জন্য বিদেশী শাসক ভাবনা চিন্তা শুরু করে। এর ফলে শুরু হয়েছিল 'বিভক্ত করে শাসন করার' সাম্রাজ্যবাদী নীতি।

এই নীতির ফলে অ-হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিভিন্ন নিষ্পেশিত পশ্চাদপদ জাতপাত ও বর্ণ, শহরের ব্যবসায়ী এবং সম্পদের অধিকারী বিভিন্ন স্বার্থ, জমিদার-সহ বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক শক্তি এবং দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হয়েছিল। কারণ ঐ সময় তারাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে ইংরেজ শাসকেরা 'হিন্দু-মুসলমানের' সমস্যাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের এই কৌশল ভারতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে কি বিপজ্জনক ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ তা অনুধাবন করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক অনুকূল ঘটনাবলী ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন-গুলিতে তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত হয় এবং তার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতন্ত্রের জয় এবং ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তর পর্বে সিপাহী মহাবিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তির প্রক্কালে ভারতের উত্তাল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব আন্দোলন এবং সর্বোপরি ১৯৪৬-এর ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ঐতিহাসিক বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনকে অকেজো করে দেয়।

আতঙ্কিত ব্রিটিশ শাসক ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় জনগণ ভারতের যে ঐক্য রক্ষার দাবিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই দাবি শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হল। যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে-ছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সকল রকমের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন

তাঁরা শেষ পর্যন্ত দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন পাঠক্রমে ভারতের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক-সাম্মানিক ও উচ্চতর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুমুখী দিকের আলোচনা-চক্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার আলোকে সহজবোধ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের ইচ্ছা জাগে। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ' তারই ফলশ্রুতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত 'বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব প্রকল্পে'র অধিকর্তার আমন্ত্রণে 'ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ'-এর উপর নিবন্ধ সহযোগে আমি বক্তব্য পেশ করি, সভায় উপস্থিত অধ্যাপক বন্ধুদের আলোচনায় উপকৃত হই।

তথ্যপুঞ্জের ভারে গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত না করে পরিশেষে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ-নির্দেশিকা সংযোজিত হল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের বঙ্গবিজয় থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এবং আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত ও আটক রাজবন্দীদের তালিকা পরিশেষে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বর্তমান গ্রন্থ পরিকল্পনা ও বিষয়-বিন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ স্মরজিৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে এবং শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক সনত বসুর সঙ্গে আলোচনা করেছি। পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছেন ডঃ কেশব চৌধুরী। গ্রন্থ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত করার জন্য অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী ও ডঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় সহৃদয় তাগিদ দিয়েছেন। আন্দামান ও সেলুলার জেলে নির্বাসনে আটক রাজবন্দীদের তালিকাটি শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পেয়েছি। নির্ঘণ্ট রচনায় সাহায্য করেছেন আমার ছাত্র শ্রীগোপীকিশোর ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতার আন্তরিক আগ্রহে ও এলেম প্রেসের শ্রীদুর্গা প্রসাদ মিত্র এবং পর্ষদ ও প্রেসের কর্মীবন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

সুচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ : মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনা পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন : গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব

সপ্তম অধ্যায়

বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব

নবম অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস

দশম অধ্যায়

১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংকট

প্রথম অধ্যায়

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

১ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শোষণের বনিয়াদ ও শাসনের সুবিশাল যন্ত্র রাতারাতি গড়ে ওঠে নি। সতের শতকের প্রথম দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম অবক্ষয় শুরু হয়। সেই সুযোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন সামন্ত স্বৈরাচারী শাসকরা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করে দেয়। ভারতে সামন্ত সমাজ ও অর্থনীতির চরম ভগ্নদশায় যখন এ দেশে নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ সতের শতকের প্রথম থেকে পুঁজিবাদী ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সুযোগে ভারতে ব্যাপক বাণিজ্য জাল বিস্তারে সাফল্য লাভ করল। শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ইংলণ্ড ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কায়েম করতে সমর্থ হল।

ইংলণ্ডের বাণিজ্য পুঁজির প্রতিভূ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন ও শোষণের ইতিহাস সুদীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে পরিব্যাপ্ত। ১৬০০-এ প্রথম সনদ থেকে ১৮৫৮-এর ঘোষণা পর্যন্ত ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকাল। এর মধ্যে ১৬০০ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত এই দেড়শো বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্য করে শক্তিশালী বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতে সম্প্রসারিত হয়। সতের শতক ছিল মূলত কোম্পানির অপ্রতিহত বাণিজ্য সম্প্রসারণের যুগ। এই সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহরগুলিতে কোম্পানি বাণিজ্য শাখা বিস্তার করে। যেমন, সুরাট (১৬১২), মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ ফোর্ট (১৬৩৯), বোম্বাই (১৬৬৯) এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে (১৮৯৬) কোম্পানির বাণিজ্যিক শাখাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় একশ বছর বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আঠার শতকের গোড়ার দিকে প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে ভারতে সুসংহত হয়েছিল। সতের শতক ছিল সম্প্রসারণের যুগ। তেমন আঠার শতক হল কোম্পানির ভারতের সুসংহতির যুগ।

আঠার শতকের মাঝামাঝি কোম্পানি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল অভিযান জোরদার করে। মুঘল সাম্রাজ্যের চরম ভগ্নদশা, অন্তর্ঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও প্রশাসনিক নৈরাজ্যের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭-এ পলাশীর যুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং সারা ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের মজবুত বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে।

একচেটিয়া বাণিজ্য ও আর্থিক সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খুব তাড়াতাড়ি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে দেয়। এইভাবে পলাশী যুদ্ধের তিন বছরের মধ্যে বাঙলা ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। একই সঙ্গে কোম্পানি ভারতের স্থানীয় সামন্ত শাসক, অভিজাত ধনী ও পুরানো জমিদারের সঞ্চিত বিপুল অর্থ ও ধনভাণ্ডার হস্তগত করে। মনে রাখতে হবে সতের ও আঠার শতকের এই দু'শো বছরে ভারত থেকে নজিরবিহীনভাবে নির্মম শোষণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে বিপুল ধন-ভাণ্ডার ও সম্পদ ইংলণ্ডে চালান দিয়েছিল সেগুলি ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ সুগম করেছিল।

ক. ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন

কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজ ভারত জয় করে এদেশে শাসন বিস্তারে ব্রতী হয় নি। সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতির স্বার্থে ইংরেজ এ দেশে প্রশাসনিক কাঠামো রচনা করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডের বাণিজ্য পুঁজির প্রতিনিধি। বাণিজ্য পুঁজির স্বার্থে ভারতের ঔপনিবেশিক প্রশাসন রচিত হোক এটাই ছিল পার্লামেণ্টের উপর কোম্পানির প্রবল চাপ। অপরদিকে ইংলণ্ডের উদীয়মান শিল্প পুঁজি অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল। সেজন্য শিল্প পুঁজির স্বার্থে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক-চেটিয়া বাণিজ্য অধিকার খর্ব করার দাবী উঠেছিল। সেই সঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজি বিকাশের অনুকূলে তৈরী করার জন্য পার্লামেণ্টের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ইংলণ্ডের বাণিজ্য পুঁজির সঙ্গে শিল্প পুঁজির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার লড়াই প্রতি-ফলিত হয়েছিল পার্লামেণ্ট প্রণীত প্রত্যেকটি ভারত শাসন সংস্কার আইনে। এই ক্ষমতার লড়াই চলেছিল ১৮৫৩ পর্যন্ত। পলাশী যুদ্ধ জয়ের ষোলো বছর পর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ ও ভারত শাসন সম্পর্কে প্রথম আইন প্রণয়ণে উদ্যোগী হয়। ১৭৭৩-এ প্রথম রেগুলেটিং আইন পাশ করা হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারত শাসন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে এই আইন কোম্পানির উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম রেগুলেটিং আইন কোম্পানির প্রাধান্য কমিয়ে ইংলণ্ডের রাজশক্তিকে (crown) ভারতের জন্য গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর চারজন পরিষদ সদস্য (councillors) ও কলকাতায় অবস্থিত সুপ্রিম কোর্টের বিচার-পতিদের নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছিল। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ সদস্যরা পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হলেও বাণিজ্য পুঁজির প্রতিভু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর (directors) অভিযোগ ক্রমে ব্রিটিশ রাজশক্তি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেল কোম্পানির পরিচালক-মণ্ডলীকে ভারত শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অবহিত করতেন এবং তাঁদের আদেশ নির্দেশ মেনে চলতেন। ১৭৭৩-র আইনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও বাণিজ্য পুঁজি ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল।

১৭৭৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত প্রায় প্রতি দশ বছর অন্তর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন সংক্রান্ত আইনের রদবদল করে যায়। ১৭৭৩-র রেগুলেটিং আইন পর্যালোচনা ও পুনঃ প্রণয়ণের সময় ইংলণ্ডের হুইগ দল কোম্পানির সঙ্গে রাজশক্তির মিতালিকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের উপর আঘাত বলে অভিহিত করে। তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সীমাহীন দুর্নীতিপরায়ণ বাণিজ্য সংস্থা বলে তীব্র সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী ফক্স আনীত ভারত বিলে (India Bill) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকানা ও পরিচালকমণ্ডলীর অবসান ঘটিয়ে সেই জায়গায় পার্লামেণ্ট নিযুক্ত কমিশনারদের দিয়ে ভারত শাসনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কোম্পানির তীব্র বিরোধিতায় ফক্সের বিল পার্লামেণ্টে পরাজিত হয়। পরাজয়ের পর ফক্স পদত্যাগ করেন এবং উইলিয়ম পিট ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন।

১৭৮৪-তে গৃহীত পিটের ভারত আইনে ছয় জন কমিশনার নিয়ে গঠিত নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (Board of Control) হাতে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক, অসামরিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। পিটের ভারত আইনে কোম্পানির অধীনে থাকা ভারতীয় ভুখণ্ডকে ব্রিটিশ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। এই আইন ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্রিটিশ রাজশক্তির মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় দুই দশক পিট প্রধানমন্ত্রী থাকেন। এই সময়ে 'ভারত প্রশ্ন'-টি ব্রিটিশ রাজনীতির প্রধান বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজির প্রতিনিধি হুইগ নেতারা কোম্পানি আমলের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে ১৭৮৮-তে

লর্ড সভায় আইনসম্মত প্রতিবিধানের (proceedings) কাজ শুরু করে দেন। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মারফত ইংলণ্ডের বাণিজ্য পুঁজির নজিরবিহীন ভারত শোষণ ও লুণ্ঠনের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সম্ভবত এই সব কারণে ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজির প্রতিনিধি উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী শেষ পর্যন্ত বেশী দূর অগ্রসর না হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বেকসুর খালাস করে দেয়। কারণ হেস্টিংস অপরাধী প্রমাণিত হলে সামগ্রিক ভাবে ব্রিটিশের ভারত নীতি কাঠগড়ার আসামী হয়ে যায়। অবশ্য জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং ১৮৮৮-তে কর্ণওয়ালিশকে ভারতে গভর্ণর জেনারেল করেন।

গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কর্ণওয়ালিশ ভারতের মোটা মাইনের পদস্থ অফিসার-দের মধ্যে চরম দুর্নীতি দমনে অগ্রণী হয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কারে মনোযোগ দেন। তিনি পূর্বেকার নৈরাজ্যময় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারে অগ্রণী হন। ১৭৯৩ সালে তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে বাঙলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা (Permanent Land Settlement) প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় জমিদাররা চিরস্থায়ী ভাবে পুরুষানুক্রমিক জমির মালিকানা লাভ করল। জমিদারদের দেয় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ হবে ১৭৯০-এ সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের নয়-দশমাংশ। ভূমি খাজনা সংগ্রহের প্রকৃত পরিমাণ নির্বিশেষে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য ১৭৯০-এর সূচকে নির্দিষ্ট থাকবে। নির্দিষ্ট রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে না পারলে জমিদারী নিলামের ব্যবস্থা করা হল।

চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থায় কৃষকের জমির উপর সামন্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে জমিদারকে স্থায়ীভাবে জমির মালিক করা হল। নিলামে জমিদারি বিক্রি হয়ে গেলে নতুন জমিদার পুনরায় কৃষকদের উপর নতুন খাজনা ধার্য করতে পারত। কার্যতঃ জমিদাররা বিরাট জমির ছোট ছোট জোতের খাজনা আদায়ের অনিশ্চয়তা এড়ানোর জন্য জমির পত্তনি দিতে শুরু করল। পত্তনিদাররা নিজের হাতে চাষ করত না। তারা নতুনভাবে খাজনা আদায়ের জন্য অন্যকে আবার পত্তনি দিত। এইভাবে জমিতে একই স্বত্বের উপর অন্য স্বত্ব চাপিয়ে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, ইজারাদার, ছে-ইজারাদার প্রভৃতি নানা স্তরের মধ্য স্বত্বভোগীর (sub-infeudation) উদ্ভব ঘটেছিল।

১৭৯৩-এর চার্টার আইন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুযোগ সুবিধা আরো কুড়ি বছর বাড়িয়েছিল। ঠিক তেমনি ১৮১৩-এর চার্টার আইন কোম্পানির বিশেষ সুবিধার

মেয়াদ আবার বিশ বছরের জন্য বাড়িয়ে দিল। সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে চা বাণিজ্য ছাড়া সর্বত্র কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অবসান ঘটানোর তাৎপর্য হল ভারত এখন থেকে সরাসরি ব্রিটিশ শিল্প পুঁজির অবাধ শোষণের উপনিবেশে পরিণত হয়ে গেল।

কোম্পানির বিশেষ সুবিধার মেয়াদ আরো কুড়ি বছর বাড়িয়ে ১৮৩৩-এর চার্টার আইন চীনে কোম্পানির একচেটিয়া চা বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রধানত বাণিজ্য সংস্থা হলেও ভারতে এই সংস্থা কার্যত সরকারের মর্যাদাসম্পন্ন শাসন ক্ষমতা পরিচালকের ভূমিকা পালন করত। কিন্তু সরকারের ভূমিকায় কোম্পানি প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। সমস্ত ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা শম্বুক গতিতে চলতে থাকে। ভারত থেকে একটা চিঠি ইংলণ্ডে পৌঁছুতে ছয় থেকে আট মাস সময় লেগে যেত। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা ও অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় আইন প্রচলিত থাকায় ঔপনিবেশিক প্রশাসন প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সেজন্য সারা ভারতের জন্য একই ধরনের আইন প্রণয়ণের নির্দেশ আসে এবং সেই উদ্দেশ্যে উদারনৈতিক ঐতিহাসিক টি বি মেকলেকে নবগঠিত আইন কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। শিল্প পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশের স্বার্থে উদীয়মান ব্রিটিশ বুর্জোয়া সারা ভারতে ঐক্যবদ্ধ আইন প্রণয়ণ ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছিল অনেক দিন ধরে এবং সেই কারণে ভারতে আধুনিক আইন প্রণয়ণের তাগিদে মেকলের নিয়োগ ত্বরান্বিত করা হল।

১৮৫৩-র চার্টার আইন ভারতে কোম্পানির প্রশাসন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে পার্লামেণ্ট ও কোম্পানির দ্বৈত শাসন অব্যাহত রাখল। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাল। এখন থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করল। ব্রিটিশ শিল্প পুঁজি এবং পরে ফিনান্স পুঁজি ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। ১৮৫৮, ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫-এর ভারত শাসন সংস্কার এই সাক্ষ্য বহন করে।

২. ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ

করা যায়। প্রথম পর্বে 'পুরানো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার' প্রাধান্য দেখা যায়। অর্থাৎ প্রথম পর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতে বাণিজ্য পুঁজি ও একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ অব্যাহত ছিল। মোটামুটিভাবে আঠারো শতককে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ বলা হয়। উনিশ শতকে নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শিল্প পুঁজি পরিচালিত অবাধ বাণিজ্যের যুগ অব্যাহত ছিল। শিল্প পুঁজি পরিচালিত অবাধ বাণিজ্যের সময়কালকে ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দ্বিতীয় পর্ব বলা হয়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তৃতীয় পর্বে ফিনান্স পুঁজির প্রাধান্যে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ভারতে প্রকট আকার ধারণ করে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে তৃতীয় পর্বে ফিনান্স পুঁজি পরিচালিত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রাধান্য শুরু হয়। ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের প্রাক্কাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ফিনান্স পুঁজির শোষণ অব্যাহত ছিল।

ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বিকাশে তিনটি সুস্পষ্ট পর্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে ব্রিটেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ধারাগুলি। অর্থাৎ, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল ভারতের স্বার্থে নয়। এই বিকাশ ইংলণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদেই ঘটানো হয়েছিল।

ক প্রথম পর্ব : বাণিজ্য পুঁজি ও একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রাধান্য

প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পরিচালিত বাণিজ্য পুঁজি (merchant capital) ও একচেটিয়া বাণিজ্যের (monopoly trade) সময়কালকে পুরানো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। বাণিজ্য পুঁজির প্রতিনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল সাগরপারের দেশে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার অর্জন করে যথাসম্ভব মুনাফা করা। আঠারো শতকে ব্রিটিশ পণ্যের জন্য বাজার খুঁজে বার করার পরিবর্তে ইউরোপ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতে উৎপন্ন তুলার কাপড়, সিল্ক ও মশলা রপ্তানি করাটা অধিক লাভজনক ছিল। কারণ, ইংলণ্ড ও ইউরোপে ভারতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজার ও চাহিদা যথেষ্ট ছিল। অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়েছেন কোম্পানির আমলে ভারতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ড ও ইউরোপে রপ্তানি করাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানিভিত্তিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে তিনি 'পুরানো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা' বলেছেন।

আঠারো শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনে শিল্প পুঁজির সম্প্রসারণ ঘটতে দেখা

যায়। ভারত থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিপুল অর্থ লুণ্ঠন করার ফলে ব্রিটেনের পুঁজি ভাণ্ডার যথেষ্টভাবে বেড়ে যায়। তার ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটানোর যে মূলধন সঞ্চয় একান্ত আবশ্যিক হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান উৎস ছিল ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদ। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে কলকারখানার অভাবনীয় সম্প্রসারণ ঘটলে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাটি অতিকায় আকার ধারণ করে। তার ফলে ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার খোঁজাই সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের রাজনীতিতে শিল্পপতিদের প্রাধান্য স্বীকৃত হল।

শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটেনে বাণিজ্য পুঁজির সঙ্গে শিল্পপুঁজির সংঘাত শুরু হয়। বাণিজ্য পুঁজির স্বার্থ হল ভারত সমেত উপনিবেশগুলিতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অব্যাহত রাখা। শিল্প পুঁজির স্বার্থ হল উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং শিল্প পুঁজির স্বার্থে উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল যোগানের দেশে পরিণত করা। ১৭৭০ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে বাণিজ্য পুঁজির সঙ্গে শিল্প পুঁজির তীব্র সংঘাত চলেছিল। যার প্রতিক্রিয়া ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পড়তে দেখা যায়। শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটেন পুঁজিবাদী বিকাশের শীর্ষপর্যায়ে উঠতে শুরু করে।

ব্রিটেনে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের জন্য কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজন হল প্রভূত পরিমাণ পুঁজির। ব্রিটেনে এই পুঁজি যথেষ্ট ছিল না। সেজন্য ব্রিটেনের বাণিজ্য পুঁজি বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনে প্রয়াসী হয়। সতেরো শতকের পঞ্চাশ দশকে বাংলা ও দক্ষিণ ভারত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্যে চলে আসে। তার ফলে এই অঞ্চলগুলির রাজস্ব সরাসরিভাবে কোম্পানির কাছে চলে যায়। ব্রিটেনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশে ভারতীয় অর্থসম্পদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের সেই সময়কার জাতীয় আয়ের প্রায় দুই-শতাংশ ছিল ভারতীয় অর্থসম্পদ।

ভারতীয় বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকার লাভ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করে। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা কোম্পানির কাছে তাদের তৈরী পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কালক্রমে তারা নামমাত্র মজুরীতে কোম্পানির বাণিজ্য সংস্থায় ভাড়া খাটতে থাকে।

বাণিজ্য পুঁজি শোষণের যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অর্থনীতি পঙ্গু

করার কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রথমত, ভারতের অর্থসম্পদের প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন; দ্বিতীয়ত, সেচ ব্যবস্থায় চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন; তৃতীয়ত, জমিদারী প্রথা প্রবর্তন; চতুর্থত, ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানী বন্ধ করার জন্য শুল্ক প্রবর্তন।

খ. দ্বিতীয় পর্ব : শিল্প পুঁজি ও অবাধ বাণিজ্যের যুগ

১৮১৩ থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮১৩-এ ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঠিক তেমনই, এই সময় থেকে ব্রিটিশ শিল্প পুঁজি ভারত শোষণের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করে! এই সময় ভারতে কোম্পানির যে অধিকার রইল তা আগেকার তুলনায় কিছুই নয়। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল ব্রিটিশ সরকার এবং সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শিল্প পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত হল। কোম্পানি আমলে ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের কোন সম্পর্ক ছিল না। সেজন্য ১৮১৩-এর পর ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিল। অর্থাৎ, এই সময় থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শিল্পপুঁজির স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে প্রয়াসী হল।

শিল্প পুঁজির স্বার্থে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভারতকে ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজারে পরিণত করা এবং সেই সঙ্গে ব্রিটেনের কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলা। ব্রিটেনের শিল্প পুঁজির স্বার্থে ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে আরও নিবিড়ভাবে প্রবেশের জন্য রেলপথ প্রতিষ্ঠা, পথঘাটের উন্নতি, কোম্পানি আমলে অবহেলিত সেচব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া শুরু হল। এই সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও ভারতের সর্বত্র এক ধরনের ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রশাসনিক স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষার সীমিত সূচনা ও ইউরোপীয় ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। মনে রাখতে হবে, কোন সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সীমিত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ঐক্য প্রভৃতি প্রবর্তন করে নি। এগুলি সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয়দের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে আরো বিজ্ঞান সম্মত কায়দায় শিল্প পুঁজির স্বার্থে ভারত শোষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটেনের শিল্প পুঁজির ভারত শোষণের লক্ষ্য ও পদ্ধতিগুলি বাণিজ্য পুঁজি হতে পৃথক ছিল। সরাসরি রাজস্ব নিয়ে অথবা ভারতে উৎপন্ন পণ্য

রপ্তানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার অর্জন করাকে ব্রিটিশ শিল্প পুঁজি আদৌ লাভজনক মনে করে নি। কারণ, ব্রিটেনের যন্ত্রচালিত কলকারখানার পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল। সেগুলিকে বিদেশে রপ্তানি করার জন্য বিশ্ব-বাজারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভারতের মত বিশাল দেশে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের ঔপনিবেশিক বাজার সুনিশ্চিত করাই শিল্প পুঁজির আশু লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিত কলকারখানার জন্য কাঁচামালের সরবরাহ প্রয়োজন। ব্রিটেনের শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই দুটি প্রয়োজনের তাগিদে ব্রিটিশ শিল্পপুঁজি ভারতকে 'আদর্শ উপনিবেশে' পরিণত করে। অর্থাৎ, ব্রিটেনের স্বার্থে ভারতকে পরাধীন উপনিবেশে পরিণত করে কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হল। এই সঙ্গে ভারতকে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের স্থায়ী ঔপনিবেশিক বাজারে পরিণত করা হল।

আদর্শ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় ভারতে তার সূত্রপাত হয় ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে। এই সময় দেখা গেল ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। ভারতের শিল্পজাত পণ্যের, বিশেষ করে তুলাজাত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, পশ্চিম ভারতের ক্যালিকো, কাশ্মীরের শাল ও কার্পেট, বিহারের গন্ধক, প্রভৃতির প্রচুর চাহিদা ছিল ইউরোপে। ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজির স্বার্থে ভারতের এই শিল্পগুলো সমূলে ধ্বংস করে এখানকার সুবিশাল বাজারটি ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের জন্য দখল করা হল।

এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতে অসম শুল্ক-নীতি প্রবর্তন করল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, পঁচিশ বছরে এই অসম শুল্ক শতকরা দশ ভাগ থেকে আরম্ভ করে হাজার ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। অসম শুল্কের জাঁতাকলে ভারতের দেশীয় শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। এইভাবে প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্যে শিল্প পুঁজির স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভারতের বাজারে ব্রিটেনের পণ্য-দ্রব্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং ভারতের নিজস্ব শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে গেল।

ব্রিটেন থেকে আমদানী করা যন্ত্রশিল্পে তুলাজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ভারতীয় তাঁতিদের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলল এবং সেই সঙ্গে সুতো প্রস্তুতকারী জোলাদের জীবিকা নষ্ট করে দিল। রজনী পাম দত্ত দেখিয়েছেন যে, ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত ব্রিটেন থেকে ভারতে সুতা রপ্তানির পরিমাণ পাঁচ হাজার গুণ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, সিল্ক ও পশমজাত দ্রব্য, লোহা, মৃৎশিল্প, কাঁচ ও কাগজের ক্ষেত্রেও ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়।

ফলে পশ্চিম ভারতের সুরাট, বাংলা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শিল্প সমৃদ্ধ শহরগুলির অধিবাসীদের দুর্দশা চরম হয়ে পড়ল। ১৭৫৭-এ ক্লাইভ যে মুর্শিদাবাদ শহরকে লণ্ডন শহরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, ১৮৪০-এ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কল্যাণে সেই শহর শ্মশানে পরিণত হল। যুগ যুগ ধরে তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করে যে অসংখ্য কারিগর জীবিকা নির্বাহ করত তারা শহর ছেড়ে গ্রামে ভিড় বাড়াল।

ভারতীয়ের ক্রয়ক্ষমতা অন্তত কিছুটা বাড়াতে না পারলে ব্রিটিশ পণ্যের জন্য ভারতে বাজার সৃষ্টি করা যাবে না। সেজন্য শিল্পপুঁজির সংকীর্ণ স্বার্থে ভারতের আর্থিক সম্পদ সৃষ্টির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে চেষ্টা চলতে থাকল। আঠারো শতকের শেষের দিকে নীল চাষের জন্য বৃটিশ পুঁজি উদ্যোগী হয়। ১৮৫০-এ ভারত থেকে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে নীল একটি প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে। ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার জন্য ১৮৩৩ থেকে ইংরেজরা জমি-জায়গা কিনে ক্ষেতখামার গড়ে তুলতে থাকে। এই সব খামারে চা, কফি ও রবারের চাষ শুরু হয়। ১৮৩৩-এর পর কাঁচা তুলা, পশম, তিসি, পাট ও খাদ্য-শস্যের রপ্তানীও বেড়ে যায়।

ব্রিটেনের লোহা ও ইস্পাত কারখানার মালিকেরা ভারতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্মাণে আগ্রহ দেখায়। শিল্প পুঁজির স্বার্থে এবং সামরিক স্বার্থে ১৮৫৩-এ রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। ১৮৫৪-এ কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জে কয়লা-খনি অঞ্চলে পর্যন্ত রেলপথ বিস্তার লাভ করে। এইভাবে ব্রিটেনের শিল্পপুঁজির স্বার্থে ভারতকে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার প্রয়াস শুরু হয়।

ভারতে রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থার 'ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য'। কারণ যে দেশে লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের গতিপথে যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন বাষ্পচালিত যোগাযোগ ব্যবস্থার 'মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্র শিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই'। এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। রেলপথ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটে। সেই সঙ্গে ভারতে সম্পূর্ণ দুটি আধুনিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল ঃ বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণী।

ব্রিটিশ শিল্প পুঁজির স্বার্থে ভারতীয় ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ধ্বংসকারী

প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। যেমন, শিল্প প্রধান শহরগুলির ধ্বংসসাধন, কৃষির উপরে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি, নির্মমভাবে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ এবং সমগ্র শিল্প কারিগরকে বৃত্তিচ্যুত করে কৃষিকার্য গ্রহণে বাধ্য করা।

ব্রিটিশ শিল্পপুঁজি ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য করে রজনীপাম দত্ত বলেছেন: 'The millions of ruined artisans and craftsmen, spinners, weavers, potters, melters, smiths, alike from the towns and from the villages, had no alternatives save to crowd to agriculture. In this way, India was forcibly transformed, from being a country of combined agriculture and manufactures, into an agricultural colony of British manufacturing capitalism'.

গ তৃতীয় পর্ব: আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও ফিনান্স পুঁজির যুগ

১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থান দমনের পর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি নতুন আকার ধারণ করে। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে; এই সময় থেকে কোম্পানির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাণিজ্য বুর্জোয়ার কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং শিল্প বুর্জোয়ার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ও শোষণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে অবাধ মূলধনের (free trade capital) শোষণের পরিবর্তে ফিনান্স পুঁজির শোষণ শুরু হয়। ফিনান্স পুঁজির শোষণ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটায় নি। বরং ফিনান্স পুঁজি ভারতে আরও আধুনিক, নিখুঁত ও সর্বগ্রাসী শোষণের সুনিপুণ জাল সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক পরিবহন ও রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সারা ভারতকে একটি অখণ্ড ঔপনিবেশিক শোষণের বাজারে পরিণত করা হয়েছিল।

মোটামুটিভাবে বলা যায় মহাবিদ্রোহ দমনের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ফিনান্স পুঁজির ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবে ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। এই সময় থেকে যন্ত্রশিল্পভিত্তিক উৎপাদন ও পুঁজির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের একাধিপত্যের অবসান ঘটে। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রশিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সুদৃঢ় বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিণ যুক্ত-

রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলির পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার অনুসন্ধানের তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের শেষ দিকে বিজ্ঞানকে যন্ত্রশিল্পের কাজে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ফলে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। দ্রুত গতিতে প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক যন্ত্রশিল্পের প্রসার শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কাঁচামালের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে। তার ফলে সারা বিশ্বব্যাপী কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য-এর ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে কৃষিজ ও খনিজ যে সব কাঁচামাল রয়ে গেছে সেগুলি ব্যাপকভাবে সংগ্রহের জন্য শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তৃতীয়ত, আফ্রিকা এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন এবং এই সব দেশগুলি-তে ঔপনিবেশিক বাজারের সম্প্রসারণ উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির হাতে অপরিসীম পুঁজি এনে দিয়েছিল। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ব্যাংকে, করপোরেশনে এবং ট্রাস্টে পাহাড় প্রমাণ পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল। তার ফলে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে এমন কিছু উৎপাদক সংঘের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে অপরিসীম উদ্বৃত্ত পুঁজি দেশে দেশে খাটানো বা রপ্তানি করার প্রয়োজন দেখা দিল।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ফিনান্স পুঁজির যুগে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানি ও নিয়োগের কাজটি শুরু হয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফিনান্স পুঁজির যুগ শুরু হয় এবং এই শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমে ভারতে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তরটি খুলে যায়। রজনী পাম দত্ত বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই পুঁজি নিয়োগকে পুঁজি রপ্তানি বলা হয়। কিন্তু ভারতের বেলায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে যদি ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানি বলে চালানো যায়, তাহলে সেটা বাস্তবের এক তীব্র বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই বলা হবে না।

প্রকৃত ঘটনা হল, যে পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানি হয়েছিল তা নিতান্তই অল্প। ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত ব্রিটেন থেকে ভারতে যে পরিমাণ পুঁজি রপ্তানি করা হয়েছিল তার চেয়ে ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে প্রেরিত করের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজি ভারতের বুকে বসেই ভারতীয় জনগণকে লুঠ করেই প্রথমে তোলা হয়েছিল। রজনীপাম দত্ত বলেছেন, 'the British capital invested in India was in reality first raised in India from the plunder of the Indian people, and then written down as debt from the Indian people to Britain...'। ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি

নিয়োগের উৎস হল জনঋণ (public debt)। ১৮৫৮-এ ব্রিটিশ সরকার যখন সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল, তখন তারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সাতশো লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করল। ১৯০০-এ জনঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ২২৪০ লক্ষ পাউণ্ডে। চল্লিশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৯-এ এই ঋণের পরিমাণ দাড়াল ৮৮৪২ লক্ষ পাউণ্ড।

এই ভাবেই ভারতীয়ের ঘাড়ে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল। রেলপথ নির্মাণের ফলে এই ঋণের বোঝা আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল। রেলপথ নির্মাণে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যে টাকাটা খরচ করেছিল ব্রিটিশ সরকার তার উপর শতকরা ৫ টাকা সুদের গ্যারাণ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চা, কফি এবং রবারের চাষ ও ছোটখাটো আরও কয়েকটা শিল্পের বিকাশের সঙ্গে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে বেসরকারী ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগ ভাল ভাবেই অগ্রসর হয়েছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা অবসানের পর ভারতে বেসরকারী ব্রিটিশ ব্যাংক গড়ে উঠল। এই ব্যাংকগুলিকে বিনিময় ব্যাংক (exchange bank) বলা হত। ব্রিটিশ ব্যাংকগুলির সদর দপ্তর ছিল গ্রেটব্রিটেনে। ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই ব্যাংকগুলি ভারতের অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে এদেশে আধুনিক শিল্পের কোন উন্নতি হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজির প্রায় সবটাই খাটত সরকার, পরিবহন, কৃষি ও অর্থ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে। সোজা ভাষায়, বাণিজ্যের দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করা এবং কাঁচামালের উৎস ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসাবে ভারতকে শোষণ করার জন্যই ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগের সঙ্গে ভারতের শিল্পোন্নতির কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ ব্যাংক পুঁজি কর্তৃক ভারত শোষণের কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও ১৯১৪-এর পর এই শোষণ আরো তীব্র হয়।

১৯১৪-১৮-এর পর ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগ অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে। ১৯২৯-এ ব্রিটিশ পুঁজির লগ্নীর পরিমাণ ছিল সাত লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩০-এ ব্রিটিশ পুঁজির লগ্নী দশ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াল। ব্রিটেনের মোট বিদেশী লগ্নীকৃত পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতে নিয়োগ করা হয়েছিল। ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণ বিশ্লেষণ করে রজনীপাম দত্ত মন্তব্য করেছেন,

ফিনান্স পুঁজির আওতায় ভারতকে তীব্রতরভাবে শোষণের মধ্যেই এই দেশের ঘনীভূত সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের মূল কারণটি নিহিত রয়েছে।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও ফিনান্স পুঁজি শোষণের যুগে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির রপ্তানি ও বিনিয়োগ বেড়েছিল। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে গড়ে ওঠা ভারতীয় অর্থনীতি একান্ত ভাবেই ঔপনিবেশিক। ভারতীয় উদ্যোগে কিছু বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠলেও ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্রটি ঠিক ছিল। কারণ ভূমি-ব্যবস্থায় সামন্ত ও আধা-সামন্ত সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয় নি। ভারতের ভারী ও মূল শিল্পের কোনরকম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় নি। রজনীপাম দত্ত বলেছেন, 'India shows the typical inverted economic development of a dependent colonial country'। ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নটি ফিনান্স পুঁজির আমলে কোন অগ্রাধিকার পায় নি। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মূল ভিত্তি ছিল কৃষিক্ষেত্রে সামন্ত ও আধা-সামন্ত সম্পর্ক জিইয়ে রাখা।

ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বনিয়াদ ক্রমশ গড়ে উঠেছিল বাণিজ্য পুঁজি ও একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগে, শিল্পপুঁজি ও অবাধ বাণিজ্যের যুগে এবং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও ফিনান্স পুঁজির যুগে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সূত্রে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। ভারত পরাধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশ হওয়ায় বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অসম সদস্য হিসাবে স্থান গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে ভারত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারে নি। ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল এবং সেই অবস্থায় অসম সদস্য হিসাবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে স্থান পেয়েছিল।

৩ স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্ব

আঠারো শতকে কোম্পানি বিরোধী বিদ্রোহ

কোম্পানির শাসন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ শাসন ভারতের স্বাধীন সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। অর্থাৎ, ব্রিটেনের বাণিজ্য পুঁজি, পরে শিল্প পুঁজি ও ফিনান্স পুঁজি ভারতে স্বাধীন কৃষি ও শিল্প

অর্থনীতি বিকাশের পথে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়। সেজন্য ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বলা হয়। কোম্পানি আমলে ভারতের স্বাধীন সমাজ বিকাশের ধারা যত বেশি বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই কোম্পানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধে, সময়মত সেই চাপা বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতীয়ের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের প্রকৃতি এবং চরিত্র সব সময় এক ছিল না। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী কোম্পানি শাসনের আমলে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর ধূমায়িত বিক্ষোভ কোম্পানি বিরোধী বিদ্রোহে ফেটে পড়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বৈরাচারী ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের কৃষক, আদিবাসী ও বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী মানুষ মাথা পেতে নেয় নি। কোম্পানি শাসনে হৃতসর্বস্ব পুরানো আমলের জমিদাররা কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সামিল হয়েছিল। সেজন্য বলা যায় যে আঠারো থেকে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের কৃষক, আদিবাসী, শ্রমজীবী মানুষ ও পুরানো জমিদারদের এক অংশ কোম্পানির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান ঐতিহ্য এইসব বিদ্রোহগুলির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়।

ক দিনাজপুর–রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ

১৭৮০-তে দিনাজপুরের নাবালক জমিদারকে পরিচালনার জন্য কোম্পানি দেবী সিংহকে এজেন্ট নিযুক্ত করে। এই দেবী সিংহ আবার রংপুরের বিরাট অঞ্চলে ১৭৮১-তে কোম্পানির ইজারাদার নিযুক্ত হয়। ইজারাদারি পেয়ে দেবী সিংহ ভাড়াটে লোকের সাহায্যে কৃষকদের উপর জুলুম শুরু করে দেয়। খাজনার নামে অবৈধ কর আদায় করতে থাকে। করভারে জর্জরিত কৃষকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আবেদনপত্র পেশ করে। দেবী সিংহ ভাড়াটে লোক মারফত পাঁচ আনা হারে এক ধরনের বে-আইনী খাজনা ও তিন আনা হারে বাটা কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে থাকে। বছরে জমে থাকা খাজনা ও বাটার উপরে আরো দু আনা হারে কর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৮৪-তে কোম্পানি নিযুক্ত কমিশন দেবী সিংহের কৃষকদের উপর অত্যাচার ও বে-আইনী খাজনা আদায়ের জুলুম স্বীকার করল। এই সময় রংপুরের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে ওঠে। ফলে কৃষক ও গরীব মানুষ শিল্প ও কৃষি পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা বন্ধ করে দিল। দেবী সিংহের চাপিয়ে দেওয়া

বে-আইনী কর খাজনা তারা আর দিতে পারল না। সেজন্য দেবী সিংহের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কৃষকরা খাজনা আদায়কারীদের ঘেরাও করে কয়েকজনকে হত্যা করল। তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৭৮৩-তে দেবী সিংহের সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই আশেপাশের জেলাগুলিতে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করে। অসংগঠিত বিদ্রোহীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নেতাকে "নবাব" বলে ঘোষণা করেছিল।

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির সরকার ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠায়। বিদ্রোহী কৃষক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই হল। শেষ পর্যন্ত বিটিশের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে কৃষক বিদ্রোহীরা পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হল। এই সংঘর্ষে অনেক বিদ্রোহী কৃষক প্রাণ দিয়েছিল।

খ. মেদিনীপুর—বাঁকুড়া : চোয়ার বিদ্রোহ

আঠার শতকের শেষের দিকে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ ইতিহাসে চোয়ার-বিদ্রোহ নামে সুবিখ্যাত। চোয়ারেরা ছিল জঙ্গলের অধিবাসী, কৃষিজীবী মানুষ। সমাজের তথাকথিত নিম্ন-বর্ণের গরীব লোক। মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাণীর জমিদারিতে পাইকরা বহুকাল ধরে পাইকান জমি ভোগ-দখল করত। কোম্পানির আমলারা পাইকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে খুব চড়া হারে খাজনা ধার্য করল। এর ফলে কৃষক, পাইক, জমিদার প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা সবাই কোম্পানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৭৯৯ সালের এই বিক্ষোভ চোয়ার বিদ্রোহ নামে সুবিখ্যাত।

এই বিদ্রোহের আগুন মেদিনীপুর শহর ও তার কাছাকাছি একশ'র বেশী গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকারী প্রশাসনও খাজনা-সংগ্রহ ব্যবস্থাকে একেবারে বিকল করে দেয়। কোম্পানির সরকারী সূত্রের অনুমান যে কর্ণগড়ের রাণী ও নাড়াজোলের রাজারা পিছন থেকে বিদ্রোহী-দের গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মদত দিয়েছে। সরকারের মতে বিদ্রোহীদের রীতিমত সাহায্য ক'রে জমিদারেরা পাইকান জমি ফিরে পেতে চায়, সেই সঙ্গে কোম্পানিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে কম খাজনায় জমিদারী বন্দোবস্ত করতে চায়।

কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের কৃষক, পাইক, সর্দারের বিদ্রোহী কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্ণগড়ের রাণী, নাড়াজোল

জমিদারের আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কলকাতার কর্তৃপক্ষ বিচারের জন্য আটক জমিদারদের মেদিনীপুরে পাঠালে তারা পুনরায় বিদ্রোহীদের ইন্ধন জোগায়।

বিদ্রোহের বহ্নিশিখা মেদিনীপুর থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকুড়ার রায়পুর থানায় বিদ্রোহীরা রায়পুরের হাট, বাজার ও কাছারিতে আগুন লাগিয়ে সমস্ত শহরটি দখল ক'রে নেয়। রায়পুর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এই অঞ্চলের পূর্বেকার জমিদার দুর্জন সিং। কোম্পানির খাজনা নীতির ফলে দুর্জন সিং-এর পৈতৃক জমিদারী অন্যের হাতে চলে যায়। নতুন জমিদারকে অকেজো করার জন্য তিনি চোয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। বিদ্রোহীরা তাঁর নেতৃত্বে কমপক্ষে তিরিশটি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত দুর্জন সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার পক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে একজন সাক্ষীও হাজির করতে না পারলে আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস ক'রে দেয়। এই বিদ্রোহ দমনে সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়।

চোয়াড় বিদ্রোহ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী বীরভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই বিদ্রোহের প্রাণশক্তি ছিল উৎপীড়িত কৃষক, কৃষকের সঙ্গে সামিল হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষ। স্থানীয় সরকারী কর্মচারী, তহসিলদার, এমন কি জমিদারেরা বিদ্রোহকে সমর্থন জানায়।

গ. উত্তরবঙ্গ : সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলায় কোম্পানির শাসন ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের পরই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোম্পানিকে সব চাইতে বড় আঘাত দেয়। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর কোম্পানি শাসন বিরোধী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়কাল। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে পরিচিত হলেও বিদ্রোহী কার্যকলাপে হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকির বেশীর ভাগ জায়গায় এক সঙ্গে অংশ নেয়। বুভুক্ষু কৃষক, অধিকারচ্যুত জমিদার, ছাঁটাই সিপাহীদের সমর্থনে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

১৭৭০ সালের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় থেকে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয় কোম্পানির নির্মম শোষণ, অত্যাচার। ফলে সাধারণ মানুষ দলে দলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগ দিয়ে কোম্পানির শাসন বিকল করে দেয়। ১৭৭২ সালের মধ্যে বিদ্রোহ রংপুর থেকে অতি দ্রুত ঢাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের প্রবল আক্রমণের মুখে ইংরেজ রাজশক্তি প্রায়

কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। প্রায় দেড় হাজার সন্ন্যাসী রংপুর শহরের কাছে শ্যামগঞ্জে ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রবল লড়াই চালায়। ক্যাপ্টেন টমাস নিহত হয়। সন্ন্যাসীরা ঢাকার দিকে এগিয়ে গেলে কোম্পানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। রংপুরের শ্যামগঞ্জের মত এখানেও দেশীয় সিপাহী ও তাদের নেতারা ইংরেজ ক্যাপটেনের আদেশ অমান্য করে। ফলে আদেশ অমান্যের অপরাধে দেশীয় সিপাহীদের কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়।

এই বিদ্রোহ প্রধানত মুসলমান ফকিররা পরিচালনা করে। মজনু শাহের নেতৃত্বে মুশা শাহ, চোরাগ আলি শাহ, পরাগল আলি শাহ প্রমুখ ফকিররা অগ্রণী ভূমিকা নেন। সরকারী রিপোর্টে বিদ্রোহের নেতা হিসাবে হিন্দু সন্ন্যাসীদের উল্লেখ আছে। ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে সময় সময় সংঘর্ষ বাধলেও কোম্পানির বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত আক্রমণ চালাত। ফকির ও সন্ন্যাসীদের কোম্পানি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য না ক'রে সবাইকে সন্ন্যাসী নামে চিহ্নিত করেছিল। সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে ফকিরদের নেতা মজনু শাহের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

কোম্পানির বিরুদ্ধে সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রায় সাত হাজার সন্ন্যাসী বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলায় এগিয়ে যায়। সেখানে তারা কোম্পানির সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। ইংরেজ সরকার ক্যাপটেন এডওয়ার্ড-এর নেতৃত্বে সিপাহীবাহিনী পাঠায়। এডওয়ার্ড সন্ন্যাসীদের ধরে ফেলার চেষ্টা করলে তার চরম পরাজয় হয়। ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীরা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা প্রবল বেগে এগিয়ে চলে। ১৮০০ সাল পর্যন্ত কোম্পানির সেনাবাহিনী সন্ন্যাসীদের প্রতিরোধ করতে পারে নি।

ঘ. কোল বিদ্রোহ

জমি ও জঙ্গল থেকে উৎখাত হয়ে ১৮৩১-৩২ সালে সিংভূমের কোল আদিবাসীরা কোম্পানির শাসন ও নতুন অধিকারপ্রাপ্ত দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সিংভূমের আদিবাসী রাজা প্রভাত প্রজাদের সাহায্যে তাঁর সীমানায় কোম্পানির অনুপ্রবেশ বেশ কিছু দিন আটকে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮২০ সালে প্রভাত কোম্পানির কাছে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। কুড়ি বছর পরে ১৮৩১ সালে কোল আদিবাসীদের বিক্ষোভ ব্যাপক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অত্যধিক মাত্রায় ভূমি-খাজনা ধার্য ও অত্যাচার কোল বিদ্রোহের কারণ। বিদ্রোহ রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ ও মানভূমে ছড়িয়ে পড়ে।

কোল বিদ্রোহের ঠিক পরেই ১৮৩২ সালে মানভুমের ভূমিজ আদিবাসীরা গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। অধিকারচ্যুত গঙ্গানারায়ণ বরাভূমের নতুন দেওয়ান মাধব সিংয়ের অত্যধিক ভূমি-খাজনা ধার্যের বিরুদ্ধে ভূমিজ ঘাটওয়ালদের একত্রিত করেন। মাধব সিংয়ের অত্যাচারে বহু ভূমিজ আদিবাসী জমি হারায়। তারা সবাই গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে মাধব সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মাধব সিং আক্রান্ত ও নিহত হয়। ভূমিজ বিদ্রোহীরা মুন্সেফের কাছারি সমেত সরকারি অফিস তছনছ ক'রে পুলিশ থানা ও লবন দারোগার কাছারি পুড়িয়ে দেয়। প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে সরকারী সিপাহী বাহিনীকে আক্রমণ করে। ১৮৩২ সালের মাঝামাঝি অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে ইংরেজের রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে বরাভূম ছেড়ে দিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

৬ সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সাঁওতাল আদিবাসীদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর নতুন জমিদারেরা অত্যধিক হারে ভূমি-খাজনা ধার্য করে। ফলে পুরুষানুক্রমে বসবাস করা, চাষ করা জমি ছেড়ে আসতে সাঁওতালরা বাধ্য হয়। পার্বত্য অঞ্চল ও উঁচু জমির জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে সাঁওতালরা নতুন ক'রে বসবাস ও চাষ শুরু ক'রে দেয়। বাংলা ও বিহারের মহাজন, ব্যবসায়ী ও জমিদাররা সাঁওতালদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে নির্মম শোষণ, অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দেয়। কোম্পানির খাজনা-সংগ্রাহক ও পুলিশ কর্মচারীর জুলুম সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। নির্মম শোষণ, অত্যাচারের উপর যুক্ত হয় জমিদার-মহাজন-কোম্পানি সাহেবদের সাঁওতাল রমণীর প্রতি অশালীন ও বর্বর আচরণ।

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল নেতা সিধু ও কানুর নেতৃত্বে দশ হাজারের বেশী আদিবাসী মানুষ ভাগনাদিহির মাঠে সমবেত হয়। ক্রমশ বিদ্রোহীদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। প্রায় তিরিশ হাজার সাঁওতাল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রথমে বিদ্রোহের আগুন ভাগলপুর থেকে মুঙ্গেরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পাকুড় ও সাঁওতাল পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আক্রমণে ইংরেজের সেনাবাহিনী পযুর্দস্ত হয়ে পড়ে। মহেশপুরে সিধুর আহবানে পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল কোম্পানির সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে কোম্পানির সেনাবাহিনী প্রবল সন্ত্রাস সৃষ্টি করল

আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে। সিধু-কানুকে ধরিয়ে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল। আতঙ্কিত কোম্পানি ছ'টি রেজিমেণ্ট ও হিল রেঞ্জার্স সেনাবাহিনীকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে মোতায়েন করে।

কোম্পানির সেনাবাহিনীর অত্যাচারের মুখে বিদ্রোহী সাঁওতালদের মনোবল আরো বেড়ে যায়। ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নব উদ্যমে পনের হাজার আদিবাসী বিদ্রোহে যোগ দেয়। যুদ্ধজয়ের প্রতিহিংসা নিয়ে কোম্পানি অবশেষে সামরিক আইন জারি করল সমগ্র বিদ্রোহের এলাকায়। বেপরোয়া সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়। বিদ্রোহীরা সহজে আত্ম-সমর্পণ করে নি। তারা কোম্পানি শাসনের অবসান ঘোষণা করে নিজেদের শাসন সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। মেজর বারোর নেতৃত্বে ইংরেজ সেনা-বাহিনীর পরাজয় হয়। তিরিশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল কোম্পানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন ও বেপরোয়া সন্ত্রাসের রাজত্বে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরাজয় স্বীকার করে।

চ. বিদ্রোহগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য

কোম্পানি বিরোধী বিদ্রোহের প্রকৃত সূত্রপাত হয় মীরকাশিমের যুদ্ধ ঘোষণা থেকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে মীরজাফরকে বাংলার ক্রীড়নক নবাব করে। অযোগ্যতার অজুহাতে তাঁকে সরিয়ে ইংরেজরা তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঔদ্ধত্য, স্বৈরাচারী শাসন ও অন্যায় জুলুম সহ্য করা সম্ভব হল না মীরকাশিমের পক্ষে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন মীরকাশিম। প্রবল বীরত্বের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে তিনি পরাজিত হলেন। দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীরকাশিম সর্বপ্রথম কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন।

মীরকাশিমের পরাজয় কোম্পানির অবাধ লুণ্ঠন, অবাধ শোষণ ও যথেচ্ছ শাসনের পথ সুগম করে দেয়। ইংরেজ শাসনের কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার সুপ্রসিদ্ধ তাঁতশিল্প চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে পদার্পণ করে এই শহরকে লণ্ডন শহরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের কল্যাণে বাংলার সমৃদ্ধশালী শহরগুলো জীর্ণপ্রায় হয়ে ওঠে। ১৭৬০ সালে কোম্পানি মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার এবং কিছু পরে সারা বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা অসামরিক

প্রশাসন ও রাজস্য সংগ্রহের অধিকার লাভ করে।

দায়িত্ব পেয়ে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের পুরানো ব্যবস্থা পরিবর্তন করে। এখন থেকে প্রতি বছরে জমি বন্দোবস্ত করার জন্য নীলাম ডাকা আরম্ভ হ'ল। নীলামে যে ব্যক্তি সর্বাধিক ভূমি-খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিত কোম্পানি তার সঙ্গে খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করল। ফলে পুরানো জমিদারের জায়গায় একদল হৃদয়হীন, নির্মম ও অত্যাচারী ইজারাদারদের আবির্ভাব হল। নতুন রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পুরানো জমিদারেরা একে একে জমিদারী হারাল।

১৭৮১-তে নিযুক্ত কোম্পানির নতুন খাজনা আদায়ের ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার সেই অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহ ঘোষণায় বাধ্য করেছিল। এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই বিদ্রোহগুলি কোম্পানির রাজস্বনীতির উপর সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। নীলাম ডাকার মাধ্যমে প্রতি বছরে সর্বাধিক ভূমি খাজনা সংগ্রহের ইজারাদার নিয়োগ নীতির অসারতা কোম্পানি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল। ফলে ইজারাদারী ব্যবস্থা বন্ধ করার নীতি গৃহীত হল। ১৭৯৩-তে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থায় ইজারাদারির পরিবর্তে সরকার সরাসরি জমিদারকে ভূমিখাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দিল।

কোম্পানি আমলে মেদিনীপুর জঙ্গলের আদিবাসীরা পুরুষানুক্রমিক পাইকান জমিতে ভোগদখলের অধিকার হারিয়ে ফেলল। কোম্পানি তাদের এই অধিকার কেড়ে নেয়। ফলে ১৭৯৯-তে কৃষক, পাইক, সর্দার ও জমিদারদের সম্মিলিত বিক্ষোভ চোয়ার বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। এই বিদ্রোহ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধলভূম প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এই সব জায়গায় কোম্পানির পক্ষে ভূমি খাজনা সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফলে পাইকান জমি দখল করার নীতি কোম্পানি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

১৭৬০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত মোট চল্লিশ বছর উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চলেছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে 'বেপরোয়া দস্যুবৃত্তি' বলে অভিহিত করেছেন। একথা ঠিক যে সন্ন্যাসী দলের একাংশ মুঘল আমল থেকেই পেশাদারী যোদ্ধা হিসাবে কাজ করত। পুরানো জমিদাররা অনেকসময় সন্ন্যাসীদের সীমান্ত রক্ষা এবং পুলিশের কাজে লাগাত। কিন্তু কোন সময়ই সন্ন্যাসীরা দস্যু বা পেশাদারী দস্যু ছিল না। ইংরাজ ঐতিহাসিকের সমর্থনে কোন নজির পাওয়া যায় না।

মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী পরিচালিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আসল শক্তির উৎস ছিল সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ।

শুধুমাত্র দস্যুবৃত্তি করে চল্লিশ বছর ধরে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কোম্পানির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। কোম্পানির সিপাহীদের আক্রমণ তাদের দুর্বল করতে পারে নি। কারণ স্থানীয় কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ এমন কি পুরানো জমিদারেরা সন্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছিল। কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাধারণ মানুষকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসাহিত করেছিল। অনেক সময় তারা আবার ভীত হ'য়ে বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও রসদ দিয়েছিল। জন সমর্থনে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ চার দশক ধ'রে চলেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রধানত ছিল কৃষক বিদ্রোহ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল ভারতের জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ জীবন যাপন করত। কোম্পানির শাসন ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতের সুদূর প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লে আদিবাসী অঞ্চলগুলি তার মধ্যে এসে পড়ে। বহু যুগ ধরে চলে আসা আদিম, সহজ, সরল জীবনযাত্রা প্রবলভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে। কোম্পানির আমলে প্রশ্রয়প্রাপ্ত নীলকুঠির সাহেব, জমিদার, দালাল, মহাজন, পুলিশ, সরকারি আমলা প্রভৃতির ভয়ংকর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাঁওতালরা বিক্ষোভে, বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। কোম্পানি প্রবর্তিত অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় যে শোষক শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে আদিবাসী সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা এমন এক স্বাধীন রাজ্যের কল্পনা করেছিল যেখানে কাউকে ভূমি-খাজনা দিতে হবে না, সবাই চাষ করার অধিকার পাবে, সব ঋণ মুকুব হবে। সাঁওতাল বিদ্রোহে স্থানীয় চর্মকার, ডোম, কুমোর, তেলী, তাঁতি, কর্মকার প্রভৃতি সাধারণ মানুষেরা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল।

১৭৭৫ সালের পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও শোষণ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভগ্নদশায় ফেলে দেয়। সাধারণ কৃষক ও আদিবাসী থেকে পুরাণো জমিদার পর্যন্ত কোম্পানির শাসনে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আট দশক কোম্পানির শাসনকে অসহায়ভাবে মানুষ মেনে নেয় নি। কৃষক-বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, কোল-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের মানুষ কোম্পানির

অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। এই বিদ্রোহগুলির রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল না। কখনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কখনো ধর্মীয় আবেদনে সংগঠিত হওয়া, কখনো আদিবাসী জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কখনো পুরানো জমিদারকে নেতা করে অস্ত্রধারণ ইত্যাদি প্রকৃতিগুলিই কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সচেতন রাজনীতি ও সংগঠন তখনো পর্যন্ত সুস্পষ্ট আকার ধরে নি। এই সময়কার কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে সচেতন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য না থাকলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদ্রোহগুলির ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

৪ উনিশ শতকের প্রথম ভাগ : আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংগঠনের বিকাশ

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংগঠনের বিকাশ ঘটে। আধুনিক চিন্তাধারা ও সংগঠন বিকাশ প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এই বিকাশের মূলে ঐতিহাসিকদের একাংশ ভারতে ব্রিটিশ আগমন এবং ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাবকে একমাত্র কারণ ব'লে গণ্য করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে ভারতে নতুন চিন্তাধারা ও সংগঠন বিকাশের মূলে আছে সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব। শুধু ভারত কেন, এমনকি ইংলণ্ডের আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমগ্র ইউরোপের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা যেমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান বাণীগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা মার্কিণ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাগুলির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতীয় উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাণীগুলি এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বাহকরূপে এদেশে নূতন গণতান্ত্রিক চেতনা ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রবর্তন করেন।

ক. আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত করে। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ আঠারো শতকের শেষ দিক

থেকে তীব্রভাবে শুরু হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন ভারতে অর্থনৈতিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক সংশয় এবং সামাজিক জড়তাকে তীব্র করে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক। তিনি সমালোচকের দৃষ্টিতে আধুনিক পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যের প্রাচীন জ্ঞানবিদ্যাকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি ও অন্ধকারময় দিকগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তিনি প্রাচীন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন। রামমোহন ইউরোপের যুক্তিবাদী ঐতিহ্য অনুসরণে সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২৮ সালে তিনি ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মণ্টেস্কু, ব্ল্যাকস্টোন এবং বেন্থামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় অরাজকতার বিরুদ্ধে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ভারতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মত তিনি পোষণ করতেন। রামমোহন ভারতে উদারনৈতিক চিন্তাধারার পথ-প্রদর্শক। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন। সেজন্য তিনি ১৮২৩-এ প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিরোধী এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে স্মারকলিপি পাঠান। ব্রিটিশ সম্রাটকে প্রেরিত একটি আবেদনে রামমোহন ভারতে স্বাধীন সংবাদপত্রের ভূমিকার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৩৩-এর চার্টার এ্যাক্ট-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার প্রাক্কালে তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠনের উপর তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। এই মতামতে তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছিল।

রামমোহন জুরী আইনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। কারণ এই জুরি আইন ভারতীয় আদালতে জুরী নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতিগত ও ধর্মীয় তারতম্যের সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্যের সমর্থক ছিলেন। সাম্য অর্থে তিনি আইনের দৃষ্টিতে সবার জন্য সমান অধিকার দাবি করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তার প্রধান কারণ হল ব্রিটিশের ধর্মীয় সহনশীলতার উপর উৎসাহ দান। অবশ্য রামমোহন ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছিলেন। রামমোহনের উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও আইনের শাসনের প্রতি সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া বিচার

বিভাগ পুনর্গঠন করার পরামর্শের মধ্য দিয়ে। তিনি ভারতীয় আদালতগুলিকে আইনের শাসন ও আইনের সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন বিশ্ব রাজনীতিক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। বিশ্বের সর্বত্র মুক্তি সংগ্রামরত জাতিগুলির প্রতি তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম সংকীর্ণ ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ভারতে যখন জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্যকরূপ বিকশিত হয় নি সেই যুগে আন্তর্জাতিক সমবেদনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবীদের সাময়িক ব্যর্থতার সংবাদে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন 'enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful'. স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক সরকার সমর্থকদের জয়লাভে তিনি কলকাতার টাউন হলে নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। ১৮৩০-এ সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবের বহ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হয়েছিল। তিনি ইউরোপীয় বিপ্লবীদের অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেছিলেন। ফরাসী দেশে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হন।

রামমোহনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কোনরকম সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, বর্ণ, ভৌগলিক সীমা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগের পথ দেখিয়েছিলেন। রামমোহনকে আধুনিক ভারতের উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বলা যায়। রামমোহনের রাজনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপ উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর মৃত্যুর পর সেই চিন্তাধারা ও আন্দোলন দীর্ঘদিন ভারতের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রামমোহনের উদারনৈতিক চিন্তার আলোকবর্তিকা তাঁর উত্তরসূরীরা বহন করেছিলেন। রামমোহনের জীবনের শেষ দিকে হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রগোষ্ঠী নবীন ভারতে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন (Young Bengal Movement) শুরু করেন। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের 'নেতারা দার্শনিক বেন্থামের অনুগামী ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের পুরোহিত ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরী ভিভিয়েন ডিরোজিও। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ডিরোজিও স্বাধীন চিন্তা ও সামাজিক স্বাধীনতার বাণীগুলিকে তাঁর প্রিয় শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক, যুক্তিবাদী এবং সমাজ বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি তাঁর হিন্দু কলেজের প্রিয় ছাত্রদের

সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশে উৎসাহিত করতেন। সর্বপ্রকার কর্তৃত্বকে প্রশ্ন ও সমালোচনা করায় তিনি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যগোষ্ঠী 'পার্থেনন' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' সংস্থাকে কেন্দ্র করে হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্ররা সামাজিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন।

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের পুরোহিত ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগণ ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। টমাস পেইনের যুক্তিবাদ তাঁরা আকণ্ঠ পান করেন। পেইনের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'এজ অব রিজন' ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। যুগ যুগ সঞ্চিত আচারের নামে অনাচার, ধর্মের নামে প্রাণহীন অনুষ্ঠান সর্বস্বতা, শাসনের নামে কুশাসন, লৌকিক আচারের নামে কূপমণ্ডুকতা, সমাজ প্রাধান্যের নামে পুরোহিত-ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তাঁরা যুক্তিনিষ্ঠ প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে ডিরোজিওর শিষ্যগণ এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে ফরাসী জাহাজের নাবিককে কলকাতার টাউন হলে প্রকাশ্য জনসভায় সম্বর্ধনা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তার আগে তাঁরা বিপ্লবের সাফল্যে কলকাতার ময়দানে অবস্থিত অক্টরলোনি মনুমেণ্টে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় ডিরোজিওর শিষ্যগণ প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করার জন্য ফরাসী বিপ্লব থেকে শিক্ষালাভের আহ্বান জানান। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ডিরোজিওর শিষ্যদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে লিখেছিল, 'ভারতবর্ষে ফরাসী অনুকরণে বিপ্লব হলে গঙ্গার জল রক্তে লাল হয়ে উঠবে আর উদ্যানগুলিতে শুধু মানুষের মাথা পড়ে থাকবে।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত ও বশংবদ সংবাদপত্র ডিরোজিওর শিষ্যগণের চিন্তাধারায় কিরকম ভীত হয়ে উঠেছিল এ উক্তি তা প্রমাণ করে। ডিরোজিওর শিষ্যগণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তাধারায় প্রতিক্রিয়া বনাম বিপ্লবের প্রশ্নে ডিরোজিওর শিষ্যগণ সব সময়ে বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁদের চিন্তাধারায় ভলতেয়ার, হিউম, লক, টমাস পেইন প্রমুখ প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ডিরোজিওর শিষ্যগণ কলকাতার টাউন হলে সভা আহবান ক'রে প্রেস আইন, মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁরা ভারতীয় বিচারালয়ে জরুরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করেন। কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত আরেকটি জনসভায় তাঁরা ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। কারণ এই আইন ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ ১৮৩৮ সালে Society for the Acquisition of General Knowledge নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁরা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতেন।

রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ডিরোজিওর শিষ্যদের চিন্তাধারার অনেক মিল ছিল। তৎসত্ত্বেও রামমোহন ও ডিরোজিও শিষ্যগণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে রায়ত ও ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রশ্নে এই পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। ডিরোজিওর শিষ্যগণ ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ সমর্থন করেন নি। এবং তাঁরা রায়তের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির উপর সহানুভূতিশীল ছিলেন। রামমোহন পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যচিন্তার সমন্বয় সাধন করে নূতন চিন্তাধারার পথিকৃৎ হন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ প্রাচ্যচিন্তার পরিবর্তে শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন।

ডিরোজিওর শিষ্যগণ স্থায়ীভাবে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করেন নি। তাঁদের আবেদন ছিল বুদ্ধি ও যুক্তির উপর। তারুণ্যের উদ্দাম ও বাঁধভাঙ্গা উৎসাহে তাঁরা ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহী মনোভাব কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে নির্বাপিত হতে শুরু করে। কিন্তু তাঁদের যুক্তিবাদী ও বৈপ্লবিক প্রতিবাদ পরবর্তীকালে যুবমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার দত্তের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-ধারাগুলি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যুক্তিবাদ ও রাজনৈতিক উদারনীতিবাদের প্রবক্তা হিসাবে তিনি রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি মনে করতেন সরকার প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করে। সরকারের আইনানুগ ও নৈতিক দায়িত্ব হল নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সচেতন হওয়া। অক্ষয়কুমার ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমালোচনা করেন। তিনি ব্রিটিশ প্রবর্তিত

চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্তে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় এসেছিল তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। বাংলার সমাজ জীবনে জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগী নামে যে নতুন শ্রেণীগুলির সৃষ্টি হল তারা বাংলার গ্রামীণ সমাজ, অর্থনীতিতে কী ভয়ানক শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার চালিয়েছিল তা অক্ষয়কুমার সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলার গ্রামীণ সমাজ জীবনে আরো একটি নূতন শ্রেণীর অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন অক্ষয়কুমার। এরা হল নীলচাষ ব্যবসায়ে নিযুক্ত অমিতবিক্রম নীলকর সাহেবের দল।

কী আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষি সমস্যার মূলে আলোকপাত করতে পেরেছিলেন। কৃষকদের প্রতি নীলকর সাহেব ও নতুন জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার, শোষণ, বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক ও প্রজাদের জীবনে যে চরম দুর্গতি আনছে তা তিনি অকুণ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর মতে নিরীহ কৃষকদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন ব্রিটিশ সরকারের কুশাসন ও অযোগ্যতা প্রমাণ করে।

অক্ষয়কুমার রামমোহনের ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনে ভারতবাসীর উন্নতি তত্ত্বকে খণ্ডন করেন। উপনিবেশ স্থাপনে উন্নত জাতির সংস্পর্শলাভে অনুন্নত জাতির কল্যাণসাধন তত্ত্বে তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরাই করতে পারে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে বিপরীতমুখী দুটি ভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়। Westernism বা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, Orientalism বা প্রাচ্যচিন্তার প্রভাব এই পর্বে দেখা দিয়েছিল। উদ্বোধক রামমোহন পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের একটি আদর্শ রাখলেন। সেটি হল উদারনীতিবাদ এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। আর একটি উগ্র, উদ্দাম ও বাঁধভাঙা আদর্শ উপস্থাপিত করলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের ডিরোজিওর শিষ্যগণ। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে এই দুই আদর্শ উনিশ শতকের চিন্তা-ধারাকে করেছিল বহির্মুখী। অন্যদিকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রাচ্য বিদ্যা পুনর্জাগরণ আন্দোলন উনিশ শতকের প্রথম দিকে এনেছিল অন্তর্মুখী প্রবণতা। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বা বহির্মুখী ধারায় অক্ষয়কুমার দত্ত আকৃষ্ট হন সমধিক। সেই ধারার তিনি সুস্থিত সাধক। রামমোহনের উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা এবং উৎপীড়িত কৃষকের প্রতি সমবেদনা।

খ. আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠনের সূচনা

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের রাজনৈতিক সংগঠন বিকাশ লাভ করে। ১৮৩০ সালের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত জমিদার শ্রেণী রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানে অগ্রণী হয়। প্রধানত জমিদারদের উদ্যোগে ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সূত্রপাত হয়। ১৮৩৭ সালে কলকাতায় 'জমিদারী এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৩৮ সালে এই সংগঠনের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনকে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সংগঠন বলা চলে। প্রথম থেকেই 'ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি'র ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সংকীর্ণ জাতিবিভেদ বা আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে একটি উদারনৈতিক নীতি প্রতিফলিত হয়। কারণ এই সভার সদস্য হতে হলে তাঁকে দেশের স্বার্থের প্রতি কৌতুহলী হতে হবে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের মানদণ্ডে 'ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি'-র উদ্দেশ্যগুলিকে যথেষ্ট উদারনৈতিক বলা যায়। কারণ এই সমিতি প্রথম থেকেই ভারতে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে শাখা খোলার প্রস্তাব করে। অবশ্য এই সমিতির অন্যতম প্রধান ঘোষিত উদ্দেশ্য হল জমিদার ও জমির মালিকদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা। সমিতির অন্যতম নেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূমি মালিকের স্বার্থের পাশাপাশি রায়তের অধিকার রক্ষা করার কথা বলেছিলেন। তিনি সমিতির মাধ্যমে ভারতবাসীর নিয়মতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতে উদারনৈতিক রাজনীতিভিত্তিক সংগঠন ও আন্দোলন প্রসারে প্রয়াসী হন। তিনি জমিদার সভা এবং ভূমি-মালিক সমিতির রাজনৈতিক আন্দোলন পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। দ্বারকানাথ ভারতে পাশ্চাত্য ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইংলণ্ডের উদারনৈতিক নেতা ও বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন ১৮৪২ সালে ভারতে আসেন। ভারতে আগমনের পরেই টমসন শিক্ষিত যুব সমাজে প্রবল রাজনৈতিক উৎসাহের সৃষ্টি করেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে ১৮৪৩ সালে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতের জনগণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং দেশের আইন ও সম্পদগুলি সম্পর্কে সম্যকরূপ অনুসন্ধান করা। সর্বস্তরে মানুষের স্বার্থ, কল্যাণ এবং ন্যায্য অধিকার সুরক্ষা করা এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

'ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' এবং 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র নেতৃবৃন্দ

মূলত রক্ষণশীল এবং রাজভক্তির দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত করেন। এই সমিতিগুলির রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। তৎসত্ত্বেও সমিতিগুলি কিছু প্রগতিশীল দাবি ধ্বনিত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচনের অবসান, জুরী ব্যবস্থার দ্বারা বিচার, জনকৃত্যককে ভারতীয় করণ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ইত্যাদি দাবিগুলি উনিশ শতকের চল্লিশ দশকে ধ্বনিত হয়েছিল। এই সমিতি দুটি কিন্তু ব্যাপক আকারে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার ক'রে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে নি।

১৮৪৯ সাল থেকে ভারতে সুসংগঠিত ও কার্যকরী রাজনৈতিক সমিতির অভাব অনুভূত হল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, ১৮৫৩ সালে ভারত প্রশাসনের চার্টার আইনের মেয়াদ শেষ হবে। সেইজন্য ভারত প্রশাসন সংক্রান্ত সম্ভাব্য আইনকে প্রভাবিত করার জন্য ভারতীয় জনমত গঠন করা দরকার। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়গণের অন্ধ জাতিবিদ্বেষ প্রতিহত করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। কারণ নিতান্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন ও জাতি-বিদ্বেষ বিরোধী কোনো আন্দোলনের কথা চিন্তা করলে সমগ্র ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়গণ প্রবল বাধার সৃষ্টি করত। ইউরোপীয়গণের জাতিবিদ্বেষ এবং ভারতীয় প্রশাসনে তাদের একচ্ছত্র প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

ভারতীয়দের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ১৮৫১ সালে কলকাতায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসন যন্ত্রকে সুদক্ষ করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধন করা, আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করে সবার স্বার্থ ও কল্যাণে তাকে নিয়োগ করা ইত্যাদি লক্ষ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সমিতি কলকাতা ও মফস্বল শহরগুলিতে জনসভা আহবান ক'রে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। পূর্বেকার সমিতিগুলির তুলনায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ব্যাপক আকারে ভারতীয় জনমত গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় গুরুত্বমণ্ডিত প্রশ্নগুলির উপর সর্বভারতীয় সংহতি স্থাপনে এই সমিতি উদ্যোগী হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'র আবেদনলিপি ভারতের জাতীয় চেতনা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই আবেদনগুলিতে প্রশাসন ক্ষমতার সঙ্গে আইন সভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সেজন্য ব্রিটিশ ভারতে আইনসভাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির আইনসভার মতো পৃথকীকরণের দাবি করা হয়েছিল। এই আবেদনে ভারতীয় নাগরিকগণের আইনে দৃষ্টিতে সমানাধিকার চাওয়া হয়েছিল। ভারতে ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে সর্ব্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের দাবি করা হয়েছিল।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের' সদস্য তালিকায় জমিদার শ্রেণী ও ভূমির মালিকের পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে দেখা যায়। পূর্বেকার রাজনৈতিক সমিতিগুলিতে জমিদার ও অভিজাত পরিবারের সদস্যদের একচ্ছত্র প্রাধান্য বজায় ছিল। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' অভিজাত জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্য দুর্বল করে দেয়। এই সমিতির মধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য শুরু হয়। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' প্রস্তাবগুলি এবং পার্লামেণ্টে প্রেরিত আবেদনগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের কার্যকলাপ কি প্রবলভাবে এই সমিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

১৮৫৩ সালে চার্টার আইনের প্রদত্ত সামান্য সুযোগ সুবিধায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। সেইজন্য আইনসভায় অধিক সংখ্যক ভারতীয় সদস্য মনোনয়নের দাবিতে আবেদন-নিবেদন আন্দোলন শুরু করে। আইনের চোখে সকল মানুষের সমানাধিকার লাভ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোষিত নীতি তখন ভারতীয়দের আইনসভায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা নিতান্তই গর্হিত কাজ। এসোসিয়েশন উচ্চাভিলাষী ভারতীয় যুবকদের সুবিধার্থে ইংলণ্ড এবং ভারতে যুগ্মভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দাবি করে এবং জনমত সংগ্রহের জন্য ভারতীয় আইনসভায় আনীত বিলগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জাতীয় দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই আন্দোলন সভাসমিতি এবং আবেদন-নিবেদন সম্বলিত দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সংগঠনগুলি ইংলণ্ডে সুশিক্ষিত জনমতের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আবেদন প্রেরণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলির বিকাশ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৬৬ সালে দাদাভাই নৌরোজী ব্রিটেনের জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য 'ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

পশ্চিম ভারতে রানাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী, চিপলুনকার প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে 'পুণা সার্বজনীন সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বলা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক সমিতি বিকাশে বাংলার জমিদারশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাঅভ্যুত্থান ও কৃষক বিদ্রোহ

১ ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ : পটভূমি ও কারণ

১৮৫৭ সালের ইংরেজ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের মহাবিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই মহাবিদ্রোহ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আঞ্চলিক অভ্যুত্থান নয়। কারণ বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রায় সারা ভারতে প্রজ্বলিত হয়েছিল। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাণিজ্য শক্তি ঔপনিবেশিক রাজশক্তিতে পরিণত হয়। ঠিক পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষপূর্তিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত টলেছিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়েছিল। আধুনিক অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ইংরেজ শাসকের কাছে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সিপাহীদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সিপাহীদের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে।

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে নায়কের ভূমিকায় ছিল ভারতীয় সিপাহীরা। বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে সিপাহীদের অভ্যুত্থান জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহকে জনসমর্থনহীন, সামরিক শৃংখলাহীন সংকীর্ণ বিক্ষোভ ব'লে বর্ণনা করেছেন। সেজন্য মহাবিদ্রোহের প্রবল জনসমর্থনের প্রকৃতি সমেত সিপাহীদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পটভূমি ও কারণগুলি বোঝা দরকার।

মহাবিদ্রোহের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন : '...all classes of people in India were thoroughly discontented and dissatisfied against the British. It is, therefore, quite natural, and no extraordinary phenomenon, that there should be a general uprising of the people against the hated feringhees...' অর্থাৎ ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষ ব্যাপকভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে একশো বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়।

মহাবিদ্রোহের পটভূমি বর্ণনা ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এ. আর. দেশাই

বলেছেন : 'The revolt of 1857 was the result of the accumulated discontent among the various strata of the old Indian society who suffered by the British political conquest, by the new economic forces and measures brought into operation by that conquest, and by the various social innovations introduced in the country by the British Government.') অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ ভারতের পুরাণো সমাজের বিভিন্ন স্তরভুক্ত মানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ফল। ব্রিটিশের ভারত অধিকার এই সব মানুষের দুঃখ দুর্দশা তীব্রতর করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন অর্থনৈতিক ও বহুবিধ নতুন ব্যবস্থা মানুষের দুর্ভোগকে আরো বাড়িয়েছিল। এই সব কিছুর সুসংবদ্ধ প্রকাশ ঘটে মহাবিদ্রোহে। (মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র সিপাহীদের অসন্তোষ মহাবিদ্রোহের একমাত্র কারণ ছিল না।) মহাবিদ্রোহের প্রধান কারণ হল প্রায় সর্বস্তরের মানুষের বহুদিন ধরে জমে থাকা অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। বিক্ষুব্ধ সিপাহীরা ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিদ্রোহের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সর্বস্তরের মানুষের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাবকে ব্যক্ত করেছিল।

১৮৫৭-এর আগে থেকে ভারতীয় সমাজের প্রধান দুটি অংশ, কৃষক ও সিপাহী, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সিপাহীদের সংগ্রহ করা হ'ত কৃষক পরিবার থেকে। সেজন্য কৃষকদের দুরবস্থা সিপাহীদের প্রভাবিত করত, অপরদিকে সিপাহীদের দুর্গতি কৃষকদের বিচলিত করত।) ১৮৫৬-এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ শাসকবর্গ অযোধ্যার নবাবকে কুশাসনের অভিযোগে বরখাস্ত ক'রে তাঁর ভূসম্পত্তি দখল ক'রে নেয়। সেই সঙ্গে নবাবের ষাট হাজার সিপাহীকে ইংরেজরা বরখাস্ত করে। কর্মচ্যুত সিপাহীরা কৃষক পরিবারের মানুষ।

(ইংরেজ শাসন ভারতের গ্রামীণ সমাজকে সরাসরিভাবে আঘাত করেছিল। ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূমি-নীতি ও নতুন ভূমি-খাজনা নীতি কৃষকদের আয় অনেক কমিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের জমিহারা করেছিল। নতুন ভূমি-খাজনা নীতি রূপায়ণে পুরানো আমলের জমিদার-তালুকদারের জমি অতি দ্রুত নীলামে বিক্রি হয়ে যায়। ফলে কৃষকের দুর্গতির সঙ্গে যুক্ত হয় পুরাণো ভূমি-মালিকের দুরবস্থা। ইংরেজের সৃষ্টি করা নতুন জমিদাররা খুব কম সময়ের মধ্যে কৃষক শোষণ ও উৎপীড়নের রেকর্ড সৃষ্টি করে ফেলে। ইংরেজের নতুন ভূমি-খাজনা নীতি গ্রামীণ সমাজে সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থকে আঘাত করে।) সরকারী কর্মচারী ও পুলিশের

দুর্নীতি ও অত্যাচার সাধারণ মানুষের বিক্ষোভকে আরো বাড়িয়েছিল।

(একশো বছর ইংরেজ শাসনে মহাজন, সুদখোর, জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও চরম অপমান সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।) অত্যন্ত চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ঋণ ক'রে সাধারণ মানুষ জমি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিল। (সেজন্য তারা সিপাহীদের মহাঅভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায়। কারণ এই মহাবিদ্রোহ তাদের কাছে সরকারকে কর, জমিদারকে খাজনা ও মহাজনকে সুদ দেওয়া বন্ধ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল।) রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ইংরেজের হয়রানিকর নিয়ন্ত্রণ (vexatious restraints) সমেত ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত সব রকম অসন্তোষের উৎসগুলি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত করে।

(অযোধ্যায় ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর থেকে ভূমি রাজস্বের বোঝা অসম্ভব বাড়তে থাকে। ১৮৫৭-এর কিছু আগে নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সাতান্ন হাজার সিপাহী চোদ্দ হাজার আবেদন পত্র পেশ করেছিল। বহু ব্রাহ্মণ সিপাহীর দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'লে তারা ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে যায়। ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা অযোধ্যার সিপাহীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। অযোধ্যাই ছিল 'বেঙ্গল আর্মির' প্রধান সিপাহী নিয়োগ কেন্দ্র।) 'বেঙ্গল আর্মি'র সিপাহীরা মীরাট, দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, রোহিলখণ্ড, পাটনা, কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে মোতায়েন থাকত। সেজন্য অযোধ্যার বিক্ষোভ সমস্ত 'বেঙ্গল আর্মি'তে ছড়িয়ে পড়েছিল। মীরাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভারতের [illegible] অঞ্চলে বিদ্যুৎগতিতে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সিপাহীদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছিল।

(প্রথম দিকে সিপাহীদের অসন্তোষ স্থূলভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। কারণ সিপাহীদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন। তারা প্রচার করল ইংরেজ শাসনে সমাজ ও ধর্ম বিপন্ন। তাদের প্রচারে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থনে সারা উত্তর ভারতে ব্রিটিশবিরোধী ও খ্রীষ্টান-পাদ্রীবিরোধী মনোভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমন সময় ১৮৫৭-এর জানুয়ারীর প্রথম দিকে চর্বি-মিশ্রিত এনফিল্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহারের কথা প্রচারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে যেন শুকনো বারুদের স্তূপে আগুনের কাঠি এসে পড়ল। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী সমেত বিক্ষুব্ধ কৃষক, কারিগর, হস্তশিল্পী, জমিদার ও তালুকদারের এক অংশ ব্রিটিশবিরোধী মহাবিদ্রোহে সামিল হয়ে পড়ল।

সিপাহীদের মহাঅভ্যুত্থান যখন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিল ঠিক সেই সময় কার্ল মার্কস ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে' প্রকাশ করেন। তিনি ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করেন। ভারত বিজয়ের পর ১৫0 বছর ধ'রে ব্রিটেন 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি' অনুসরণ ক'রে ঔপনিবেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। চূড়ান্তভাবে ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হ'লে সিপাহীদের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। মার্কস বলেছেন 'সৈন্য থেকে তারা পরিণত হয়েছে পুলিশে।' অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় সিপাহীদের দিয়ে বিদ্রোহ দমন, শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার কাজ শুরু করে দেয়। সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার ব্যাপারে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সিপাহীদের গুরুতর তারতম্য এবং তাদের দিয়ে পুলিশী কাজ করিয়ে নেওয়ায় সিপাহীদের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল।

মার্কস লক্ষ্য করলেন যে ভারতীয় সিপাহীরা 'এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ কেন্দ্র সংগঠিত করে বসে।' বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের পরিবর্তে সিপাহীরা বিদ্রোহ ক'রে সর্বপ্রথম ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সৃষ্টি করল। কার্ল মার্কস মহাবিদ্রোহের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক কারণগুলি অনুসন্ধান করেছেন। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। ঔপনিবেশিক ভারতে ভূমিরাজস্ব ছিল ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ আয়ের প্রধান উৎস। মার্কস লিখেছেন: '১৮৪৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এমন সীমায় পৌঁছায় যে-করেই হোক রাজস্ব বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। ...বর্ধিত রাজস্ব পাবার একমাত্র পন্থা হল দেশীয় রাজাদের ঘাড় ভেঙে ব্রিটিশ এলাকা বাড়ানো।'

ব্রিটেনের জন্য প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ-নৈতিক সংকট মুক্ত করার জন্য লর্ড ডালহৌসি রাজ্য অবলুপ্তি নীতি গ্রহণ ক'রে ভারতে সামন্তরাজের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেন। তার ফলে ভূমি রাজস্ব অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। কৃষক, কারিগর ও কুটীর শিল্পীদের আর্থিক দুরবস্থা চরমে ওঠে। ভারতীয় সিপাহীদের অনেকেই কৃষক পরিবার থেকে এসেছিলেন। অর্থনৈতিক দুর্গতি একদিকে যেমন সাধারণ স্তরের সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়েছিল ঠিক তেমনই কৃষক-কারিগর-কুটীর শিল্পীদের সিপাহী অভ্যুত্থানে সামিল করেছিল।

২. মহাবিদ্রোহের ব্যাপকতা

মহাবিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হয় কলকাতার সন্নিকটে ব্যারাকপুরের

সিপাহী ব্যারাকে। চর্বি মাখানো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের মার্চের শেষের দিকে ব্যারাকপুরের পদাতিক বাহিনীর মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য তিনি অন্যান্য সিপাহীদের আহবান জানালেন। ইংরেজ সামরিক অফিসাররা মঙ্গল পাণ্ডে ও তাঁর সহকর্মীদের সহজেই পরাস্ত করে ফেলল। সামরিক আদালতের বিচারে মঙ্গল পাণ্ডে ও তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসি হয়। চর্বি মাখানো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের ধর্মবোধকে আহত করে! ভারতীয় সিপাহীরা এই টোটা প্রচলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ভারতীয় সমাজে একশো বছরের ইংরেজ কুশাসন ও শোষণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। এনফিল্ড টোটা ধূমায়িত বিক্ষোভকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

১৮৫৭ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে মীরাটে নব্বুইটি পদাতিক বাহিনীর মধ্যে পঁচাশিটি বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সামরিক আদালত তাদের কারাদণ্ড দেয়। বিদ্রোহী সিপাহীরা কারাদণ্ড অগ্রাহ্য ক'রে মীরাট শহরের চতুর্দিকে বিদ্রোহের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজ রাইফেল বাহিনীকে অগ্রাহ্য ক'রে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কয়েদী সমেত সাজাপ্রাপ্ত সিপাহীদের মুক্ত ক'রে দেয়। সিপাহীরা ইংরেজ অফিসারের জনৈক কর্ণেলকে হত্যা করে। সেই সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতীয় পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহে যোগ দেয়।

মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী শহরের দিকে ছুটে আসে। তারা সরাসরি লালকেল্লা দখল করে এবং মোঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র প্রতিনিধি বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট ব'লে ঘোষণা করে। দলে দলে সিপাহীরা দিল্লীতে চলে আসে। দিল্লীর ইংরেজ সামরিক নেতৃত্ব বিদ্রোহীদের তৎপরতায় হতভম্ব হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা যুদ্ধরত ইংরেজ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল গোলাগুলি বর্ষণ করে। প্রায় বিনা প্রতিরোধে দিল্লী শহর বিদ্রোহী সিপাহীদেব দখলে চলে আসে। দিল্লীর সামরিক ঘাঁটি সিপাহীদের দখলে চ'লে গেলে ইংরেজ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিরা দলে দলে শহর ত্যাগ করে। দিল্লী শহরে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করে, তারাই সারা শহরের অধিকর্তা হয়ে যায়।

মীরাট ও দিল্লী শহরে বিদ্রোহী সিপাহীদের সাফল্য এবং বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট করার ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও জাগরণের সৃষ্টি হয়। সারা উত্তর ভারত সিপাহী বিদ্রোহের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়। কানপুরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বাজী-

রাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের সামরিক রক্ষীবাহিনী কানপুরের সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেয়। তারা ইংরেজের রাজকোষ লুণ্ঠন করে। সেই সঙ্গে কারাগার ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করে এবং ইংরেজের অস্ত্রাগার দখল করে। নানাসাহেবের রক্ষী বাহিনীর নেতা তাঁতিয়া টোপী বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব দেন। তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা সারা কানপুর শহরে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দেয়। কানপুরে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ও অসামরিক ব্যক্তিরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। ভারতীয় সিপাহীদের প্রবল তৎপরতায় কানপুরের ইংরেজ সামরিক কর্তৃত্ব একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ইংরেজ সামরিক বাহিনী নৌকাযোগে কানপুর শহর ত্যাগ করার সময় বিদ্রোহীদের রোষানলে প'ড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনার পর নানাসাহেবের কর্তৃত্ব সারা কানপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অতি দ্রুত বিদ্রোহের বহ্নিশিখা যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গে ঝাঁসীর সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয়। ১৮৫৭-এর জুনের প্রথম সপ্তাহে ঝাঁসীর বিদ্রোহী সিপাহীরা ব্রিটিশের সামরিক দুর্গটি দখল করে নেয়। এর পরই অন্যান্য সামরিক ঘাঁটিগুলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতীয় সিপাহীরা বিদ্রোহে সামিল হয়। ইংরেজ সামরিক অফিসারেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং দলে দলে ঝাঁসী শহর ত্যাগ করে। প্রবল প্ররোচনা সত্বেও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর প্রজাদের নির্বিচার ইংরেজ হত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ইংরেজ সামরিক অধিনায়ক জেনারেল রোজ ঝাঁসীর জনগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজেই বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব দেন এবং অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করেন।

ইংরেজের আক্রমনে ঝাঁসীর পতন ঘটলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর দুর্গ ত্যাগ ক'রে তাঁতিয়া টোপীর বাহিনীতে যোগ দেন। লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া টোপীর যৌথ নেতৃত্বে গোয়ালিয়র শহর বিদ্রোহীদের দখলে আসে। জেনারেল রোজের সামরিক বাহিনী তাঁতিয়া টোপীর বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপী পরাজিত হন। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বদানের সময় রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিহত হন। শেষ পর্যন্ত কিছুসংখক স্থানীয় অধিবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরাজ সামরিক বাহিনীর কাছে তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়েন। ১৮৫৯-এর এপ্রিলে ইংরেজরা তাঁতিয়া টেপীকে নিহত করে।

ইন্দোরে হোলকার পরিবারের সামরিক বাহিনী জুলাই মাসে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজের রাজকোষ ও সরকারের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ইন্দোরের বিদ্রোহ ক্রমশ সাগর, নর্মদা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে সারা উত্তর প্রদেশে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ গণ-অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। রোহিলখণ্ডের বেরিলি শহর সিপাহী বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়ায়। রোহিলখণ্ডের নেতা খান বাহাদুর খান ইংরেজ সামরিক অফিসারদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। তিনি জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। রোহিলখণ্ডে সাময়িকভাবে ইংরেজ শাসন বিকল হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা খান বাহাদুরের নির্দেশে কর-খাজনা আদায় শুরু করে দেয়। খান বাহাদুর হিন্দু ও মুসলমানদের প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। সিপাহী বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থান হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রয়াসের আকার নেয়। রোহিলখণ্ডের বেরিলি, ফরাক্কাবাদ ও বিজনোর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়ে যায়।

ফরাক্কাবাদের ফতেগড় সামরিক ঘাঁটিটি বিদ্রোহী সিপাহীদের দখলে চ'লে আসে। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে বিদ্রোহীরা ফরাক্কাবাদের নবাবকে মসনদে বসায়। ইংরেজ শাসন এই অঞ্চলে ভেঙ্গে পড়ে। নবাব ফরাক্কাবাদ প্রশাসনের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। সাজাহানপুরে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যুক্ত হয় স্থানীয় জনসাধারণ। বিদ্রোহী সিপাহী ও গ্রামবাসীরা একত্রে সরকারের তহশিলখানা লুঠ করে, সরকারী নথিপত্র ও স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি জ্বালিয়ে দেয়। হামিদ হাসান খাঁ ও নিজামালি খাঁর নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা বেরোয়। এই শোভা-যাত্রায় ইংরেজ শাসনের অবসান ঘোষণা করা হয়।

গণ-অভ্যুত্থান ও সিপাহী বিদ্রোহ বুদাঁয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই অঞ্চলে জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের চিহ্নগুলি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। বহু সরকারী কর্মচারী বিদ্রোহীদের অধীনে কাজ শুরু করে দেয়। আলিগড় শহরে বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণের ইংরেজ শাসনবিরোধী প্রবল তৎপরতা দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ মথুরা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে প্রবলভাবে উদ্বেলিত করে। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করায় ইংরেজ সেনাবাহিনী আগ্রার দুর্গটি ত্যাগ করে। আগ্রা শহর ও শহরাঞ্চলে জনসাধারণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। পাঁচ সপ্তাহের বেশি সমগ্র অঞ্চলটি ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়ে বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়।

বান্দা শহরে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে শহর ও গ্রামের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। বান্দার মত হামিরপুর শহরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে জেলা শাসক সমেত বহু সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ অফিসার নিহত হয়। অযোধ্যা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান অগ্নিগর্ভ স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭ সালের আগে অযোধ্যার নবাবকে ইংরেজরা সিংহাসনচ্যুত করে এবং সেই সঙ্গে নবাবের সমস্ত সিপাহী বাহিনীকে বরখাস্ত করে। এইসব ঘটনাগুলি অযোধ্যার সিপাহীদের মনে নিদারুণ বিক্ষোভ জাগায়। মনে রাখতে হবে অযোধ্যাই ছিল ইংরেজের 'বেঙ্গল আর্মি'র প্রধান নিয়োগ কেন্দ্র। এই বেঙ্গল আর্মির' সিপাহীরা রোহিলখণ্ড, আগ্রা, কানপুর, দিল্লী, মীরাট, পাটনা, কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে মোতায়েন থাকত। খুব সহজে অযোধ্যার বিক্ষোভ সমগ্র 'বেঙ্গল আর্মি'তে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ মীরাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সিপাহীরা উত্তর ভারতে কৃষক কারিগর ও দরিদ্র জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করে।

অযোধ্যাব বিদ্রোহ লক্ষ্ণৌ শহরকে কেন্দ্র করে প্রবলভাবে ধূমায়িত হয়। প্রথম-দিকে বিদ্রোহীরা ইংরেজ সামরিক বাহিনীর উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। খুব শীঘ্র অযোধ্যার বেগম ও মৌলবী আমাদুল্লার নেতৃত্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা সংগঠিত হয় এবং ইংরেজ বিরোধী প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইংরেজ অধিনায়ক হেনরী লরেন্স ও তাঁর সামরিক বাহিনী বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রবল আক্রমণে পযুর্দস্ত হয়ে পড়ে। গুরুতর আঘাতে লরেন্সের মৃত্যু হয়। ফলে বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ শহর দখল করে এবং অযোধ্যার পতাকা উত্তোলন করে। রমেশ-চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'a real mass movement to fight for the king'. অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ-এর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম রাজার জন্য প্রকৃত গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। রমেশচন্দ্রের মতে 'Lucknow was the focal point of the fight for freedom'. অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ শহর স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। অযোধ্যার বিদ্রোহে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অযোধ্যায় ইংরেজ শক্তি পরাস্ত হলে কিছু কিছু তালুকদার স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিদ্রোহে যোগ দেয়।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতা শুধুমাত্র উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের বহ্নিশিখা পূর্ব ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল। বিদ্রোহীরা আরায় উপস্থিত হলে জগদীশপুরের ভূস্বামী কুনওয়ার সিং সিপাহীদের নেতৃত্ব দেন। অতি

দ্রুত বিদ্রোহের দাবানল দানাপুর, গয়া, ছোটনাগপুর, পালামৌ, সম্বলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের রোহিলখণ্ডের মত গণবিদ্রোহের চেহারা সারা সাহাবাদ শহরে দেখা যায়। এই সঙ্গে হাজারিবাগ, রাঁচী, ডোরাণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ সামরিক কর্তৃত্ব কার্যতঃ অকেজো হয়ে পড়ে।

পূর্ব ভারতের বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির মত বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয় নি। তবুও ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্রোহীদের বিক্ষিপ্ত তৎপরতা দেখা দিয়েছিল। পূর্ব ভারতে আসাম অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া বেশ ভালো ভাবে দেখা দেয়। ডিব্রুগড়ে অবস্থিত এক নম্বর হিন্দুস্তানী পল্টনের সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহের সামিল হয়। গোয়ালপাড়া, গোলাঘাট প্রভৃতি জায়গায় সিপাহীদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উত্তর ভারতের সংকটজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজ্যচ্যুত শেষ অসমীয়া শাসক কন্দপ্রেশ্বর সিং যাতে অভিজাত শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে কোন রকমের বিদ্রোহ ঘটাতে না পারেন সেজন্য ইংরেজ শাসন ব্যাপক দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আসামের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মণিরাম দেওয়ানকে এই সময় গ্রেপ্তার করে এবং ১৮৫৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মণিরামের ফাঁসি হয়।

পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে অসামরিক জনসাধারণ ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। পূর্ব পাঞ্জাবে হিসার, জানসী, সিরশ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। কার্নাল জেলায় বেশ কয়েকটি গ্রামে স্থানীয় জনসাধারণ ভূমি রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। একই সঙ্গে রোটাক ও রেওসারিতে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়।

উত্তর ও পূর্ব ভারতের মতো ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের কোনো তৎপরতা দেখা যায় নি। শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদ শহরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় দক্ষিণ ভারতে সিপাহীরা বিদ্রোহী মনোভাব দেখায় নি।

ভারতীয় সিপাহীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি জয়ী হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ড আর্থিক, সামরিক ও কলা-কৌশলগত ক্ষমতার তুঙ্গে উঠেছিল। বেশীরভাগ ভারতীয় সামন্ত শক্তি ও দলনেতা তখন ইংরেজের পক্ষে। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের আধুনিক অস্ত্র, সামরিক সংগঠন, ও শৃঙ্খলা, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ইত্যাদি কোন কিছুই ছিল না। অত্যন্ত নির্মম ও নিপুণভাবে ব্রিটিশ তার বিপুল পরিমাণ আধুনিক সমরাস্ত্র ও সুক্ষ্ম রণকৌশল

প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়েছিল।

বিপুল প্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করে নি। ১৮৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ সামরিক বাহিনী বিদ্রোহীদের পরাস্ত ক'রে দিল্লী শহর দখল করল। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ ইংরেজের হাতে বন্দী হলেন। তৎসত্ত্বেও সিপাহীরা কিছুদিন নিষ্ফল বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। কানপুরে নানা সাহেব ইংরেজের কাছে পরাজিত হলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত সেনানায়ক তাঁতিয়া টোপী ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে এক জমিদার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজের কাছে ধরা পড়লেন। ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। এরপর বিহারের কুনওয়ার সিং, বেরিলির খান বাহাদুর খান, ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদুল্লাহ প্রভৃতি সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতারা যুদ্ধরত অবস্থায় অথবা ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। এইভাবে ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের বহ্নিশিখা ক্রমশঃ নির্বাপিত হয়ে গেল। ১৮৫৯ সালের শেষের দিকে ভারতের ইংরেজ কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

গ্রামের কৃষক ও শহরের গরীব কারিগরের সমর্থনে সিপাহীদের মহাঅভ্যুত্থানকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা যেভাবে দমন করেছিল তার নজির ইতিহাসে সচরাচর পাওয়া যায় না। কার্ল মার্কস লিখেছেন, 'নারী ধর্ষণ, শিশুদের বেয়নেটে গাঁথা, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া' এসব ব্রিটিশ সেনাবাহিনী করে গেছে। 'নিষ্ঠুরতার সব কিছুই সিপাহীদের তরফে আর ইংরেজদের তরফে শুধুই মানবিক দয়ার ফল্গুধারা' সাম্রাজ্যবাদীদের এই তত্ত্ব মার্কস খণ্ডন করেছেন।

এঙ্গেলস 'লখনৌ আক্রমণের বিশদ বিবরণ' প্রবন্ধে বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশের অত্যাচার বর্ণনা করে বলেছেন: 'বিশ্বের অন্য কোন সৈন্য যদি এ অনাচারের এক-দশমাংশও করত তাহলে রুষ্ট ব্রিটিশ কি ধিক্কারেই না লাঞ্ছিত করত তাদের।' তিনি আরো বলেছেন: 'ব্রিটিশের মত এত পাশবিকতা ইউরোপ বা আমেরিকার কোন সেনাবাহিনীতে নেই। লুটপাঠ, বলাৎকার, হত্যাকাণ্ড—অন্য সব জায়গায় যা কঠোর বা সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত ব্রিটিশ সৈনিকদের তা সনাতন অধিকার মৌরসী-স্বত্ব।'

দিল্লী শহর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী দখল করলে ভারতীয় সিপাহীদেয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস জানতেন উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ উপস্থিত [illegible]বেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ

করতে পারে না। তাঁরা দেখিয়েছেন অভ্যুত্থানের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল একটা একক নেতৃত্ব ও যুদ্ধ পরিকল্পনার অভাব। ইংরেজদের সামরিক দক্ষতা ভারতীয় সিপাহীদের পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করে। ব্রিটিশরা অভ্যুত্থান দমনে অধিকাংশ ভারতীয় সামন্ত শাসকের সাহায্য পেয়েছিল। বিদ্রোহের প্রধান তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের একান্ত অভাবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী। মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও তা ব্যর্থ হয় নি।

৩. মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক ফলাফল

(১৮৫৭-৫৯ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদূর প্রসারী ফলাফল এনেছিল। জহরলাল নেহরু বলেছেন: যদিও এই বিদ্রোহ প্রত্যক্ষভাবে দেশের কিছু অংশকে প্রভাবিত করেছিল, তবুও এই বিদ্রোহ সারা ভারতে, বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল) (Though the revolt had directly affected only certain parts of the country it had shaken up the whole of India and, particularly, the British administration). (মহাবিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি আইন প্রণয়নে ভারত শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা সরাসরি পার্লামেণ্টের অধীনে নিয়ে আসে এবং ব্রিটিশ রাজশক্তিকে (crown) এই ক্ষমতা হস্তান্তর করে। নতুন আইন ভারতে Board of Control এবং Court of Directors-দের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটায়।) এক কথায় ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। (দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের জন্য সেক্রেটারী অব স্টেটের সহায়তায় এবং ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের পরামর্শে প্রত্যক্ষ ভাবে ভারত শাসনের নীতি গ্রহণ করে। এখন থেকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি রূপে ভাইসরয় উপাধি লাভ করলেন। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তির জন্য শেয়ার হোল্ডারদের বহু কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেগুলি ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনা হল।)

(মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার ভারতের সামরিক বাহিনীর নিয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। অযোধ্যায় অবস্থিত 'বেঙ্গল আর্মির' পরিবর্তে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয়, আঞ্চলিক ও জাতি গোষ্ঠীগুলি থেকে সিপাহী নিয়োগ নীতি গ্রহণ করে। এখন থেকে ভারতীয় সিপাহী বাহিনীর

বেশির ভাগ পাঞ্জাবের শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ ও হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সিপাহী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হল। এই সঙ্গে উচ্চতর সামরিক শিক্ষা ও সূক্ষ্ম মারণাস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা শুধুমাত্র ইংরেজ সামরিক বাহিনীকে দেওয়া হল। ভারতীয় সিপাহীদের নিম্নমানের সামরিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হল। মহাবিদ্রোহের পরে ভারতে ইংরেজের নতুন সামরিক নীতি দু'টি উদ্দেশ্য সাধনে রচিত হয়েছিল। প্রথমত, ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিতকে মজবুত করা। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সমর্থন করার জন্য ভারতীয় সমাজে শক্তিশালী সামাজিক ভিত রচনা করা। অর্থাৎ সামন্ত ও আধা সামন্ত সমাজিক শ্রেণীগুলিকে ব্রিটিশ শাসনের জোরালো সমর্থক তৈরি করার উদ্দেশ্যে নতুন নীতি রচিত হল।

মহাবিদ্রোহের কয়েক বছর পরেই ১৮৬১ সালে Indian Councils Act প্রণীত হয়। এই আইনে ভারতের গভর্ণর শাসিত বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি প্রেসিডেন্সী অঞ্চল সৃষ্টি ক'রে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের জন্য লেফটেনান্ট গভর্ণর শাসিত প্রদেশ করা হল। মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ১৮৬১ সালে কমন্স সভায় চার্লস উড বলেন, উচ্চ বংশোদ্ভব সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন স্থানীয় ব্যক্তিদের ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করাই হ'ল ব্রিটিশ রাজশক্তির লক্ষ্য। এই সঙ্গে ভারতে আইন আদালত ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সদর আদালত ও নিজামত আদালতগুলির অবসান ঘটিয়ে ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত স্থাপন করা হয়।

মহাবিদ্রোহের সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে দখল ক'রে সারা ভারতে একচ্ছত্র ব্রিটিশ শাসিত ভূখণ্ড সৃষ্টি করাই ছিল ইংরেজ নীতির লক্ষ্য। মহাবিদ্রোহের পর এই নীতির পরিবর্তন হয়। এখন থেকে উচ্চ কুলোদ্ভব সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন সামন্ত শাসক বর্গের সঙ্গে মিতালি স্থাপন ক'রে ভারত শাসনের ইংরেজ নীতি রচিত হল। এক কথায় বলা যায় সামন্ত শক্তির অবসানের পরিবর্তে এই শক্তিগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনে ব্রিটিশ সরকার অধিকতর গুরুত্ব দিল। এই সঙ্গে দেশীয় সামন্ত শক্তিগুলির মধ্যে নতুন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করল। ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই-এ সামন্ততন্ত্রের পতন হয়। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী

শক্তি স্থানীয় সামন্ত শক্তিগুলির সঙ্গে মিতালী স্থাপন করে। মহাবিদ্রোহের আলোকে ও অভিজ্ঞতায় ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে যে ভারতের স্থানীয় সামন্ত শক্তিগুলি তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। সাম্রাজ্যিক শাসন ও উপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখতে হ'লে দেশীয় সামন্ত শক্তিগুলির সক্রিয় সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।

৪. মহাবিদ্রোহের মূল্যায়ন

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি কি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নানা-মত পোষণ করেন। মহাবিদ্রোহের ব্যপকতা ও বিস্তার তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত করে। প্রথম প্রশ্ন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ কি সামরিক বিদ্রোহ, না জনগণের অভ্যুত্থান? দ্বিতীয় প্রশ্ন, মহাবিদ্রোহকে কি স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায়? তৃতীয় প্রশ্ন, ঐতিহাসিক মূল্যায়নে মহাবিদ্রোহকে কি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলা সঙ্গত?

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীরা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহ করল এবং সাম্রাজ্যিক প্রশাসনকে কার্যতঃ নির্দিষ্ট অঞ্চলে অকেজো করে দিল এ কথা সব ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন, জনসাধারণ কি একে সমর্থন করেছিল? এ কথা সত্য যে সিপাহীরা প্রথমে বিদ্রোহ করে, সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান হয় তার কিছু পরে। ইংরেজ শাসন ভারতের জনসাধারণকে প্রধানতঃ অস্ত্রহীন ক'রে রেখেছিল। অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তর ভারতের অঞ্চল-গুলিতে স্থানীয় জনসাধারণ বর্শা, লাঠি, তীর-ধনুক ও দেশী বন্দুক নিয়ে গণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়। ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সুসজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনসাধারণের ব্যাপক অভ্যুত্থানের ঘটনাটি ভালভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের কোনো কোনো অঞ্চলে স্বতঃ-স্ফূর্ত অভ্যুত্থান কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বে হয় নি। ইংরেজ-বিরোধী রাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থানের সংগঠন, কর্মসূচী ও নেতৃত্ব উনিশ শতকের মধ্যভাগে গড়ে ওঠে নি। সেজন্যে সিপাহীদের নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী না হয়েও অনেক জায়গায় জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার একমাত্র কারণ ইংরেজ শাসন ও ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ধূমায়িত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। পূর্ব ভারতের মজফ্ফর নগর, পাটনা, ছোটনাগপুর অথবা উত্তর ভারতের লখনৌ অঞ্চলে জনসাধারণের বিদ্রোহ প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি ব্যপক জন সমর্থন ছিল কি না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে, 'প্রধান রণাঙ্গনে বিদ্রোহের পিছনে অল্পবিস্তর জন সমর্থন ছিল।' রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, 'সামরিক বিদ্রোহ এ অঞ্চলে গড়িয়ে চলে সাধারণ অভ্যুত্থানের দিকে।' সুশোভন সরকারের মতে, '১৮৫৭ সালে অভ্যুত্থানের মধ্যে জনবিদ্রোহের রূপ নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবা চলে না।' মোট কথা, মহাবিদ্রোহের পিছনে জন সমর্থন ছিল না এ কথা জোরের সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক বলেন নি। অবশ্য জনসমর্থনের প্রকৃতি ও ব্যপকতা কেমন ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। সর্বশ্রেণীর মানুষ সমান ভাবে মহাবিদ্রোহকে স্বাগত জানায় নি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্রিটিশ শাসন সমর্থনকারী ইংরেজ ঐতিহাসিকরা শুধুমাত্র সরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে মহাবিদ্রোহকে জনসমর্থনহীন ভারতীয় সিপাহীদের উচ্ছৃংখল আচরণ ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের পরিবেশিত তথ্যে বিদ্রোহের প্রতি জনসমর্থনের চিত্রটি একেবারে বিলুপ্ত হয় নি।

সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীতা সংগ্রাম বা জাতীয় সংগ্রাম বলা যায় কি না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন মহাবিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দিতে হলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও মীমাংসার প্রয়োজন। এক, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী মানুষদের প্রকৃতি ও শ্রেণী কিরকম ছিল? দুই, নেতৃত্বের প্রকৃতি কেমন ছিল? তিন, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আন্দোলনের আবশ্যিক উপাদানগুলি কি ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহে উপস্থিত ছিল?

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের প্রকৃতি বর্ণনা করে রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে তিন ধরনের মানুষ এই বিদ্রোহের সামিল হয়ঃ ১. সিপাহীরা, ২. তালুকদার ও সামন্ত শাসকেরা এবং ৩. অসামরিক জনসাধারণ। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, চর্বি মাখানো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ভারতের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এখানে কোনো জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখা দেয় নি। তাঁর মতে চর্বি মাখানো টোটা ব্যবহারকে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা চরম ধর্মদ্রোহিতা মনে ক'রে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তিনি মনে করেন ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে ভারতীয় সিপাহীরা যে বিদ্রোহ করেছিল তাকে রাতারাতি দেশপ্রেমিক যুদ্ধ বা জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার economic motivation বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ব'লে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ সরকার বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সিপাহীদের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করত। অর্থাৎ কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারতীয় সিপাহীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। এই সুবিশাল সিপাহী বাহিনী নিতান্ত অল্প বেতনে কাজ করত। তাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। সেজন্য ইংরেজ সরকারের সিপাহীর বেতন ও চাকুরীর শর্তনীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীরা প্রথমে দিল্লী শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সিপাহীরা ইংরেজের বৈষম্যমূলক অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রধানত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ ততটা প্রবল ছিল না। সেজন্য বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাগুলিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহে জাতীয় সংগ্রামের মনোভাব লক্ষ্য করেন নি।

সিপাহী বিদ্রোহে কিছু জমিদার, তালুকদার এবং সামন্ত প্রধানেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার অযোধ্যার শাসকের বিদ্রোহকে লুপ্ত সম্পত্তি ফিরে পাবার বিদ্রোহ রূপে বর্ণনা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরানো জমিদার, তালুকদার ও সামন্ত প্রধানদের খাজনা আদায়ের অধিকার ইংরেজরা কেড়ে নিয়ে নতুন খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সেজন্য তালুকদার ও সামন্ত প্রভুরা সিপাহী ও অসামরিক জনসাধারণকে উত্তেজিত করে এবং ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহে যোগ দিতে উৎসাহিত করে। এখানে জাতীয় স্বাধীনতা অথবা জাতীয় সংগ্রামের পরিবর্তে হৃত সম্পত্তি ও খাজনা আদায়ের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সামন্ত শক্তি বেশি আগ্রহী হয়েছিল। সেজন্য রমেশচন্দ্র মজুমদার তালুকদার ও সামন্ত প্রভুদের অর্থনৈতিক প্রয়াসকে জাতীয় সংগ্রাম বলে আখ্যা দেন নি।

সিপাহী ও তালুকদারদের সঙ্গে অসামরিক জনগণের বিদ্রোহকে রমেশচন্দ্র মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে অসামরিক জনগণের বিদ্রোহ কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর মতে ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে অসামরিক জনবিদ্রোহ তেমনভাবে দেখা দেয় নি। যে সব অঞ্চলে অসামরিক জনসাধারণের বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সেখানেও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ভূস্বামীরা ইংরেজ শাসনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করেছিলেন। শিক্ষিত জনগণের বেশির ভাগ সিপাহী বিদ্রোহকে

সমর্থন করেন নি। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা স্পষ্টতই সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধী ছিলেন।

(রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে জাতীয় সংগ্রামের পিছনে সব সময় দেশপ্রেম, সুপরিকল্পনা, সংগঠন ও গভীর শৃংখলাবোধ থাকে। তাঁর মতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ভারতীয় সিপাহীরা তেমন কোনো দেশপ্রেম, পরিকল্পনা, সংগঠন ও শৃংখলাবোধ দেখায় নি। সেজন্য সিপাহী বিদ্রোহকে তাঁর মতে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া যায় না।)

(সুশোভন সরকার সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবোধকে উদারনীতিবাদ বা গণতন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা জাতীয় বোধের একমাত্র অভিব্যক্তির প্রকাশ নয়।) উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে দেশব্যাপী সুসংহত কেন্দ্রীয় এক রাষ্ট্র, নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, গণতান্ত্রিক সমাজ ও প্রজাশক্তি ইত্যাদি ধারণাগুলি তখন সাধারণ মানুষ ও বিদ্রোহীদের মনে জাগরিত হয় নি। এই সময় উচ্চমানের রাজনৈতিক ঐক্যবোধ ও জাতীয় ঐক্য চিন্তা জাগরিত না হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

(সুশোভন সরকার মনে করেন, বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহী ও জনগণের লড়াই, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একই ধরনের সংগ্রাম এবং বিদ্রোহের পিছনে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকাটা নিতান্তই সংগত। সিপাহী বিদ্রোহ জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্রোহকে জন সমর্থনহীন ভাবা কষ্টকল্পনা মাত্র।)

ফরাসী বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের সমার্থক মনে করা হয়। সেজন্য জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা উদ্গম না হলে কোনো সংগঠিত আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় না। সুশোভন সরকার মনে করেন জাতীয় রাষ্ট্র চেতনার নিরিখে সিপাহী বিদ্রোহকে হয়ত জাতীয় সংগ্রাম বলা যায় না। তিনি জাতীয় চেতনাকে জাতীয় রাষ্ট্র চেতনার সমার্থক মনে করার পক্ষপাতী নন। সেজন্য অনেক জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় সংগ্রামকে ফরাসী বিপ্লবের জাতীয় রাষ্ট্রের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় না।) ইতালীর কার্বোনারীগণ বহুদিন এক অখণ্ড ইতালীর নামে বিদ্রোহ করে নি। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনের গেরিলা ও রুশ কৃষকের প্রতিরোধকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ জাতীয় লড়াই বলেছেন, যদিও তার পিছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ না হয়েও

ইতিহাসে অনেক জাতীয় সংগ্রাম হয়েছিল। ভারতীয় সিপাহীদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না। কিন্তু তাদের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা ও ইংরেজ বিরোধী লড়াইকে জাতীয় সংগ্রাম বলা যায়।

সুশোভন সরকার মনে করেন মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য যে প্রয়াস হয়েছিল তাতে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখলে অসঙ্গত হবে না। 'আজমগড়ের ঘোষণায় সর্বশ্রেণীর ভারতীয়কে আহবান জানানো হয়েছিল বিশ্বাস-ঘাতক ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে। দিল্লীর ঘোষণাপত্রে হিন্দু-মুসলমান সকলকে হাত মেলাবার ডাক ছিল। বেরিলি ও দিল্লীর নেতাদের দৃষ্টি ছিল যাতে হিন্দুদের বিশ্বাসে আঘাত না লাগে। নেতাদের মধ্যে সকলেই স্বার্থ সন্ধানী একথাও ঠিক নয়, যদিও নেতাদের স্বভাব ও আচরণ থেকে বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা নিশ্চয়ই বিড়ম্বনামাত্র। তবুও ঝাঁসীর রাণীর বীরত্ব কেউ অস্বীকার করবে না; ফৈজাবাদের মৌলবীকে খাঁটি দেশভক্ত বলতে স্বয়ং ম্যালিসনের দ্বিধা হয় নি; ফিরোজ শাহের কীর্তিকলাপ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে।'

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে জাতীয়তাবোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি ধ্বনিত হয় নি। কিন্তু সারা ভারতে ইংরেজ শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষনের বিরুদ্ধে জনসমাজে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল। এই ধূমায়িত বিক্ষোভের কারণ ইংরেজ শাসনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা। পলাশীর যুদ্ধ থেকে একশো বছর পর্যন্ত ইংরেজ শাসন ও ভারতীয় পুরানো সমাজের মধ্যে সংঘাত বিদেশী শাসন-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই রকম রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বিক্ষুব্ধ জনগণকে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে উৎসাহিত ও ঐক্যবদ্ধ করে। সেজন্য সুশোভন সরকার মহা-বি[illegible]হকে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন।

সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের মূল্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। 'ভারত থেকে পাঠানো খবর' প্রবন্ধে মার্কস মহাঅভ্যুত্থানে মুসলমান, শিখ ও ব্রাহ্মণ সিপাহীরা 'সমস্বার্থে মিলেছে' এবং এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধারণ ঐক্য প্রসারিত হওয়ার ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। ১৮৫৭ সালে মার্কস অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, ব্রিটিশ শাসক 'যেটাকে সামরিক বিদ্রোহ বলে ভাবছে সেটা আসলে একটা জাতীয় বিদ্রোহ।' তিনি 'ভারত সংক্রান্ত প্রশ্ন' প্রবন্ধে বললেন 'বর্তমান ভারতীয় অশান্তিটা সামরিক হাঙ্গামা নয়, জাতীয় বিদ্রোহ'। তাঁর মতে বিদ্রোহী সিপাহীরা জাতীয় বিদ্রোহের

'ক্রিয়াশীল হাতিয়ার মাত্র'। অর্থাৎ অত্যাচার ও জুলুমে নিঃস্ব ও বিক্ষুব্ধ ভারতীয় জনগণের ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে। আর সিপাহীরা হাতিয়ার রূপে ধূমায়িত বিক্ষোভকে মহাবিদ্রোহ তথা জাতীয় বিদ্রোহে পরিণত করে। দেশজোড়া হিন্দু-মুসলমান ও শিখ সিপাহীদের প্রতিরোধের ঘটনাকে ইংরেজ রাজশক্তি কখনও ছোট করে দেখে নি। নির্মম অত্যাচারে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিদ্রোহীদের দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এই সব তথ্য মহাবিদ্রোহের জাতীয় চরিত্রের অভিব্যক্তি।

(১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে সামন্ত প্রতিক্রিয়া বলা যায় কি না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন। বলা হয়, গণবিক্ষোভের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র থাকা অসম্ভব নয়, তেমনি সবসময় জনঅভ্যুত্থান জাতীয় অগ্রগতি ঘোষণা করে না। রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাবিদ্রোহকে মধ্যযুগের বিশৃংখল সামন্ত-ব্যবস্থা ও ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীর আর্তনাদরূপে বর্ণনা করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লব।)

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কি না এ সম্পর্কে সুশোভন সরকারের অভিমত বিস্তারিতভাবে দেওয়া হল ঃ

'যে-যুগে ফিউডাল ধারণা যথেষ্ট শক্তিশালী তখনকার দিনের আন্দোলন অনেকটা ফিউডাল ভাবাপন্ন হবে এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মিউটিনিকে যখন ফিউডাল আখ্যা দেওয়া হয়, তখন আসলে ফিউডাল মানে প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতি-বিরোধ, এই বিশ্বাসের উপর জোর থাকে। অথচ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা উঠলে এই সমীকরণ আর মনে রাখা হয় না, যদিও সে-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ফিউডাল প্রভাবে আচ্ছন্ন।

'মহাবিদ্রোহের মধ্যে ফিউডাল ধ্যান-ধারণার অস্তিত্ব সহজেই লক্ষণীয়। তার পরিচয় পাই মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্থানীয় অভিজাত নেতার প্রতি আনুগত্য, অরাজক বিশৃংখলার আভাস, পশ্চিমী সংস্কার চেষ্টার প্রতিকূলতা ইত্যাদির ভিতর। কিন্তু সেই কারণে বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা অসঙ্গত। অস্ত্রের জোরে মুক্তি-সংগ্রামকে যদি বিধ্বস্ত না করা যেত, তবে তার মধ্য থেকে নূতন শক্তি ও নবধারণার উদয় কিছু অসম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ করতে হলে, ইংরাজ কর্তৃক নূতন করে ভারত জয়ে বাধা দিতে গেলে নূতন আত্মশক্তি, পশ্চিমী যুদ্ধ কৌশল, নবীন সংগঠন, দেশজোড়া সহযোগিতা ইত্যাদির অনিবার্য প্রয়োজন আসত। মহাবিদ্রোহ সফলতার দিকে এগিয়ে চললে যে এই নূতনের

বাস্তব আবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী হত এমন সিদ্ধান্ত চলে না। কিন্তু নূতন অগ্রগতির কোনোও সম্ভাবনা ছিল না এ-কথা ঐতিহাসিকের জোর দিয়ে বলা অনুচিত। শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা না ঘটে উপায় ছিল না, বিশেষ কোনও সংকট মুহূর্ত সম্বন্ধে এই বিশ্বাস ইতিহাসে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। আর সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল না মেনে নিলেও তাতে করে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি প্রমাণিত হয় না।

'তার কারণ এই যে বিদেশী শৃংখল থেকে মুক্তি এবং যে শাসনব্যবস্থাকে বহু লোক অত্যাচার মনে করে তার উচ্ছেদ—বিদ্রোহের এই সাধারণ লক্ষ্যকে সেদিনের অবস্থায় কিছুতেই ফিউডাল প্রতিক্রিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। ইংরেজ শাসনের প্রকৃতিকে যদি শোষণ মনে করি তবে তার বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের অভিযানকে প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া বলা নিরর্থক। বিদ্রোহের স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত রূপ থেকে এই প্রমাণ হয় যে চলতি অর্থে একে ফিউডাল নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থান বলা চলে না। ইতিহাসে সুপরিচিত সামন্ত-বিদ্রোহের ধরন অন্য জাতীয়।

'সেখানে শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান ও জনবিক্ষোভের দৃষ্টান্ত, বিদেশী প্রভুর বিরুদ্ধে দেশজোড়া লড়াই আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত বিরল। দেশে ফিউডাল-ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ রাজন্যবর্গের একজনও বিদ্রোহে যোগ দেন নি, অযোধ্যার বাইরে জমিদারদের মধ্যেও বেশির ভাগ সেদিন ইংরেজদের স্বপক্ষে। আসল ফিউডাল নেতারা বিদ্রোহে নেতৃত্ব করা দূরে থাক তাকে বানচাল করতেই ব্যস্ত আর বিদ্রোহীদের মধ্যে ফিউডাল ধারণার দুর্বলতা তাদের দুর্ভাগ্য হতে পারে, দোষ নয়।'

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে বলা যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া আখ্যায় ভূষিত করা কখনই সঙ্গত নয়।

১৮৫৭ সালে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাগত জানায় নি বা বিদ্রোহে যোগ দেয় নি। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ মহাবিদ্রোহে আলোড়িত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মনে মহাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বুঝেছিলেন যে সিপাহী অথবা সামন্ত প্রভুরা ইংরেজ শাসনে ফাটল ধরাতে পারবে না। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্রোহকে সরাসরি সমর্থন না করে ইংরেজ শাসকদের প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণের নিন্দা করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহের সময় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। শোনা যায়, তিনি বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

যদিও প্রকাশ্যে তিনি বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি বা বিদ্রোহীদের স্বাগত জানান নি। বলা যায় তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা প্রত্যেকে যথেষ্ট সাহস, তেজ ও স্বাধীন মতবাদ পোষণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সুউচ্চ গুণাবলীসম্পন্ন এবং চিন্তার জগতে প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারলেন না সে কথা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে সমসাময়িক বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা প্রাক-ব্রিটিশ যুগের নৈরাজ্যময় অবস্থার পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সোজা কথায় ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা সমসাময়িক বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে উদারনৈতিক ভাবধারার সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের জয়লাভ ও ইংরেজ শাসনের অবসানের মধ্যে তাঁরা মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার, টম পেইনের উদারনৈতিক ভাবধারার অবলুপ্তির আশংকা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন এই সব বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-বিরোধী চরমপন্থী মতাদর্শ বা কার্যকলাপ সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্য তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পাবেন নি। সেজন্য মহাবিদ্রোহের সংগ্রামী প্রকৃতি ও চরিত্র ব্যাহত হয় না।

৫ ওয়াহবী আন্দোলন

ওয়াহবী আন্দোলন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা ক'রে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ ওয়াহবী আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন। বিধর্মী শিখ ও ইংরেজ শাসনকে পরাস্ত ক'রে এই দেশে ওয়াহবীদের নেতৃত্বে পুনরায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করাই সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। তিনি বহু মুসলমান অনুগামীদের তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করেছিলেন। এই সঙ্গে তিনি নিয়মিত সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ক্রমশ তাঁর এ আন্দোলন রাজনৈতিক আকার ধারণ করতে থাকে। কোম্পানি শাসন তথা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে ওয়াহবীরা কতকগুলি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান অনুগামীদের

নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।[১]

ওয়াহবী আন্দোলনের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিত্তানা অঞ্চলে। ১৮২৭ সালে সৈয়দ আহমেদ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। চার বছর যুদ্ধ চালিয়ে তিনি নিহত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শক্তি শিখদের পরাজিত ক'রে পাঞ্জাব দখল করলে ওয়াহবী আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৮৩১-এ সৈয়দ আহমেদ নিহত হওয়ার পর তাঁর চিন্তাধারা ও সংগঠন মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা-অর্জন করে। ওয়াহবী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিধর্মী ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংস ক'রে ভারতকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করা। রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দিলে ওয়াহবীরা সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত নিজেদের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৪৭-এ ব্রিটিশ শক্তি ওয়াহবীদের পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করে।

পাটনার এনায়েত আলি ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতি পুনরায় চালিয়েছিলেন। তিনি ওয়াহবী সমর্থক খলিফাদের নির্দেশনামা জারি ক'রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার আহবান জানিয়েছিলেন। পাটনায় বিদ্রোহ প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। আহ্মদউল্লার নেতৃত্বে ৭০০ জন সশস্ত্র মুসলমান ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এনায়েত আলির সমর্থকেরা মীরাট, বেরিলি, দিল্লী এবং বাংলাদেশ ও বিহারের বহু জেলায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৫৩-এ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে ওয়াহবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে বহু মুসলমান যোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন। এনায়েত আলি অতি কষ্টে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

ওয়াহবী আন্দোলনের নেতারা মুসলমানদের সামরিক প্রশিক্ষণ দানের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী সংগীত ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় ওয়াহবীরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহী সৈনিকদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগও রেখেছিলেন। সিত্তানার শক্ত ঘাঁটি থেকে ওয়াহবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। অবশ্য ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় ওয়াহবীরা সংগঠনগতভাবে বিদ্রোহী সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দেন নি। যদিও স্থানীয়ভাবে তাঁরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিত্তানা ঘাঁটিটি ব্রিটিশ শাসকদের কাছে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ব্রিটিশের সামরিক

বাহিনী কমপক্ষে ষোলো বার আক্রমণ চালিয়েছিল। সিত্তানা ঘাঁটি আক্রমণে ব্রিটিশ শক্তি ৩৩,০০০ নিয়মিত সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় বিপুল ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াহবীরা সিত্তানা ঘাঁটি রক্ষা করেছিলেন। ১৮৫৮-এ পুনরায় সিত্তানা ঘাঁটি ব্রিটিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বারবার ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলেও সিত্তানার ওয়াহবীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সময় ওয়াহবীদের নতুন নেতা আব্দুল্লাহ তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালিয়েছিলেন। ১৮৬৩-তে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী আমবেলা পাসের মধ্য দিয়ে অভিযান চালালে ওয়াহবীদের প্রবল প্রতিরোধের সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এই সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বহু লোক নিহত হয়। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত ওয়াহবীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী বহুবার অভিযান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

সামরিক অভিযান চালিয়ে ওয়াহবী আন্দোলনকে দমন করতে না পেরে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়াহবী নেতাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করেছিল। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত আমবালা, পাটনা, মালদা ও রাজ-মহলের প্রথম সারির ওয়াহবী নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার চালিয়ে তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় ১৮৭০ থেকে ওয়াহবী আন্দোলন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ল। ওয়াহবী আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভিত কাঁপিয়েছিল। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের তুলনায় ওয়াহবী আন্দোলন অনেক সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত ছিল। বাংলাদেশ থেকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত ২,০০০ মাইল ব্যাপী ভূখণ্ডে প্রবল ব্রিটিশবিরোধী সামরিক সংগঠন সৃষ্টি করে ওয়াহবী আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। ওয়াহবী সমর্থকেরা নিয়মিত কর খাজনা সংগ্রহ ক'রে সুদূর সিত্তানায় পাঠাতেন। ভারতে ব্রিটিশ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরও অর্থ ও যোদ্ধা সংগ্রহ ক'রে ওয়াহবী আন্দোলন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

ওয়াহবী আন্দোলনের প্রধান কৃতিত্ব হল ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মতাদর্শ সৃষ্টি করে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা। উনিশ শতকে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম ওয়াহবীরাই পরিচালনা করেছিলেন। অবশ্য ওয়াহবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শক্তির অবসান ঘটিয়ে ভারতে মুসলমান শাসন কায়েম করা। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ওয়াহবী আন্দোলন পরিচালিত হলেও ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা

অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।'

ওয়াহবী আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছিল। বারাসতের ওয়াহবীদের নেতা ছিলেন তিতুমীর। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিতুমীর গোপনে চব্বিশ-পরগণা ও নদীয়া জেলায় কোন কোন অঞ্চলে সৈয়দ আহমদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচারে হাজার হাজার স্থানীয় মুসলমান কৃষক সাড়া দেয়। ওয়াহবীদের প্রচারিত ধর্মে সাম্য ও মৈত্রীর উচ্চ আদর্শ ঘোষিত হয়েছিল। জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশের দারোগাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে গরীব মুসলমান কৃষকদের মনে ওয়াহবী আদর্শ সাড়া জাগিয়েছিল। দলে দলে তাঁরা তিতুমীরের পতাকাতলে সমবেত হন।

বাংলাদেশের ওয়াহবী আন্দোলনটি মূলত কৃষক সংগ্রাম হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান জমিদারেরা তীব্র ওয়াহবী-বিরোধী হয়ে উঠল। বিদ্রোহী ওয়াহবীরা কয়েকটি সশস্ত্র বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। কিছুদিনের মধ্যে বিদ্রোহীরা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। বারাসত ও নদীয়ার সরকারি কর্মচারীরা এই বিদ্রোহের খবর কলকাতায় পাঠাল। তার ফলে ১৮৩১-এ কলকাতা থেকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী-কে বিদ্রোহ দমনে পাঠানো হ'ল। প্রথমে ওয়াহবী বিদ্রোহীদের কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় হয়। তারপর কলকাতা থেকে বিপুল সংখ্যায় সামরিক বাহিনী বারাসত ও নদীয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তিতুমীর নিহত হন। তিতুমীরের সহযোগী ওয়াহবীদের গেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ওয়াহবী আন্দোলন ক্ষীণ হয়ে গেলেও তিতুমীরের ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্য চব্বিশ-পরগণা ও নদীয়ার কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৬. ফরাজী আন্দোলন

চব্বিশ-পরগণা ও নদীয়ায় তিতুমীরের বিদ্রোহ দমনের পরও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ওয়াহবী নেতাদের প্রচার চলতে থাকে। ফরিদপুরের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকারীরা ফরাজী নামে পরিচিত। ওয়াহবী আন্দোলনের মতই ফরাজী আন্দোলনে মূল শক্তি ছিল দরিদ্র মুসলমান কৃষকেরা। ফরাজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরিয়ৎউল্লা। তিনি মক্কায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে ধর্মসংস্কারক হিসাবে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুধু মিঞা ফরাজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

হাজী শরিয়ৎউল্লা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দার-উল-হারব্ বা বিধর্মী শাসিত দেশ ব'লে বর্ণনা করেন। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী বিধর্মীর শাসনে কোন মুসলমান বসবাস করতে পারে না। তাঁর মতবাদ স্পষ্টতই রাজনৈতিক লক্ষ্যে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর পুত্র দুধু মিঞা আরো বেশি পরিমাণে রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন। তিনি সারা পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য কর-খাজনা সংগ্রহ করার দায়িত্ব দিয়ে একজন ক'রে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। দুধু মিঞার খলিফা ও সর্দাররা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতেন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ধর্ম আন্দোলন চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। কোম্পানি শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ফরাজী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল।

দুধু মিঞা ও তাঁর খলিফারা গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতেন যে আল্লার রাজ্যে বড়লোক-গরীব ও উচ্চ-নীচের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তাই গরীবের ওপর কর ধার্য করার কোন অধিকার বড়লোকের নেই। দুধু মিঞা জমিদারের অত্যাচার ও উৎপীড়নে নিগৃহীত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলার জমিদার ও নীলচাষ মালিকদের মধ্যে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হিন্দু জমিদার পূজাপার্বণের জন্য কর ধার্য করলে দুধু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকেরা এই বেআইনী কর দিতে অস্বীকার করে।

পূর্ব বাংলার নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার থেকে দুধু মিঞা কৃষকদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত দুধু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকেরা বহুবার জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে ফরাজীরা অনেক নীলকুঠি ও জমিদারের কাছারি লুঠ করেছিল। সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার অভিযোগে দুধু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হলে তার বিরুদ্ধে একজনও সাক্ষী দিতে রাজী হ'ল না। ফলে তিনি আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস হয়ে যান। মহাবিদ্রোহের সময় সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ ক'রে কোম্পানি শাসনকে বেকায়দায় ফেলতে পারে এই অভিযোগে দুধু মিঞাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়।

ওয়াহবী আন্দোলনের মত ফরাজী আন্দোলনও ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্য বিধর্মী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান জনমত সংগঠিত ক'রে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে। ওয়াহবী আন্দোলন মূলত

কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ফরাজী আন্দোলন কোম্পানির শাসন, জমিদার ও নীলকুঠি সাহেবদের দরিদ্র কৃষকের শত্রুরূপে চিহ্নিত করে। সেজন্য ফরাজী আন্দোলন ইংরেজ শাসন এবং জমিদার ও নীলকুঠি সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল।

৭. উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষির অবস্থা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের গ্রামীণ সমাজ, কৃষকের অবস্থা ও কৃষি অর্থনীতি সংকটাপন্ন হ'য়ে পড়েছিল। একশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও ভূমি-রাজস্ব নীতি ভারতের কৃষিব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। প্রাক্-ব্রিটিশযুগে ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকের অবস্থা পলাশীর যুদ্ধের পর একশো বছরের ঔপনিবেশিক আমলে একেবারে শোচনীয় হ'য়ে পড়ে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের পরিশ্রমে উৎপন্ন খাদ্য ও কৃষি সামগ্রী ছিল গ্রামীণ সমাজের প্রধান সম্পদ। জমির সঙ্গে কৃষকের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। অবশ্য আধুনিক অর্থে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে যে অধিকার বোঝায় সেই রকমের মালিকানা স্বত্বের তখন বিকাশ ঘটে নি। সমগ্র উত্তর ভারতে পঞ্চায়েতী কর্তৃত্ব ছিল গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য। এখানে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। সেজন্য সমস্ত গ্রামবাসী সমষ্টিগতভাবে সামন্ত কর্তৃত্বকে ভূমি-খাজনা দিত। অর্থাৎ স্বয়ং-শাসিত গ্রামীণ সমাজ প্রচলিত ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে। অবশ্য মধ্য-ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারতের বাংলা ও আসাম অঞ্চলের জমিগুলি ছিল পৃথক পৃথক এবং প্রতি খণ্ড জমির খাজনা ধার্য হত পৃথক ভাবে।

এই অঞ্চলগুলিতে প্রত্যেকটা গ্রামে মোড়লদের বেশ প্রভাব ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে গ্রামীণ সমাজ ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। গ্রামের অর্থনীতি সেই গ্রামীণ সমাজকে ঘিরে আবর্তিত হ'ত। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য সেই গ্রামের অধিবাসীরাই ভোগ করত। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামের বাইরের বৃহত্তর সমাজে যেত না। শুধুমাত্র লবণ ও মশলা ছাড়া অপর কোন পণ্য দ্রব্য আমদানির প্রয়োজন দেখা দিত না। এক কথায়, স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামগুলি ভোগের জন্য উৎপাদন করত। ভারতের শহরগুলিতে কারিগর শ্রেণী যে সব শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করত সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেশের বাইরে রপ্তানি বাণিজ্যে

চালান যেত। স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে গ্রাম আর শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক আদান-প্রদান গড়ে ওঠে নি।

ভারতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের অস্তিত্বের ফলে সামন্ত সমাজের মূল ভিত্তিটি ভেঙ্গে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের শহরে বাণিজ্য-পুঁজিকে কেন্দ্র করে যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে তা শিল্প-পুঁজি স্তরে যেতে পারে নি। এই বুর্জোয়া শ্রেণী জন্ম থেকেই শহরের মধ্যে সীমিত রইল। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রাতে আক্রমণ করতে পারলেও বুর্জোয়া শ্রেণী এই সমাজের মূল ভিতকে ভাঙতে পারে নি।

কোম্পানি আমলের ইংরেজ শাসন ভারতে ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্বের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষিতে রূপান্তর এনেছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে খাজনা হিসেবে সামন্ত কর্তৃত্বের প্রাপ্য ছিল বাৎসরিক উৎপাদনের একটি অংশ। এই খাজনা আবার অজন্মা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি অস্বাভাবিক কারণের জন্য শিথিল বা মকুব করা হত। ইংরেজ আমলে ভূমি-খাজনা ব্যবস্থাকে মুদ্রার পরিমাপে সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়। এই খাজনা আবার ভূমির পরিমাপের সঙ্গে সুনির্দ্দিষ্ট করা হল। এখন থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য ভূমি-খাজনা কোন মতেই রেহাই করা হত না। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমি-ব্যবস্থা ও খাজনা-নীতির ফলে কৃষক খাজনাদানকারী প্রজায় রূপান্তরিত হ'ল। এই প্রজা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মালিকানায় রইল, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রিটিশের সৃষ্টি করা নতুন ভূস্বামীর মালিকানার অধীনে চলে গেল।

ইংরেজ শাসনে ব্রিটিশ-ধাঁচের ভূস্বামী ব্যবস্থা (landlord system) প্রবর্তিত হ'ল। ফলে জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হ'ল এবং জমি বিক্রি, বন্ধকী, দান-পত্র করা সম্ভব হল। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ল। ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার এই রূপান্তরের ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কার্যতঃ সমগ্র ভূমির চূড়ান্ত অধিকারী হল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীন কৃষককে নির্ভরশীল প্রজায় পরিবর্তন করল। সেই সঙ্গে মনোনীত ব্যক্তিদের নতুন ভূস্বামীরূপে সৃষ্টি করল। এই ভূস্বামীরা আবার ভূমি-রাজস্ব সময়মত দিতে না পারলে জমি হারাত। এক সময়ের জমির মালিক কৃষকেরা নতুন ব্যবস্থার কল্যাণে প্রজায় রূপান্তরিত হল। কৃষকদের জমি ক্রমশঃ খাজনা

ও ঋণের দায়ে হাতছাড়া হতে লাগল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কৃষক শ্রেণীর বিপুল অংশ ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হ'ল।

কোম্পানি আমলের ইংরেজ শাসনে তিন ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা (land-tenure) প্রবর্তিত হল। প্রথমত, বাংলা, বিহার এবং মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চলে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র সীমানার উনিশ ভাগ অঞ্চলে বিস্তৃত হল। দ্বিতীয়ত, সমগ্র উত্তর প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশভুক্ত অঞ্চলগুলিতে এবং বোম্বাই ও পাঞ্জাবে অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এই ব্যবস্থা ভারতের প্রায় তিরিশ ভাগ অঞ্চলে কায়েম করা হল। তৃতীয়ত, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বেশির ভাগ অঞ্চলে এবং বেরার, সিন্ধু, আসাম ও অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে রায়তওয়ারী ভূমি ব্যবস্থার পত্তন করা হল। এই ব্যবস্থা ভারতের একান্ন ভাগ অঞ্চলকে আবৃত করেছিল।

মোট কথা, ব্রিটিশ ভারতের উনপঞ্চাশ ভাগ অঞ্চলে জমিদারী ব্যবস্থা (land-lordism) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের অবশিষ্ট একান্ন ভাগ অঞ্চলে কার্যত ক্ষেত্রে জমিদারী ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্তরে জমিতে মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মহাজন কর্তৃক কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত প্রকারান্তরে জমিদারী প্রথাকে ভিন্নভাবে রায়তওয়ারী অঞ্চলগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। রায়তওয়ারী ভূমিব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকের সরাসরি খাজনা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা ছিল। কার্যতঃ ক্ষেত্রে দেখা গেল সরকার ও উৎপাদনে নিযুক্ত কৃষকদের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী এবং মহাজন-সুদখোরেরা এসে গেছে। যার ফলে জমিদারী ব্যবস্থার সমস্ত কুফলগুলি রায়তওয়ারী অঞ্চলগুলির কৃষি অর্থনীতিতে এসে পড়ল।

জমিদারী ও রায়তওয়ারী অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রকৃত কোন ব্যবধান না থাকায় ক্রমশঃ সমান ভাবে সামাজিক স্তরভেদের বিকাশ ঘটতে থাকে। যার ফলে সারা ভারতে বড়ো, মাঝারি, গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের সামাজিক স্তরের উদ্ভব ঘটেছিল। ভারতের গ্রামীণ সমাজে দেখা দিল একদিকে জমিদার, সুদখোর-মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীর নির্মম শোষণ, অপরদিকে বড়, মাঝারি, গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের সামাজিক অবস্থান। কৃষকশ্রেণীর মধ্যে আবার বড় কৃষকের শোষণ মাঝারি, গরীব ও ভূমিহীন কৃষককে দুর্গতির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট এবং কৃষিসংক্রান্ত সরকারী প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে উনিশ শতক থেকে ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত নয় এমন খাজনাভোগীর

(non-working rent receivers) সংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে, অথচ চাষের জমি-সম্পন্ন উৎপাদনরত কৃষকের (cultivating owners) সংখ্যা প্রায় এক চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছে। সেই সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের (landless labours) সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ থেকে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে ভারতের বেশির ভাগ কৃষক চরম দারিদ্র্য ও শোষণের কবলে পড়েছিল।

গ্রামীণ সমাজে সব চেয়ে বেশী অবহেলিত জনগোষ্ঠী হল আদিবাসী ও হরিজন কৃষকেরা। এদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও সুদখোর মহাজন এই সব মানুষদের চরম দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মুখে ঠেলে দেয়।

ব্রিটিশ শাসন এবং নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় কৃষকদের ঋণভার গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বছরের পর বছর ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছিল। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে জানা যায়, কৃষকশ্রেণীর এক তৃতীয়াংশ গভীর ভাবে ঋণভারে জর্জরিত। এই ঋণভার জ্যামিতিক গতিতে অগ্রসর হয়ে কৃষক শ্রেণীকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল। সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায় যে, কৃষকদের ঋণের জন্য শতকরা দু'শো থেকে তিন'শো টাকা হারে সুদ নিতে হ'ত। সরকারকে খাজনা ও ভূমি-কর দেবার জন্য কৃষকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহাজনের কাছ থেকে চড়া হারে ঋণ নিত। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কৃষকের চরম দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হত। অজন্মা, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদন না হলেও কৃষকেরা জমিদার ও সরকারের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মেটাত। ব্রিটিশ আমলে আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে খুব সহজেই ঋণ পরিশোধে অপারক কৃষকদের জমি মহাজন, মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদারের কাছে চলে যেত।

ভারতের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে মহাজনের দোর্দণ্ড প্রভাব কৃষক শ্রেণীর অবস্থাকে আরো সঙ্গীন করে তুলেছিল। কৃষকের জমি অকৃষক শ্রেণীর কাছে হস্তান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েছিল। এইভাবে ঋণভার বৃদ্ধি, জমির বন্ধকী, জমি বিক্রয় ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কৃষকশ্রেণীর অধিকাংশের আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠেছিল। উনিশ শতকে ইংরেজ প্রণীত প্রজা আইনগুলি (tenancy legislation) গরীব, মাঝারি কৃষক এবং ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা করেছিল। এই প্রজা আইনগুলির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রামীণ সমাজের জমিদার,

মধ্যস্বত্বভোগী, মহাজন ও বড় কৃষকরা নিয়েছিল। এমনকি 'রয়্যাল কমিশন অন এগ্রিকালচারের' প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে কৃষকদের ঋণের সমস্যা প্রচলিত আইনগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। জমি ও প্রজা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রণীত আইনগুলিতে প্রচুর অর্থব্যয়ে বিচার পাওয়া যেত। গরীব ও মাঝারি কৃষকের পক্ষে জমিদার মহাজন ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নি। সেজন্য আইন ও আদালতের পূর্ণ সুযোগ গ্রাম্য মহাজন ইত্যাদিরা নিয়েছিল।

জমিতে উৎপাদনকারী কৃষক (peasant cultivator) যতদিন না পর্যন্ত ভূমিহীন কৃষক বা ক্ষেতমজুরে পরিণত হ'ত ততদিন তাকে তিনটি গুরুতর বোঝা বহন করতে হয়েছিল। আদিম ধরনের কৃষি সরঞ্জাম দিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কৃষক যে ফসল উৎপাদন করত তার বেশির ভাগ অংশ চলে যেত তিনটি গুরুভার বহন করায়। কৃষি উদ্বৃত্ত বলতে কিছুই থাকত না। সরকারের ভূমি-রাজস্বের চাহিদা পরোক্ষে ও চূড়ান্ত ভাবে কৃষককে বহন করতে হত। জমিদারের খাজনার চাহিদার বোঝা কৃষকের মাথায় এসে পড়ত। জমিদারী অঞ্চল ছাড়া ভারতের রায়তওয়ারী অঞ্চলে নতুন ধরনের পরোক্ষ জমিদারী ব্যবস্থার বোঝা কৃষককে বহন করতে হ'ত। সুদখোর মহাজনের অত্যধিক চড়া হারে সুদের বোঝা নত মস্তকে বহন করতে হ'ত কৃষি উৎপাদনেরত কৃষকদের। এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার, জমিদার শ্রেণী এবং মহাজনের চাহিদা মেটাতে গিয়েই কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল।

৮. কৃষক বিদ্রোহ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি বোঝা বহন করতে হয়েছিল ভারতের কৃষক শ্রেণীকে। কৃষক শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দুর্গতি চরম আকার ধারণ করেছিল। সৌভাগ্যের কথা ভারতীয় জনসাধারণের সুবিশাল অংশ এই কৃষক শ্রেণী কখনও অবনত মস্তকে ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। প্রায় সব সময় কৃষকদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহের কাহিনী আজও সম্যকরূপে উন্ঘাটিত হয়নি। ভারতে ও ইংল্যাণ্ডের সরকারী নথিপত্রে এবং আঞ্চলিক লোকসাহিত্যে এই বিদ্রোহগুলির তথ্য লুকিয়ে আছে। তবুও বেশির ভাগ বিদ্রোহের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি

বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে ঔপনিবেশিক ভূমিনীতি ও কৃষি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় কৃষক সমাজ বিদ্রোহ ক'রে তাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে।

ক. নীলকর বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃতিতে এক পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময় থেকে সুস্পষ্ট ভাবে কৃষকেরা সরাসরি বিদেশী ভূস্বামী, দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিদ্রোহ শুরু করল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রধান কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে উল্লেখ করা যায় নীল বিদ্রোহকে। নীল বিদ্রোহের বন্যায় সারা বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি কারবারের নীল ছিল প্রধান পণ্য দ্রব্য। পরে কোম্পানি ব্রিটিশ বণিকদের হাতে নীলের ব্যবসা ছেড়ে দেয়। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুতী কাপড় রং করার প্রয়োজনে ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। নীলকর সাহেবরা এদেশে চাষ ক'রে সেই নীল বিলাতে রপ্তানি করত এবং প্রচুর মুনাফা লুটত।

ব্রিটিশ নীলকরেরা নীলচাষের জন্য জমিদারের কাছ থেকে মধ্যস্বত্বের অধিকার কিনে নিয়ে কৃষকদের খাদ্য কৃষিপণ্যের পরিবর্তে নীলচাষে বাধ্য করত। নীলকর সাহেবরা কৃষকদের দাদন দিত এবং নীলের বিক্রয় মূল্য ধার্য করত। বাজারে যোগান-চাহিদা নিয়মের পরিবর্তে নীলকরদের ধার্য দামে নীলচাষীদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে হত। কৃষিপণ্যের অন্যান্য সামগ্রী অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নীলের ধার্যমূল্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে ১৮৫৯-৬০ সালে নীলচাষীদের চাপা অসন্তোষ প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল। নীলচাষীদের বঞ্চনার কোনো শেষ ছিল না। কারণ আইন ও আদালত ছিল কৃষকদের নাগালের বাইরে। আইনের রক্ষা ও প্রয়োগের ভার যে সব ইংরেজ হাকিমদের উপর ন্যস্ত থাকত, তারা ছিল বেশির ভাগই নীলকরদের বন্ধু। ফলে, আইন ও বিচার ব্যবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রহসনে পরিণত হয়েছিল।

কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন পাদরী লঙ্ নীল বিদ্রোহের কতকগুলি কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে কৃষিপণ্য সমেত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হতে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং বঞ্চিত কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহানুভূতি প্রভৃতি কারণগুলি নীলচাষীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণায় উৎসাহিত করেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রভাব

নীল-কৃষক বিদ্রোহে যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল এমন অনুমান কোনো কোনো ঐতিহাসিক করে থাকেন।

১৮৫৯-৬০ সালের নীলবিদ্রোহে ইংরেজ নীলকরদের অস্বাভাবিক চুক্তি-প্রথা নীল-চাষীদের নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে ফেলেছিল। সাধারণভাবে বাগিচা শিল্প-গুলিতে বাইরে থেকে নিয়ে আসা শ্রমিকদের দিয়ে চাষের কাজ করানো হ'ত। কিন্তু নীলচাষের ক্ষেত্রে ইংরেজ নীলকরেরা জমির কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য ক'রে এক অস্বাভাবিক চুক্তির প্রবর্তন করল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীলচাষীরা ছিল অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলী তারা বুঝত না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন মূল্যের কমে উৎপন্ন নীল বিক্রি করতে বাধ্য হত। ইংরেজ নীলকরেরা জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব কিনে নিয়ে দ্বৈত শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। জমির মালিক ও নীল-উৎপাদকের দ্বৈত ভূমিকায় তারা নীলচাষীদের উপর চরমতম শোষণ চালিয়েছিল।

দেখা গেল, ধান উৎপাদনে বেশি লাভ হলেও চুক্তিবদ্ধ নীলচাষীরা শুধুমাত্র নীল উৎপাদনে বাধ্য হত। উৎপাদনের জন্য আগাম দান বা দাদন প্রথা নীলচাষীদের পাহাড় প্রমাণ ঋণভারে জর্জরিত করেছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সের বিতর্কে জানা গেছে যে নীলচাষীদের ঋণের বোঝা পুরুষানুক্রমে বর্তাত। এক কথায় নীল চাষীরা জানত না তাদের ঋণের পরিমাণ, শুধুমাত্র পুরুষানুক্রমিক-ভাবে ঋণের বোঝা বহন করে চলত।

যশোর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি যে সব জেলায় নীলচাষ বেশি হত সেখানে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রাণের দায়ে চাষীরা নীল-কুঠির ওপর হামলা শুরু করে দিল। নীলকরদের ব্যবসা ও নীল আদান-প্রদান চাষীদের প্রতিরোধে বন্ধ হয়ে গেল। চাষীরা জমিতে নীল গাছ উপড়ে ফেলল। কোন কোন জায়গায় কৃষক অত্যাচারের প্রতীক নীলকুঠিগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হল। এই সময়ে নীল ব্যবসার হিসাবের খাতাগুলি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হল। নীলচাষীরা বর্শা, তরবারি, বাঁশের লাঠি আর ঢাল নিয়ে সরকারী অফিস, স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি প্রভৃতির উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীলচাষীরাই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। এঁরা ছিলেন দুই ভাই। নীলকুঠিতে কাজ করার সময় এঁরা গরীব প্রজাদের উপর নীলকর সাহেবদের ভয়ংকর অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নীলকরদের

অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁরা নীলকুঠির চাকরি থেকে ইস্তফা দেন এবং বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্বদানে অগ্রণী হন। নীলবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান নীলচাষী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিল। মালদহের ফরাজী নেতা রফিক মণ্ডল নীলচাষীদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন।

সমসাময়িক বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা নীলবিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। যশোরে নীলচাষীদের পাশে দাঁড়ালেন শিশির কুমার ঘোষ। তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করে নীলচাষীদের দুর্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ নীলচাষীদের জোরালো সমর্থক হয়ে উঠলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে নীলচাষীদের ভয়ংকর অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি 'ইণ্ডিগো কমিশনে'র কাছে স্বীকার করলেন তাঁর নীলচাষীদের প্রতি সক্রিয় সমর্থনের কথা। তিনি চাষীদের পক্ষ থেকে মামলা চালাবার জন্য উকিল-মোক্তার নিয়োগের কাজে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই সময়ে মোক্তাররা আদালতে নীলচাষীদের সমর্থন করলে তাঁদের কৃষক-বিদ্রোহের সমর্থক বলে নীলকর সাহেবরা চিহ্নিত করত। ফলে মোক্তারেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। জনৈক মোক্তারকে নীলচাষীদের মামলা আদালতে পরিচালনা করার জন্য প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

নীলকর সাহেবদের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, ক্রমশঃ সেই ঘৃণা সাহিত্যে প্রকাশ পেল। তার ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হল। এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকটি লিখলেন। নাট্যকার সরকারী কর্মচারী হওয়ায় প্রকাশিত নাটকে তাঁর নাম মুদ্রণ করা সম্ভব হল না। 'নীল দর্পণ' নাটকের কাহিনী বিদ্যুৎ বেগে মুখে মুখে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। নাটকটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজী অনুবাদ করলেন এবং সেটি পাদরী লঙ্-এর নামে প্রকাশিত হল। এর জন্য পাদরী লঙ্-কে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় ও এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। অবশ্য জরিমানার টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ দিয়েছিলেন।

পাদরী লঙ্ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা নীলবিদ্রোহের সমর্থনে আরও সরব হয়ে উঠলেন। ব্যাপক নীলবিদ্রোহ ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ইংরেজ শাসকদের শঙ্কিত করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা নীলকর সাহেব, সরকারী কর্মচারী ও 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে নিয়ে নীলচাষ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটিকে ক্ষতিয়ে দেখে সুপারিশ করার জন্য ১৮৬০ সালে 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন করল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাদরী লঙ্ ও অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা 'ইণ্ডিগো কমিশনের' কাছে তাঁদের বক্তব্য জোরালো ভাবে পেশ করলেন। এই কমিশনের সামনে নীলবিদ্রোহের নেতারাও তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। দেশের জনমত নীলচাষ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বইতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত বহু-নিন্দিত এই প্রথাটিকে তুলে দেওয়া হয়। নীলচাষ প্রথা অবসানের পিছনে ইংরেজ সরকারের কোন অবদান ছিল না। জনমতের চাপেই সরকার নীলচাষ প্রথার অবসান ঘটায়। সরকার বাধ্য হ'য়ে তখন একটা ঘোষণাপত্র জারি করে। এই ঘোষণাই ছিল নীলবিদ্রোহের জয়লাভের ও সফলতার নিশ্চিত স্বীকৃতি। তার ফলে কেবল বাংলাদেশে নয়, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অনেক জেলাতেও নীলচাষ উঠে গেল।

খ. জমিদারবিরোধী কৃষক বিদ্রোহ

নীলচাষ প্রথা পূর্বভারত তথা বাংলার নীলচাষীদের মনে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়েছিল। ঠিক তেমনই ভারতের বিরাট অংশ জুড়ে নতুন সৃষ্টি করা জমিদারী প্রথার শোষণ, অত্যাচার ও অনাচার কৃষকদের মনে নিদারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। জমিদারী প্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয়। কারণ জমিদারী প্রথা ভারতে যে নূতন অর্থনৈতিব ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল আধা-উপনিবেশিক শোষণ। আগে বলা হয়েছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চল সমূহের বাইরে রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় কার্যতঃ ক্ষেত্রে দেখা দিল এক নতুন ধরনের জমিদারীতন্ত্র ও মধ্যস্বত্বভোগীতন্ত্র। ভারতের কৃষক উনিশ শতকের মধ্যভাগে সকল রকমের জমিদারীতন্ত্রের নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করেছিল।

উনিশ শতকের সত্তর দশকে বাংলার জমিদারেরা যথেচ্ছভাবে জমির খাজনা চড়া হারে ধার্য করল। ১৮৫৯ সালে সরকার কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল রেণ্ট এ্যাক্ট' বা দশম আইন নামে একটি আইন প্রবর্তন করল। এই আইন প্রবর্তনের ফলে কৃষকের অবস্থা উন্নতি হওয়াত দূরের কথা বরং অবস্থা আরও খারাপ হতে আরম্ভ করল। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথাকে অক্ষুন্ন রেখে কোনো কৃষি-সংক্রান্ত প্রজা আইন কৃষকের প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে পারে না। নতুন দশম আইনে জমিদারেরা জমির দখলীস্বত্ব যাতে প্রজার উপর চলে না যায় সেজন্য ১৮৬০ থেকে

১৮৭৫ সালের মধ্যে বাংলার সর্বত্র নিজেদের খুশীমত খাজনা বাড়াতে আরম্ভ করে। এইভাবে কৃষকদের উপর উচ্চহারের খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জমিদাররা নিজেদের দখলী স্বত্ব কায়েম করেছিল। এই সময়ে জমিদারকে দেয় কৃষকের খাজনার পরিমাণ দাঁড়ালো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ধার্য করা সরকারকে দেয় রাজস্বের পনেরো থেকে একশো-সত্তর গুণ বেশি।

যথেচ্ছভাবে খাজনার হার বাড়িয়ে জমিদারেরা সন্তুষ্ট রইল না। সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে একুশ রকমের পার্বণি, খরচা, কর, সেলামি, বেগার, জরিমানা, নজরানা প্রভৃতি আর্থিক বোঝা প্রজাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল বাংলার জমিদারেরা। জমিদারের বিবাহ, পাল-পার্বণ, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, পাইক-বরকন্দাজ রক্ষা, কাছারি-খরচ, দাখিলা-খরচ, ডাক-খরচ, আয়কর প্রদানের মত নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খরচ-খরচার সমস্ত বোঝা প্রজাদের বহন করতে হত।

বেআইনী কর ও চড়ামাত্রায় খাজনা ধার্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল ফরিদপুর, মালদা, বগুড়া ও পাবনার কৃষকেরা। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল। কৃষকেরা খাজনা বৃদ্ধি, আবোয়াব বৃদ্ধি ও জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ক্রমশঃ একটি ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করল। কারণ কৃষকেরা মুখ বুজে খাজনা বৃদ্ধি ও জমিদারের জুলুম সহ্য করল না। পাবনার প্রায় দুশো চল্লিশটি গ্রামে কৃষকেরা বিদ্রোহ করল। বিদ্রোহীরা বাড়তি হারে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিল। সব রকমের অন্যায় কর দেওয়া স্থগিত করল। তাদের কাছ থেকে জোর করে জমিদারেরা যে কবুলিয়ত আদায় করেছিল সেগুলি তারা পুড়িয়ে দিল।

পাবনার বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক যৌথভাবে যোগ দিয়েছিল। তারা ঈশান রায় নামে জনৈক কৃষক নেতাকে বিদ্রোহী রাজা বলে ঘোষণা করেছিল। বিদ্রোহী কৃষকেরা জমিদারের কর খাজনা বন্ধ করে সরাসরি জমিদারী ব্যবস্থা অবসানের দাবী তুলেছিল। পাবনার বিদ্রোহ বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকের মনে দারুণ ভীতি সঞ্চার করেছিল। সমসাময়িক বাংলার সাময়িক পত্রিকাগুলি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা ফলাও করে ছাপিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর রিচার্ড টেম্পল তাঁর সরকারী প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে Leagues and Unions বলে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ বিদ্রোহে তিনি কৃষকদের সংগঠিত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের

কৃষকেরা ১৭৮২ সালে বিদ্রোহ ক'রে সুমহান ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার কৃষকেরা জমিদারী জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ইংরেজ সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহ দমন করল। সাময়িকভাবে দমিত হলেও পরবর্তী বছরগুলিতে বিদ্রোহের আগুন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পায় নি। কিন্তু ১৮৭০ দশকের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা প্রবলভাবে সমর্থন করেছিলেন।

গ. মহারাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহ

মহারাষ্ট্রের পুণা ও আহমেদনগরে বড় ধরনের কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৭৫ সালে। ভূমি রাজস্বের ব্যাপারে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে সরকারের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি বন্দোবস্ত হয়েছিল। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও সরকারের ধার্য রাজস্বের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে অধিকাংশ কৃষক মহাজনের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ ক'রে খাজনা মেটাত। সেজন্য দেখা গেল কৃষকেরা মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রাখতে আরম্ভ করল। বন্ধকী জমী পুনরুদ্ধার করা আর সম্ভব হল না। ফলে মহাজনেরা ক্রমশঃ জমির মালিক হয়ে উঠল।

প্রচলিত প্রজা ও বন্ধকী আইনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল জমি লিপ্সু মহাজনেরা। ছলচাতুরী, বৈধ ও অবৈধ উপায়ে মহারাষ্ট্রের মহাজনেরা ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের জমিগুলি হস্তগত করেছিল। ১৮৭৪ সালে মহারাষ্ট্রের কৃষকরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আইনসম্মত কোন উপায়ে মহাজনের অত্যাচার থেকে মুক্তি না পেয়ে কৃষকেরা মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রথম স্তরে সামাজিক বয়কটের আহবান জানাল। শীঘ্রই সামাজিক বয়কট মহাজনবিরোধী বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল।

পুণা ও আহমেদনগরের ব্যাপক অঞ্চলে কৃষকেরা মহাজনী ঋণের কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল। প্রবল আক্রমণের মুখে কৃষকরা বহু গ্রামে মহাজনদের বাড়ীঘর নষ্ট করেছিল। এই অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭৩—১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। কেংলিয়া নামে জনৈক কৃষক নেতা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। কৃষকেরা তাঁকে গরীবের বন্ধু বলে প্রচার করল।

মহাজনবিরোধী বিদ্রোহ বেশীদূর এগুবার আগেই ইংরেজ শাসক সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহী নেতা কেংলিয়াকে গ্রেপ্তার করল। নেতৃহীন অবস্থায় মহারাষ্ট্রের কৃষকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৮৭৮—৭৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে

রামুসি উপজাতির কৃষকেরা জমিদার ও মহাজনবিরোধী বিদ্রোহ শুরু করেছিল। তারা প্রায় ভূমিদাসের মত দাসত্ব শৃংখলে বাঁধা পড়েছিল। এই বিদ্রোহ অল্পকাল স্থায়ী হলেও বেশ জোরালো আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন জমিদার ও মহাজনদের রক্ষায় পদাতিক ও গোলোন্দাজ সেন্যবাহিনী নিয়োগ ক'রে মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ দমন করেছিল। বাংলার মত মহারাষ্ট্রেও আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ কৃষকদের দাবি সমর্থন করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা চড়া হারে ধার্য ঋণ ও রাজস্ব এবং সরকারী ব্যর্থতাকে কৃষক বিক্ষোভের কারণ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

ঘ. দক্ষিণ ভারতে কৃষক বিদ্রোহ

মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত গোদাবরী নদীর ধারে রম্পা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসকের করবৃদ্ধি এবং স্থানীয় ভূস্বামীর খাজনা আদায়ের পদ্ধতিও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রম্পা অঞ্চলের আদিবাসী কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৮৭৯ সালে ছোটখাটো কৃষক সংগ্রামের সূচনা হয়। ১৮৮০ সালে ছোটখাটো সংগ্রাম রম্পা অঞ্চলব্যাপী কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ গোদাবরী ও বিশাখাপত্তম জেলার ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে পাহাড় ও জলাশয় থাকায় কৃষক বিদ্রোহীরা ইংরেজের সুদক্ষ ও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বেশ কিছু দিন সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিল। ১৮৭৯ সালের মধ্যভাগে রম্পা অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিদ্রোহীরা পুলিশ ফাঁড়ি ও অন্যান্য প্রশাসনিক ঘাঁটিগুলি দখল করেছিল।

কৃষক বিদ্রোহীদের নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না। তাদের বিদ্রোহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কৌশলগত ঐক্য ছিল না। দেখা গেল ইংরেজের পুলিশবাহিনী ও স্থানীয় কর্মচারী এবং অত্যাচারী ভূস্বামী ও মহাজনেরা বিস্তীর্ণ রম্পা অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হ'লে বিদ্রোহের নেতারা নিজেদের 'রাজা' অথবা 'মহারাজা' ব'লে ঘোষণা করেছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিদ্রোহীদের প্রথম সারির নেতারা ধরা পড়লেন ইংরেজ শাসকের কাছে। ১৮৮০ সালে ইংরেজ শাসক রম্পা, গোদাবরী ও বিশাখাপত্তম অঞ্চলে কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

মালাবার বা দক্ষিণ কেরালার মোপলা কৃষকেরা ভূস্বামীদের অত্যাচারের

বিরুদ্ধে ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত বাইশ বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিছু-দিনের জন্য মালাবারে কৃষক অসন্তোষ চাপা ছিল। ভূস্বামী ও মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের সীমা ছাড়িয়ে গেলে মোপলা কৃষকেরা ১৮৭৩ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত আবার নতুন করে পাঁচটি বড় আকারের বিদ্রোহ করেছিল। পরে ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সালে আবার গুরুতর অভ্যুত্থান হ'ল। ১৮৯৬ সালের সংগ্রামে একটা মন্দিরকে ঘাঁটি ক'রে যে ৯৯ জন মোপলা কৃষক সরকারী পুলিশ ও ফৌজের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তাদের মধ্যে ৯৬ জন সেখানেই শহীদ হয়। শেষ পর্যন্ত মালাবারের মোপলা কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

ঙ. আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ

ভারতের কৃষক জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আদিবাসী জন-গোষ্ঠী। ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আদিবাসীরা। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যয় এনেছিল। ইংরেজ শাসনের তথাকথিত সুফল আদিবাসীদের জীবনে পড়ে নি। সেজন্যে তারা ইংরেজ শাসনকে কখনও ভালো চোখে দেখে নি!

আদিবাসীদের সহজ ও সরল জীবন পদ্ধতি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে ভূস্বামী, মহাজন ও অসাধু ব্যবসায়ীরা আদিবাসী অঞ্চলের অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে আদিবাসীরা কর-খাজনা ও অন্যান্য ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজন, জোতদার ও ব্যবসায়ীদের দারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিল। এইভাবে তাদের জমি ও সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল স্থানীয় মহাজন ও জোতদারেরা।

আদিবাসী কৃষকেরা অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বারবার। ১৮৫৮ সালে বোম্বাই-এর নায়িকদাস বিদ্রোহ, ১৮৭২ সালে পাঞ্জাবের কুকা বিদ্রোহ, ১৮৯৫ সাল থেকে রাঁচীর মুণ্ডা বিদ্রোহ এবং উনিশ শতকের শেষের দিকের আরও অনেক আদিবাসী বিদ্রোহ স্থানীয় ইংরেজ শাসনের কাঠামোকে দুর্বল করেছিল।

চ. মূল্যায়ণ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিত সাময়িকভাবে কাঁপিয়েছিল। মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করে নি। ব্রিটিশ শাসন ও

কর্তৃত্ব সারা ভারতে আরও জোরের সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাবিদ্রোহের অবসানের পরই সারা ভারতে দেখা দিয়েছিল অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ। কৃষক বিদ্রোহগুলি স্থানীয়ভাবে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো দুর্বল করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ভিত টলাতে পারে নি। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছরের কৃষক বিদ্রোহগুলি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদের সাক্ষ্য বহন করে।

কৃষক বিদ্রোহগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং বহুক্ষেত্রে অসংগঠিত। আধুনিক শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হলেও সুবিশাল অজ্ঞ ও দরিদ্র কৃষকদের শত্রু চিনতে কোন অসুবিধে হয় নি। সহজেই তারা বুঝেছিল যে নীলকর, জমিদার, মহাজন ও জোতদারেরা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রধান কারণ। তারা আরও বুঝেছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কৃষি অর্থনীতির সুস্থ বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে ভারতীয় কৃষকরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন কুফল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল।

ঊনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বিপানচন্দ্র বলেছেন: 'বিশ্বাস, সাহস, বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগের প্রেরণা সবই তাদের ছিল; কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও বিশ্ববিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্পদের অধিকারী সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের দাঁড়াবারই শক্তি ছিল না। নতুন কোন মতাদর্শ তাদের অধিগত ছিল না, ঔপনিবেশিকতার সম্প্রসারণের ফলে যে সব নতুন সামাজিক শক্তি জন্ম নিয়েছিল তাদের ওপর ভিত্তি করে কোন নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচী তারা গ্রহণ করে নি। সমাজ সম্পর্কে এমন কোনো গঠনমূলক তত্ত্ব বা কোনো নতুন জীবনবাদ তাদের ছিল না যা দিয়ে দেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে সংঘবদ্ধ করা যেতে পারে। সংখ্যায় অগণিত হলেও এই ধরনের অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ অভ্যুত্থানের দ্বারা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব ছিল না।··· তবু ঊনবিংশ শতাব্দীর গণআন্দোলন ও বিদ্রোহ অন্তত একথা প্রমাণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কী প্রচণ্ড শক্তি জনসাধারণের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে।'

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ

১. সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ এবং জাতীয়তাবাদী সমালোচনা

ঊনিশ শতকের শেষভাগে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের তীব্র সমালোচনা। মনে রাখতে হবে প্রথম যুগের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সবাই ছিলেন চিন্তাধারার দিক থেকে মধ্যপন্থী এবং রাজনৈতিক উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী। উদারনীতিবাদে অটল বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির কুফলগুলির উপর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দাদাভাই নৌরোজী ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে ব্রিটেনে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক নীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান। ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে তিনি 'political hypocrisy and continuous subterfuge' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর ধারণা এই ধরনের রাজনৈতিক ভণ্ডামি এবং ক্রমাগত দায় এড়ানোর নীতি ভারতে ব্রিটিশের সুনাম নষ্ট করেছে। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ডোমিনিয়ন অধিকার প্রাপ্ত দেশগুলি অল্প সময়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করায় সক্ষম হয়েছে। তার কারণ, এই সকল দেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার চালু আছে। ভারতে স্বায়ত্তশাসিত সরকার না থাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে।

দাদাভাই নৌরোজী ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে সমগ্র সরকারী ব্যবস্থাই জার-শাসিত রুশ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভারতে স্বাধীন সংবাদপত্রের সমর্থক ছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচন ক'রে যে আইনগুলি প্রণয়ন করেছিল নৌরোজী সেগুলিকে রুশ পদ্ধতি বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্রিটেনের উদারনৈতিক নীতি এবং নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের স্বাধীনতা হরণকারী কার্যগুলির কোনো সাদৃশ্য তিনি খুঁজে পান নি। তিনি ঘোষণা করেন: ভারতে 'the Government had ceased to be the British Government and

assumed the role of Russian Government.'। অর্থাৎ ব্রিটেনে রাজনৈতিক উদারনীতিবাদ প্রচলিত। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসন উদারনীতিবাদ পরিত্যাগ করে জার-শাসিত রুশীয় স্বৈরতন্ত্র গ্রহণ করেছে। সেজন্য প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে **'un-British rule'** বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ ইংলণ্ডের উদারনৈতিক নীতি ভারতের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াল স্বৈরতান্ত্রিক।

উনিশ শতকের শেষের দিকে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। দাদাভাই নৌরোজী ভারতে দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে ভারতীয় সম্পদের ব্রিটেনে নির্গমনকে চিহ্নিত করেন। ভারতে সর্বাঙ্গীন দুর্দশা ও অবক্ষয়ের জন্য তিনি ভারতীয় সম্পদের ব্যপক নির্গমনকে দায়ী করেন। তিনি দেখান যে ভারতে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় সম্পদের নির্গমন। সম্পদ নির্গমনের জন্য ভারতে মূলধন গঠন সম্ভব হচ্ছে না। সম্পদ নির্গমনের পাশাপাশি চলছে ভারতে ব্রিটিশ মূলধনেব একচেটিয়া বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের অধিকার। ভারতের সম্পদ ব্রিটেনে চলে গিয়ে ব্রিটিশ মূলধনে পরিণত হচ্ছে এবং সেই মূলধন আবার ভারতের একচেটিয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। নৌরোজী তাঁর বিখ্যাত নির্গমন তত্ত্ব **(Drain Theory)** দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সুবিখ্যাত **Poverty and Un-British Rule in India** (১৯০১) পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়।

নৌরোজীর মতে মোগল সাম্রাজ্যের চরম নৈরাজ্য থেকে ব্রিটেন ভারতকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু ভারত নিজের অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতকে ব্রিটেন নিজের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য একতরফা ভাবে ব্যবহার করেছিল। ব্রিটেন ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় সম্পদ ব্রিটেনে নির্মমভাবে নির্গমণ হওয়ায় এদেশে বিদেশী সম্পত্তি অধিকতর নিরাপত্তা পেয়েছিল। নৌরোজী মনে করেন যে, ব্রিটেন ভারতকে অবাধ লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করেছিল এই তত্ত্বটি সঠিক নয়। সঠিক কথা হল ভারতের সম্পদ অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ একমাত্র ব্রিটেনের সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তার ফলে বহু লক্ষ ভারতবাসী অনাহার, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

নৌরোজী ভারতীয় সম্পদের অবাধ নির্গমনকে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। ইংলণ্ড প্রতি বছর ৩০,০০০,০০০ থেকে ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ সম্পদ ভারত থেকে শোষণ করে এবং নিজের দেশে চালান দেয়। তার ফলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান সভ্যদেশের তুলনায় সবার নিচে। বিশাল সংখ্যক গরীব মানুষেরা দৈনিক যা পরিশ্রম করে তা দিয়ে নামমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে পারে না। ভারতে ব্রিটিশ শাসন অতি সূক্ষ্মভাবে, বিনা হিংসায় ভারতবাসীর সারবস্তু নিঙড়ে নিয়েছে। যার ফলে বিশাল সংখ্যক গরীব মানুষ গভীর শান্তিতে আইন শৃংখলার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছিল।

দাদাভাই নৌরোজীর সুবিখ্যাত নির্গমন তত্ত্বটি উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিল। উনিশ শতকের ব্রিটেনের ধণতন্ত্রবাদ ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণে রূপান্তরিত হ'য়ে কি ক্ষতি সাধন করেছিল নির্গমন তত্ত্ব সেই তথ্য প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে নির্গমন তত্ত্বের অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে ভারতীয় দারিদ্র্যের উৎস হিসাবে নৌরজীর নির্গমন তত্ত্ব বহু জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ ও নেতাদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

উনিশ শতকের প্রখ্যাত অর্থনীতি-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বিদেশী অর্থনীতির নির্মম শোষণকে ভারতীয় দারিদ্র্যের কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন। রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ভারতবাসীর দারিদ্র্য বিশ্বের সভ্যদেশগুলির সাম্প্রতিক ইতিহাসে একেবারে নজিরবিহীন। উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছর ভারতে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে! তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮, ১৮৮৯ থেকে ১৮৯২ এবং ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষগুলি দেড় কোটির বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। পঁচিশ বছরে দুর্ভিক্ষ জনিত ভারতীয় জনসংখ্যার মৃত্যুর হার প্রায় ইউরোপের একটি গোটা দেশের সমতুল্য। প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বগুলিকে রমেশচন্দ্র দত্ত খণ্ডন করেন। তিনি মনে করেন বর্ধিত জনসংখ্যা ভারতের দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের মৃত্যুর কারণ নয়। ভারতের তুলনায় ইউরোপের কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশি। এইসব দেশে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-বা মৃত্যুর হার অনেক কম।

রমেশচন্দ্রর মতে ভারতীয় দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হল ব্রিটিশ শাসনে দেশের

শিল্প ও কৃষিব্যবস্থার চরম অবক্ষয়। আঠারো শতকে শিল্প ও কৃষিব্যবস্থায় সমৃদ্ধ ভারত ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে পড়ে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন ব্রিটিশের অর্থনৈতিক নীতি হল ভারতকে বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নের স্বার্থে পদানত করা। অতীতে সমৃদ্ধ দেশীয় শিল্পগুলি ব্রিটিশের তারতম্যমূলক শুল্কনীতির ফলে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল।

ভারতীয় দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ প্রবর্তিত অত্যাধিক ভূমি খাজনা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। ভারত থেকে সংগৃহীত ভূমি খাজনার অর্ধেকেরও বেশী আবার ব্রিটেনে চলে যায়। তাঁর মতে ভারত থেকে সংগৃহীত মোট রাজস্বের বেশির ভাগ আসে ভূমি খাজনা থেকে। দক্ষিণ ভারতে ভূমি খাজনা সংগৃহীত হয় কৃষকদের কাছ থেকে এবং উত্তর ভারতে ভূমি খাজনা আসে ভূস্বামীদের কাছ থেকে। রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ভূমি খাজনার নির্মম বোঝা চূড়ান্তভাবে বহন করতে হয় কৃষকদের। যার ফলে কৃষকেরা হৃতসর্বস্বে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী নেতারা ছিলেন উদারনৈতিক দর্শনের সমর্থক। তাঁদের উপর মিল, বেন্থাম প্রমুখের প্রভাব সুস্পষ্ট। রমেশচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের উদারনীতিবাদ প্রয়োগ করে বললেন: 'History does not record a single instance of one people ruling another in the interest of the subject nations.' পদানত জাতির স্বার্থে কখনও অন্য দেশের শাসন পরিচালিত হয় না। সেইজন্য রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অধিকতর অংশগ্রহণ দাবি করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ভারতীয় প্রশাসকরা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন। রমেশচন্দ্র লর্ড কার্জনকে লেখা খোলা চিঠিতে ভারতে উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক তুলে নেওয়ার সুপারিশ করেন। নতুন ভারতীয় শিল্পগুলিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার দাবি জানান। উদ্বৃত্ত সরকারী খাজনার আয় সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণে ব্যয় করার পরামর্শ তিনি দেন। তিনি ভারতের রায়তওয়ারী অঞ্চলে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। মনে রাখতে হবে, চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থায় কৃষক সমাজের অশেষ দুর্গতি রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

উনিশ শতকের শেষ দিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সমালোচনার যে ধারা দাদাভাই নৌরোজী এবং রমেশচন্দ্র দত্ত শুরু করেছিলেন তার সুস্থিত পরিণতি দেখা যায় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অর্থনৈতিক চিন্তাধারায়। রাণাডে ব্রিটিশ বাণিজ্য

নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। ভারতের মতো অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত দেশে অবাধ বাণিজ্য নীতি চলতে পারে না এ মত তিনি পোষণ করতেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তিনি চেয়েছিলেন। ভারতের স্বার্থে অর্থনীতিকে উন্নত করতে হলে রাষ্ট্রের সহায়তা প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ বাণিজ্য নীতি ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশে আদৌ অনুকূল নয়।

রাণাডের সুচিন্তিত অভিমত হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড এবং ভারতের স্বার্থ কখনও এক নয়। ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দাদাভাই নৌরোজীর সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনাগুলি রচিত হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের অর্থনৈতিক সমালোচনা ব্যক্ত হয়েছিল। নৌরোজীর আক্রমণের মূল বিষয় ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভারতীয় নীতি, অপরদিকে রমেশচন্দ্রের আক্রমণের অন্যতম বিষয় ছিল ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কৌশল।

২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সূচনার মধ্য দিয়ে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সুসংগঠিত প্রকাশ ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উনিশ শতকে রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় যার সূত্রপাত সেই ধারার সুস্থিত পরিণতি জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ঘটে। ১৮৩৮ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৫১ পর্যন্ত গ'ড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। ভারতে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি বিবর্তনের ইতিহাসে 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' (১৮৩৮, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩) এবং 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ১৮৫১)-এর ভূমিকা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ভারতে উদারনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

উনিশ শতকের সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট আবির্ভাব ঘটেছিল। ফলস্বরূপ ১৮৭৫ সালে শিশির কুমার ঘোষ 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তাঁর এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দোপাধ্যায়ের সাহচর্যে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল : 'To represent the views of the educated middle class community and inspire them with a living interest in public affairs.' সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এই সংগঠনের চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। প্রথমত, ভারতীয় জনমত গঠন করা; দ্বিতীয়ত, সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও আকাঙ্খার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা; তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং চতুর্থত, জনসাধারণের সমর্থনে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই জাতীয় ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গঠনে সোচ্চার হয়েছিল। 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার মধ্যে কৃষি সংস্কার এবং কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮১ সালে 'রেণ্ট বিলের' উপর এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি এই সাক্ষ্য বহন করে। 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বাংলা দেশের জেলায় জেলায় 'রেন্ট ইউনিয়ন' নামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র আরেকটি কীর্তি অম্লান হয়ে আছে। এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৮৩ সালে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ১৮৮৩ সালে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক দাবিগুলি 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলির মার্জিত প্রতিধ্বনি মাত্র। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' আহবানের মূলে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' থাকলেও, এ ব্যাপারে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এবং 'সেন্ট্রাল মহমেডান এসোসিয়েশনের' যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। সর্বভারতীয় সমিতির কল্পনাকে আরো বাস্তবায়িত করলেন বোম্বাই-এর জাতীয়তাবাদী কর্মীরা। অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ পদস্থ রাজকর্মচারী এ. ও হিউমের সহায়তায় ও ভারতীয় নেতাদের একান্ত আগ্রহে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

প্রতিনিধিরা ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলিতে বোম্বাই শহরে মিলিত হলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। ডব্লিউ. সি ব্যানার্জী কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হলেন।

বহুদিন ধরে একটি মত প্রচলিত আছে যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি 'safety-valve' সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষিত ভারতীয়দের ধূমায়িত অসন্তোষ বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়। এই মতবাদ অনুযায়ী হিউমের লক্ষ্য ছিল অসন্তুষ্ট জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা যাতে নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে না পড়েন সেজন্য বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকে ব্রিটিশ রাজপুরুষ পরিকল্পিত রাজনৈতিক সংগঠনের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। মামুলী ধরনের নিরমতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য হিউম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখিয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এই ধরণের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। জাতীয় কংগ্রেস কখনই সাম্রাজ্যবাদের 'foster child' বা পালিত পুত্র নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে জাতীয়আন্দোলন বিকাশের পথে প্রবল প্রতিবন্দকতা সৃষ্টি করেছিল। রজনী পাম দত্ত বলেছেন 'The formation of the National Congress represented from the point of view of the government an attempt to defeat or rather forestall an impending revolution.' ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্যে দিয়ে আসন্ন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে ব্যর্থ এবং স্তব্দ করতে চেয়েছিল। আশার কথা সাম্রাজ্যবাদে বপ্ন জাতীয় কংগ্রেসে প্রতিফলিত হয় নি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিজেদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনকে উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৮৮২ সালে হিউম ভারত সরকারের দায়িত্ব পূর্ণ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরিতে থাকাকালীন তিনি পুলিশের প্রচুর গোপন রিপোর্ট দেখার সুযোগ পান। এই সব রিপোর্ট ঊনিশ শতকের সত্তর দশকে সারা ভারতে ভয়াবহ মন্বন্তর, মহামারী, মৃত্যু এবং কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের বহু তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল। ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতেরও সম্রাজ্ঞী ঘোষিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এতই উল্লসিত হল যে অজস্র অর্থ ব্যয়ে মধ্যযুগীয় ধরনের জাঁকজমক পূর্ণ দরবার দিল্লীতে আহবান করে বসল। ধূমায়িত অসন্তোষ

দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৮ সালে 'ভারনাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' এবং 'আর্মস এ্যাক্ট' প্রণয়ন করে দমন পীড়ন নীতিকে তীব্র ক'রে তুলল।

পুলিশের গোপন রিপোর্টে হিউম যাই পাঠ করুন না কেন সেই সময়ের বাস্তব পরিস্থিতি স্মরণ করা প্রয়োজন। কারণ ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি এবং ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধ ও সংঘাত এদেশে জাতীয় আন্দোলন বিকাশের পথ সুগম করেছিল। ঊনিশ শতকের সত্তর দশকের ভারতীয় শিল্প ও কৃষির দুরবস্থার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ছিল মহামারী ও মন্বন্তরে ষাট লক্ষ মানুষের মৃত্যু। ভারতীয় অর্থ, রাজস্ব ও সম্পদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে চলে গিয়েছিল বার্মা, তিব্বত, আফগানিস্তান এবং চীন দেশে। সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সম্পদকে সুদূরে আফ্রিকায় চালান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে নি। ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থ অনিবার্যভাবে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। সেই সঙ্গে প্রস্তুত করল জাতীয় আন্দোলনের সংগঠিত প্রকাশের ক্ষেত্র।

সরকারী চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের অব্যবাহিত পরেই হিউম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠির মূল কথা হ'ল ভারতীয় জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক পুনর্জাগরণের জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলায় যাতে স্নাতকেরা উদ্যোগী হন। তিনি অবশ্য সামাজিক সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। গভর্ণর-জেনারেল ডাফরিন হিউমকে বলেছিলেন, ভারতীয় স্বার্থে এবং ব্রিটিশ শাসকের স্বার্থে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা বছরে একবার মিলিত হয়ে প্রশাসনিক ত্রুটি সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ডাফরিনের উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল। যদিও ভারতীয় স্বার্থ এবং ব্রিটিশ-শাসকের স্বার্থ কখনও এক ছিল না।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় যে সব ভারতীয় অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন এক নতুন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি। তাঁদের অর্থনৈতিক সমালোচনায় ভারতকে ব্রিটিশের স্বার্থে যেভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল। এই অগ্রণী নেতারা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন করা যাবে। হিউমের মত অবসর প্রাপ্ত রাজপুরুষের সহায়তা তাঁরা চেয়েছিলেন। কারণ তাঁদের ধারণা হয়েছিল প্রাক্তন রাজপুরুষের

সংযোগে গড়ে ওঠা জাতীয় সংগঠন সূচনাতেই সরকারী রোষে পতিত হবে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠারা ছিলেন স্বদেশ-বৎসল ও অগ্রগামী চিন্তানায়ক। তাঁরা কখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ছিলেন না।

১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে সারা ভারত থেকে আগত বাহাত্তর জন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন ডব্লিউ সি. ব্যনার্জী। সভাপতির ভাষণে ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন। জাতীয় কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, জাতি, মতবাদ এবং প্রাদেশিক কুসংস্কার বিনষ্ট করে সমস্ত মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ধারণা প্রচার করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সভাপতির ভাষণে প্রাধান্য পায়। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করে। এই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর উপর শিক্ষিত মানুষের প্রতিনিধিরা যাতে আলাপ-আলোচনা ক'রে মতামত বিনিময় করতে পারেন, সেই রকম একটা সুযোগ সৃষ্টি করার কথা ভাবা হয়েছিল। কংগ্রেসের আরো একটি লক্ষ্য হল ভারতীয় রাজনীতিবিদরা কোন পথে এবং কি ভাবে অগ্রসর হবেন সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া।

প্রশাসন সংস্কার দাবি করে প্রথম কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রত্যেক বক্তাই ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতায় আস্থা জানিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই রাজভক্তি প্রকাশ করেছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে শাসন সংস্কার দাবি অপেক্ষা অনেক সময় রাজভক্তি যেন বেশী প্রকাশ পেয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম কুড়ি বছর কংগ্রস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। হিউমের আশা পূর্ণ হয় নি। কংগ্রেস কখনো বিক্ষোভ নিবারনের 'সেফটি ভাল্ব' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নি। কয়েক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস জাতীয় আশা-আকাংখা ও দাবি-দাওয়া প্রকাশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল।

নিয়মতান্ত্রিক পথে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাহাত্তর জন প্রতিনিধির সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। নিয়মতান্ত্রিক চৌহদ্দীর বাইরে একদিন গণআন্দোলনের জোয়ার আসতে পারে এ ধারণা আদি পর্বে প্রতিষ্ঠাতাদের ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক সীমারেখা ভঙ্গ করে জাতীয় কংগ্রেস পরবর্তীকালে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করেছিল। অন্তবর্তীকালে অসহযোগ গণ-আন্দোলন

এবং আইন-অমান্য গণ-আন্দোলন জাতীয় সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছিল। আদি পর্বের প্রতিষ্ঠাতাগণের ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে অনেক অগ্রগামী হয়েছিল পরবর্তী কালের জাতীয় কংগ্রেস।

৩. কংগ্রেস ও আদি পর্বে জাতীয় আন্দোলনের বিবর্তন

ভারতে জাতীয় আন্দোলন বিকাশে জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্বের বিবর্তনের ইতিহাস মুখ্যত জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারার ইতিহাস। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্বকে মোটামুটিভাবে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই কুড়ি বছরে ভাগ করা যায়। আদি পর্বের কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে নেতৃবৃন্দের উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন ও পদ্ধতিসমূহের প্রতি অবিচল আস্থা প্রকাশ পায়। ভারতীয় উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অপারিসীম বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে তাঁরা 'ঐশ্বরিক অবদান' (providential) বলে মনে করতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মর্যাদার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাঁরা আরো মনে করতেন ব্রিটেনের সংস্পর্শে এসে ভারত তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত হতে পারে। এই সঙ্গে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পরিচালনায় শিক্ষানবিশী করার রাজনৈতিক পথ উন্মুক্ত হতে পারে। দাদাভাই নৌরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রমুখ আদিপর্বের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের বক্তৃতা ও রচনাবলী এই সাক্ষ্য বহন করে।

আদি পর্বের জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সুশৃংখল রাজনৈতিক অগ্রগতি দাবি করেছিলেন। কারণ তাঁরা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বদলে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মন্থর বিবর্তন চেয়েছিলেন। সেজন্য আদি পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে সুশৃংখল রাজনৈতিক অগ্রগতির উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথম কুড়ি বছরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনমতকে জাগ্রত ও সুশিক্ষিত করা এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ জনমতকে ভারতীয়ের সুশৃংখল রাজনৈতিক আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করা। সর্বপ্রকার সংঘর্ষ, বিদ্রোহ এবং সংঘাত-মূলক

কাজকর্মের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেই একমাত্র রাজনৈতিক পথ রূপে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

আদি পর্বে জাতীয় কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বশীলতাকে কাম্য বলে মনে করতেন। নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনকে উদারনৈতিক পটভূমির উপর স্থাপন করতে চেয়েছিল। অবশ্য শীঘ্রই তাঁদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনের স্বৈরাচারী দিকগুলিকে তাঁরা যথেষ্ট সমালোচনা করেন। ১৮৯৮ সালে দাদাভাই নৌরোজী বলেন, মহারাণীর ঘোষণাগুলিকে তাঁর মন্ত্রীবর্গ ভারতীয় জনগণের কল্যাণে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আদিপর্বে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মারফত ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম দুটি জাতীয় কংগ্রেসের গৃহিত প্রস্তাবগুলি ব্রিটিশ সরকারের উপর তেমন প্রভাব ফেলতে না পারায় নেতৃবৃন্দ নতুন রাজনৈতিক প্রচারে উদ্যোগী হলেন। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে ইংলণ্ডের Corn-Law-League আন্দোলন পদ্ধতিকে ভারতে প্রয়োগ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে হিউম প্রতিনিধিদের Corn-Law-League নেতা কবডেনকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের শিক্ষিত করার জন্য কংগ্রেস বড় বড় শহরে সভাসমিতি আয়োজন করে এবং প্রচার পুস্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করে।

আদি পর্বে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনের দোষ-ত্রুটিকে সংশোধন ক'রে প্রশাসনিক কাঠামো সম্প্রসারন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা প্রধানত সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক মঞ্চের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সুস্পষ্ট ধারাণা হয়েছিল ভারতীয়ের অভাব অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ শাসকেরা বিনা আন্দোলনে কখনই কর্ণপাত করবে না। যদিও তাঁরা ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। আদিপর্বের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করতেন স্বাধীন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বিদ্রোহী মনোভাবকে কখনও দমন করতে পারে না। বরং সংবাদপত্র দলন রাজনৈতিক আন্দোলনকে গোপন পথে নিয়ে যাবে। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন, ভারতে বিদ্রোহী মনোভাব দ্রুত সম্প্রসারিত করার ইচ্ছা থাকলে প্রথমেই স্বাধীন আলোচনার অধিকার, সংবাদপত্র এবং সভাসমিতিগুলির কণ্ঠরোধ করা প্রয়োজন।

আদিপর্বের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী ধাঁচে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের রাজনৈতিক সংস্কারের আকাংখা সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মনে করতেন যে ব্রিটিশ সরকার সহজে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেবে না। তাঁরা বলেছিলেন, খোদ ইংলণ্ডে বিনা আন্দোলনে ব্রিটিশ জনগণ রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করে নি। জনমত-বিরোধী আইনগুলি সহজে বাতিল হয়ে যায় নি। তার জন্য ব্রিটিশ জনগণকে আন্দোলন করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টর সংস্কার এবং ফ্যাক্টরী আইনগুলির উন্নতিসাধন সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দুই দশকে নেতৃবৃন্দের ধারনা ছিল ব্রিটিশ জনগণ যদি, সাম্য, ন্যায়বিচার ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতির মহান ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল থাকেন তবে ভারতীয়দের উদার রাজনৈতিক সংস্কারের দাবির পাশে তাঁদের দাঁড়াতে হবে। দাদাভাই নৌরজী বলেছেন, ভারতের প্রকৃত শাসক কে? অবশ্যই ভারত সরকার নয়। প্রকৃত শাসক ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র বা রাজশক্তি বা মন্ত্রীরাও নয়। প্রকৃত শাসক হল সেখানকার জনগণ যাঁরা ব্রিটেন ও ভারতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে আছেন। সেজন্য কংগ্রেসের ভূমিকা দ্বৈত। ভারতীয়দের পশ্চিমী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৌতূহল উদ্রেক করানোর সঙ্গেই ব্রিটিশ জনগণকে ভারতীয় রাজনৈতিক আকাংখা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আদি-পর্বের জাতীয় নেতৃবৃন্দ সুশৃংখল রাজনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে উদার ও ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার দাবি করেছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে অন্যতম মূল দাবি ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির সংস্কার ও যথাসম্ভব সেগুলিকে নির্বাচনের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় কংগ্রেস এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। ১৮৯২-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট কংগ্রেসের দাবিকে রূপায়িত করে নি। এই আইন ভাইসরয়কে ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলি থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সদস্য মনোনয়ন করার ক্ষমতা দিয়েছিল। সীমানাভিত্তিক নির্বাচনকেন্দ্রের পরিবর্তে জেলা বোর্ড, পৌরসভা, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাগুলি থেকে সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৯৩-এর কংগ্রেস অধিবেশনে কাউন্সিল এ্যাক্টের জন্য

একই সঙ্গে আনন্দ ও হতাশা প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৮৯২-এর আইন সংসদীয় গণতন্ত্রত দূরের কথা, নামমাত্র নির্বাচন নীতি স্বীকার করে নি। রক্ষণশীল সলিসবেরী ও কার্জন, কিম্বা উদারনীতিবিদ কিম্বারলি'র মত বিভিন্ন মতাদর্শের ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী ধরনের প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মনে করতেন না। তখনো পর্যন্ত আদিপর্বের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শুভবুদ্ধি ও ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। ১৮৯৫-তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বললেন: 'From England must come the crowning mandate which will enfranchise our people...we look forword to the day when the debt will be repaid not only by the moral regeneration, but by the polilical enfranchisement of our people'.

প্রথম কুড়ি বছর (১৮৮৫-১৯০৫) জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে যে দাবিগুলি পেশ করেছিল সেগুলি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর সাক্ষ্য বহন করে। প্রথম সম্মেলনে (১৮৮৫) নতুন প্রদেশ-গুলিতে আইন পরিষদ স্থাপন এবং বাজেট আলোচনার অধিকার দাবি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলি সম্প্রসারণের দাবি ধ্বনিত হয়েছিল। আরো এক ধাপ এগিয়ে ১৯০৪-এর বেনারস সম্মেলনে কংগ্রেস ব্রিটিশ কমন্স সভায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের দাবি তুলেছিল। এই পর্বে অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে বার বার ধ্বনিত হয়েছিল: বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণ, জুরির দ্বারা বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন, পুলিশ-প্রশাসন সংস্কার, আয়কর ও লবণ আইনের বোঝা কমানো, সারা ভারতে চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভারত ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ। ১৮৯৪-এ মাদ্রাজ সম্মেলনে কংগ্রেস ভারতে উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে সদ্য বিকাশমান ভারতীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করার সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করে এবং লাংকাশায়ারের ব্রিটিশ তুলাজাত শিল্পকে পক্ষপাতমূলক ভাবে সমর্থন করে ভারতীয় শিল্পের উপর শুল্কের বোঝা চাপানোর নীতিকে নিন্দা করে। ১৮৯১-এর কলকাতা সম্মেলনে কংগ্রেস সরকারের সামরিক ও অসামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য তীব্র সমালোচনা করে এবং ভূমি-রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভারতীয় কৃষক ও কৃষি উন্নতির প্রধানতম অন্তরায় বলে চিহ্নিত করে।

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে আদৌ পছন্দ করে নি। হিউম-ডাফরিনের স্বপ্ন আদিপর্বে কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে রূপায়িত হয় নি। আদি পর্বেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনিক সংস্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভারতীয়ের সিভিল সার্ভিসের অধিকার দাবি এবং ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ-বিরোধী শুল্কনীতি প্রভৃতির সমালোচনাগুলি ব্রিটিশ শাসকদের পছন্দমত হয় নি। কংগ্রেসের মৃদু সমালোচনা স্তব্ধ করার জন্য ১৮৯৭-তে ফৌজদারী আইনের সংশোধন এবং ১৮৯৮-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য গোপন কমিটি স্থাপনের প্রয়োজন হল। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা কংগ্রেস আন্দোলনকে শহুরে-শিক্ষিতের 'microscopic minority'-র আন্দোলন বলে প্রচার করল। ১৯০০ সালে কার্জন এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে কংগ্রেস দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে এবং তাঁর মহান আকাংখা হল কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যু ঘটানোয় সহায়তা করা। বলাবাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী কার্জনের মহান ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল।

৪. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা

কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অথচ ক্ষীণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঊনিশ শতকের শেষের দিকে শুরু হয়। ১৮৮৫ থেকে শুরু হওয়া সভাসমিতি এবং বক্তৃতাসর্বস্ব আবেদন-নিবেদন ও জোরালো ইংরাজী ভাষায় প্রস্তাব গ্রহণের রাজনৈতিক পদ্ধতি ১৮৯২-এ 'কাউন্সিল এ্যাক্ট' সৃষ্টি করল। প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোনো চিহ্ন ১৮৯২-এর আইনে ছিল না। ফলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর একাংশ কংগ্রেসের প্রতি সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁদের চিন্তাধারা ও মতামত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করেছিল।

বক্তৃতাসর্বস্ব আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ভারতীয়ের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারে নি। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে সারা ভারতের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বহুলক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হলো। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ও সম্প্রসারণের ফলে দেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। শহর ও আধা-শহরাঞ্চলে দেশীয় শিল্প-

ব্যবস্থা চরম সংকটের মুখে পড়ে যায়। ফলে বহু লক্ষ মানুষ শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মহীন হয়ে নিদারুণ দুঃখদুর্দশায় পড়েছিল। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দেয় এবং বহু সহস্র মানুষ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ, দেশীয় শিল্পের ধ্বংস, কৃষি ব্যবস্থায় আধা-সামন্ত স্বার্থের প্রাধান্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ঘটনাগুলি ব্রিটিশ শাসনের ভাবমূর্তি একেবারে ম্লান করে দেয়।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে মহারাষ্ট্রের দামোদরহরি চাপেকার কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না। তাঁর ভাষায়, 'A thunder-cloud produces no rain, a talkative man will not act.' বজ্রবিদ্যুতে যেমন বৃষ্টি হয় না, তেমন বাগাড়ম্বর মানুষ কর্মী হয় না। চাপেকার আবেদন-নিবেদন, প্রস্তাব-বক্তৃতা-সর্বস্ব কংগ্রেস রাজনীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন কেবলমাত্র কোটি কোটি মানুষের ত্যাগ ও জীবনদান ভারতের কল্যাণ সাধন করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কংগ্রেসকে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনে তেমন কিছুই করে নি। বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক পত্রে লিখেছিলেন : দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মৃত্যু ও মহামারীর সময় কংগ্রেসীরা কোথায় থাকে বলতে পারো? বরিশালের জাতীয়তাবাদী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কংগ্রেসের কার্য-কলাপের উপর তাঁর কোনো আস্থা আছে কিনা? স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়ে-ছিলেন, কংগ্রেসের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা নেই। তবে কোনো কিছু না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো। কারণ নিদ্রামগ্ন জাতিকে ঘুম ভাঙানোর জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র কয়েকটি প্রস্তাব পাস করিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা যায় না। এ মত স্বামীজী দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন। কারণ প্রস্তাব-সর্বস্ব রাজনীতির উপর তিনি কোনো আস্থা প্রকাশ করেন নি। তিনি মনে করতেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণ-জাগরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সাহায্যে পরোক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সমালোচনা করেন। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস এবং 'বন্দে-মাতরম' কবিতা অসংখ্য তরুণ ও যুবককে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবেদন-নিবেদন-মূলক রাজনীতিকে কখনও সমর্থন করেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে সারা জাতির লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ইংরেজকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে একটির পর একটি অভিযোগ আনলেন তখন কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চ হতে এর সপক্ষে কোনো কথা শোনা যায় নি। ইংরেজ জাতির ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার উপর তখন কংগ্রেসের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন এবং বক্তৃতা ও বাগাড়ম্বরকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইলাম। কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি। কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়।'

১৮৯৩-৯৪-এ বোম্বাই-এর ইংরেজী 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেস আন্দোলন, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। কংগ্রেস সম্পর্কে এত তীক্ষ্ণ সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আর কেউই লেখেন নি। অরবিন্দ 'নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি কংগ্রেসকে ব্যর্থ সংগঠন বলে অভিহিত করেন। কারণ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ মহারাণীর প্রতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ এবং ব্রিটিশ শাসনের গুণকীর্তন করাকেই মহান কর্তব্য বলে মনে করতেন। নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাষায় বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। অরবিন্দ কংগ্রেস নেতৃত্বে সফল আইন ব্যবসায়ীদের সর্বময় প্রাধান্য লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুকৌশলী উকিলের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। সেজন্য কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি লক্ষ্য করলেন নকল আদালতের অভিনয়। এ যেন 'মহামান্য ব্রিটিশ আদালতে ভারত বনাম ইঙ্গ-ভারতীয়দের আইন যুদ্ধ'। তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে 'দুর্বল, ভীরু, স্বার্থপর, ভণ্ড এবং অন্ধ ভাবাচ্ছন্ন' বলে সমালোচনা করেন।

কংগ্রেসের লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং নেতৃবৃন্দকে অরবিন্দ তীব্র সমালোচনা করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভাবে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-সমূহের ও নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা এর আগে কেউ করেন নি। তিনি কংগ্রেসের লক্ষ্যকে 'ভ্রান্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেস সংগঠনকে সম্পূর্ণ 'আন্তরিকতাবিহীন' বলেছেন। কংগ্রেসের পদ্ধতিকে 'ভুল পদ্ধতি' বলেছেন। নেতৃবৃন্দকে অযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র কংগ্রেস আন্দোলন যেন আইন পরিষদের সম্প্রসারণ, ভারতে সিভিল সারভিস পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিভাজনের দাবিগুলিকে

পেশ করায় নিঃশেষিত হয়েছে।

সম্ভবত ঊনিশ শতকের শেষের দিকে অরবিন্দই প্রথম সমালোচক যিনি কংগ্রেসকে 'বিজাতীয়' ও 'জনসমর্থনহীন' প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেসের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যা দিতে রাজী হন নি। কারণ কংগ্রেসে সাংবাদিক, উকিল, চিকিৎসক, সরকারী কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং বণিক সমাজ থেকে আসা উচ্চবিত্তেরাই ভীড় করেছেন। উচ্চবিত্তেরা ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করায় বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলতে চান নি কারণ কংগ্রেস বিশাল জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে না। উচ্চবিত্ত পরিচালিত কংগ্রেস জনসাধারণের দুঃখদুর্গতি দূর করতে পারবে না। সম্ভবত অরবিন্দ প্রথম ভারতীয় বুদ্ধিজীবী যিনি এদেশে লিখিতভাবে 'প্রলেতারিয়েত' শব্দের ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতের আশা এবং ভবিষ্যত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ভারতীয় 'প্রলেতারিয়তের' উপর। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতীয় 'প্রলেতারিয়তের' দুঃখদুর্দশা লাঘবের কোনো চেষ্টা করেন নি। তিনি বর্তমানে সুপ্ত সর্বহারাদের ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাময় শক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। কারণ তাঁরাই ভবিষ্যত ভারতের কর্ণধার। অবশ্য 'প্রলেতারিয়েত' বলতে অরবিন্দ ঘোষ মজুরি-শ্রমিক ও বেঁচে থাকার জন্য শ্রমশক্তি বেচতে যারা বাধ্য হয় তাদের বোঝান নি।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারা গত শতকের শেষের দিকে ধূমায়িত হয়। মহারাষ্ট্রের দামোদরহরি চাপেকার, বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অরবিন্দ ঘোষের লেখনী ও চিন্তাধারায় আবেদন-নিবেদন মূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ধ্বনিত হয়। পরবর্তীকালের গণ-আন্দোলনের পর্বগুলিতে আবেদন-নিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির দ্রুত অবসান ঘটে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কারণ গণ-আন্দোলনের আদি পর্বে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রাধান্য থাকা অস্বাভাবিক নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ ঃ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনাপর্ব

১. বিশ শতকের প্রথম দশক : ভারতের পটভূমি ও বিশ্বে নতুন ঘটনাবলীর বিকাশ

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী খুবই সহায়ক হয়েছিল। বিশ্ব পেক্ষাপট বাদ দিয়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সঠিকভাবে বোঝা যায় না। বিশ্বে নতুন ঘটনাবলীর বিকাশ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন শুধুমাত্র এ দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ফসল নয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনার দ্রুত প্রসার লাভ করে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্তরে উন্নীত হয়। ফিনান্স পুঁজির প্রাধান্যে পরিচালিত একচেটিয়া পুঁজি নতুন সাম্রাজ্যবাদী স্তর সৃষ্টি করে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের অঙ্গ হিসাবে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ভারতে পুরোপুরি সম্রাজ্যবাদী শোষনের স্তরটি উন্মুক্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বিস্তারের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এই পুঁজি নিয়োগকে পুঁজি রপ্তানী বলা হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজির রপ্তানি ও বিনিয়োগ অনেক কম হয়েছিল। ভারতে ব্রিটেন ছিল ঔপনিবেশিক রাজশক্তি। রাজশক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটেন ভারতে পুঁজি রপ্তানি কমই করেছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত ব্রিটেন ভারতে যে পরিমাণ পুঁজি রপ্তানি করেছিল তার চেয়ে ভারত থেকে ইংলণ্ডে প্রেরিত করের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজির সিংহ ভাগটাই ভারতীয়দের লুণ্ঠন ও শোষণ করেই সংগ্রহ করা হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে বিশ্ব বাজারে ব্রিটিশ শিল্পের একচেটিয়া প্রাধান্য দুর্বল হতে আরম্ভ করে। ইউরোপীয় ও মার্কিন অর্থনীতির তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে বিশ্ব বাজারে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। ঔপনিবেশিক রাজশক্তির ছত্রছায়ায় থাকার জন্য ভারতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক দুর্বলতা অনেক দেরীতে প্রকাশ পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটেন ভারতীয়

বাজারের দুই-তৃতীয়াংশে নিজের অর্থনৈতিক প্রধান্য বজায় রেখেছিল। সেই তুলনায় বিশ্ব বাজারে ব্রিটেনের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল নীচের দিকে।

উনিশ শতকের সত্তর দশকে আধুনিক জাতিরূপে জাপানের অভ্যুত্থান ভারত সমেত সমগ্র এশিয়ায় নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিল্পোন্নত ও সামরিকভাবে শক্তিশালী জাতিরূপে জাপানের আত্মপ্রকাশ ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। শাসনব্যবস্থাকে আধুনিক ও দক্ষ করার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে জাপান বাধ্যতামূলক করেছিল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যশক্তির প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জাপান সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে পরাধীন দেশগুলির সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ১৮৯৬-এ ইথিওপিয়ার কাছে ইটালির এবং ১৯০৫-এ জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় বরণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শ্বেত জাতির সর্বময় প্রাধান্য তত্ত্বকে খণ্ডন করল।

জাপানের কাছে ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে রাশিয়ার পরাজয় ভারতে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জোরদার করেছিল। জাপানের বিজয়কে স্বাগত জানিয়ে ইংরেজী দৈনিক 'বেঙ্গলী' লিখেছিল, সমকালীন ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইউরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার বিজয় আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় দুই দেশের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করল। কারণ আধুনিক সমরবিদ্যার জন্মভূমি হল ইউরোপ। ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি ধ্বনিত করে 'বেঙ্গলী' লিখেছিল: 'Persia has self-government. China will soon have it. India after one hundred and fifty years of British rule is still without self-government.'

উনিশ শতকের প্রথম দিকে রাশিয়ায় জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯০০-এ রাশিয়ায় গভীর অর্থনৈতিক সংকট প্রবল গণবিক্ষোভের সৃষ্টি করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জারশাসিত রাশিয়ার পরাজয় ঐদেশের সরকারের অযোগ্যতা ও আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি প্রমাণ করেছিল এবং গণবিক্ষোভের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল। ১৯০৫-এ সমগ্র রাশিয়ায় এবং বিশেষ করে সেন্ট পিটার্সবার্গের কলকারখানাগুলিতে ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। শ্রমিকেরা শোভাযাত্রা করে জারকে গণ-আবেদন পত্র প্রেরণ করতে গেলে প্রবল সশস্ত্র সামরিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ফলে এক হাজার শ্রমিক নিহত হয়। শ্রমিকের অর্থনৈতিক

ধর্মঘট রাজনৈতিক আকার ধারণ করে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা উত্তাল গণবিক্ষোভে যোগ দেয়। প্রবল পরাক্রান্ত জার দেশব্যাপী রাজনৈতিক গণবিক্ষোভের সম্মুখে সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্ট আহবানে সম্মত হয়। ১৯০৫-এ রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করে। স্বৈরতান্ত্রিক সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জয় সূচিত হয়।

১৯০৫-এ জাপানের কাছে জারের পরাজয় এবং প্রথম রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারত সমেত প্রাচ্যদেশগুলিতে প্রথম পর্বের গণআন্দোলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল। আয়র্লাণ্ড, মিশর, তুরস্ক এবং চীনে সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করেছিল বিশ শতকের প্রথম দশকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শ্বেতজাতি প্রাধান্য নীতির বিরুদ্ধে বোয়েরগণ প্রবল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ বোয়েরদের উপরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়েছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে বোয়েররা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালায়।

ঊনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সারা বিশ্বের সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলি ভারতীয়দের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সব ঘটনাবলী ভারতে বহন করেছিল মুক্তি সংগ্রামের বাণী। ভারতীয়েরা বুঝতে সুরু করল যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে প্রবল পরাক্রা বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়। লালা লাজপৎ রায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন : 'There can be no doubt that Indian nationalism is receiving a great deal of support from world forces operating outside India'. বিশ্ব ঘটনাবলী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন বিকাশে খুবই সহায়ক হয়েছিল। ভারতে জাতীয় আন্দোলনে নতুন চেতনার বিকাশ এবং নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্ব ঘটনাবলীর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল।

২. বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের পটভূমি

বিশ্ব ঘটনাবলী ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতের বিশ শতকের প্রথম দিকের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে বিশ শতকের প্রথম দশককে গণ-আন্দোলনের সূচনা

পর্ব বলা যায়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। তার ফলে গণ-আন্দোলনের সূচনা দেখা যায়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বিকাশমান নতুন বিশ্ব ঘটনাবলী এবং ভারতীয়-দের ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের আদৌ বিচলিত করে নি। বরং ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা দেশের তরুণ-যুব মানসে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার ভারতীয়ের জন্যে প্রায় রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকেরা আইন-ব্যবসা ও সরকারী চাকরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায়, সরকারী চাকুরীর সুযোগ এতই সীমিত হয়েছিল যে ১৯০৩-এ সারা ভারতে পঁচাত্তর টাকা মাস মাহিনার ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ষোল হাজার। জাতীয় কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে দৃষ্টিকটুভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী ডাক ও তার বিভাগে ৭৯টি উচ্চ পদে ৭৫ জন ইংরেজ ও ৪ জন ভারতীয়, বনবিভাগে ২৪টি উচ্চপদে ২২ জন ইংরেজ ২ জন ভারতীয়, পুলিশ বিভাগের ১১২টি উচ্চপদের মধ্যে ১০৩ জন ইংরেজ ও ৯ জন ভারতীয়, জরিপবিভাগের উচ্চপদে ১৩টির মধ্যে সবকটিতে ইংরেজ এবং শুল্ক বিভাগের উচ্চপদে ৩৩ জনের মধ্যে ৩২টি ইংরেজ এবং ১টিতে ভারতীয় নিয়োগ করা হয়েছিল।

শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে আবার নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংবাদিকতার প্রতি ঝুঁকেছিলেন। পেশা হিসাবে আইন-ব্যবসা ও সাংবাদিকতার সাফল্য তখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের কঠোর শিক্ষানীতির ফলে ডিগ্রীধারীদের পরিবর্তে ডিগ্রী পরীক্ষায় অসফল প্রার্থীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ডিগ্রীধারীদের সামনে সরকারী-চাকুরী, আইন-ব্যবসা বা সাংবাদিক-পেশার অনিশ্চয়তা এবং ডিগ্রী অর্জ্জনে অসফল যুবকদের সামনে কোনোরকম সুযোগ না থাকায় চরম হতাশার সৃষ্টি করেছিলেন।

বিশ শতকের প্রথম দিকে মধ্যবিত্ত তরুণ-যুবসমাজের হতাশার পাশাপাশি গ্রামের কৃষক এবং শহরের শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভূমিনীতি, জমিদার ও মহাজনের শোষণ গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য গরীব ও মাঝারি কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ পুঁজির আওতায়

গড়ে ওঠা কলকারখানাগুলিতে তখনও পর্যন্ত কোনোপ্রকার শ্রম-আইন এবং ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হয়। ব্রিটিশ পুঁজির অধীন কলকারখানায় চাকরীর নিরাপত্তা ছিল না। সেজন্য অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক নীতি আরো আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতিতে কিছু উদারতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সামাজিক-সংস্কারে উৎসাহ দান এবং সামাজিক-সংস্কার-মূলক আইন প্রণয়ন করে ব্রিটিশ প্রশাসন যে উদারতার পরিচয় দিয়েছিল পরবর্তীকালে সেই নীতির পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার চেহারা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো নরমপন্থী নেতার দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন ঃ ভারতীয় জনমত প্রবল ভাবে উপেক্ষা ক'রে, জাতি-বৈষম্য সৃষ্টি ক'রে, মহারাণীর ঘোষণার সঙ্গে প্রশাসনিক কার্যের সাগর প্রমাণ ব্যবধান ঘটিয়ে, ভারতীয়দের লাঞ্ছিত ক'রে এবং একের পর এক নিপীড়ন-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ প্রকাশ করেছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হল লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল ভারত শাসননীতি। ১৮৯৯-এর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল কলকাতা করপোরেশনের কাঠামোয় আঘাত করল। করপোরেশনের কমিশনারের সদস্য সংখ্যা ৭৫ থেকে ৫০-এ হ্রাস করা হ'ল। পূর্বেকার দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কমানো হল। ৫০ জন কমিশনারের মধ্যে ২৫ জন মিউনিসিপ্যাল করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। অবশিষ্ট ২৫ জনের মধ্যে ১৫ জনকে সরকার মনোনয়ন করবেন এবং ১০ জনকে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি প্রেরণ করবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো নরমপন্থী নেতাও ১৮৯৯-এর বিলকে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পরিহাস' বলে বর্ণনা করলেন।

১৯০৪-এ বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুনর্গঠন করা হয়। এই আইনে বেসরকারী কলেজগুলির উপর হস্তক্ষেপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস, ছাত্রদের শিক্ষাবেতন বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটগুলিতে সরকারী মনোনীত সদস্যের প্রাধান্য সৃষ্টির মত প্রতিক্রিয়াশীল ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন

করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী হস্ত প্রসারিত করার সংগেই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। ১৯০৩-এর 'ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল্স সিক্রেট্স অ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট' ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশে কণ্ঠরোধ করে। এই আইন ১৮৭৮-এর 'ভারনাকুলার প্রেস আইনের' চেয়ে আরও ভয়ংকর। ১৯০৩-এর সংবাদপত্র কণ্ঠরোধকারী আইন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

ভারতের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী ও নরমপন্থী নেতারা এতদিন ধরে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ব্রিটিশ শাসনের তিনটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে মনে করতেন। তাঁদের চোখের সামনে ব্রিটিশ শাসনের তিনটি অবদান নিদারুণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তিকে লর্ড কার্জন প্রবলভাবে আঘাত করেন। দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন নিজের স্বার্থে সমস্ত অধিকার সংকোচন করতে আদৌ কুন্ঠিত নয়।

ভারতের উত্তেজনাময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ১৯০৩-এর ডিসেম্বর রিসলের পত্র সবকারীভাবে প্রকাশিত হল। রিসলে পত্রের বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা সরকারী গেজেটে ঘোষিত হল। ধূমায়িত অসন্তোষের বারুদে রিসলের পত্র প্রজ্বলিত কাঠি নিক্ষেপ করে। রিসলের পত্রে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ বিভাগ তিনটিকে বঙ্গদেশ থেকে বিভক্ত করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা প্রকাশ করা হ'ল। এর দ্বারা আসাম এবং পূর্বঙ্গ নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হল। কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দ্রুত প্রসারের প্রয়াস চলল। পশ্চিম-বঙ্গে বিহার ও উড়িস্যা বাসীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দ্রুত বিকাশমান জাতীয়-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংহতি বিপন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের চতুর প্রতিনিধি লর্ড কার্জন আন্দোলন-মুখী উদীয়মান বাঙালী মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনপ্রিয়তায় প্রমাদ গুনেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সাম্রাজ্যবিরোধী গণ-আন্দোলন যাতে মাথা চাড়া দিতে না পারে সেজন্য পূর্বঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল। জাতীর আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ ছড়ানো হ'ল।

রিসলের পত্রে প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বাঙালীরা এই প্রস্তাবকে জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা কলকাতার হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংবাদপত্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা স্বল্প পরিচিত আসামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাবকে বাঙালী সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা বলে মনে করলেন। পশ্চিমবঙ্গের চাল ও পাট ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামকে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাবকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদাররা বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গে জমির মূল্য কমে যেতে পারে বলে আশংকা করেছিলেন।

৩ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন

১৯০৩-এর ডিসেম্বরে রিসলের পত্রে বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা সরকারীভাবে প্রকাশিত হবার পর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের প্রকৃতি সবসময় একরকম ছিল না। আন্দোলনের তীব্রতা এবং সংগ্রামপন্থী পদ্ধতি গ্রহণ অনুসারে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে মোটামুটি-ভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। রিসলের পত্র প্রকাশের সময় থেকে ১৯০৫-এর জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবিভাগ ঘোষণা পর্যন্ত সময়কালে যে আন্দোলন হয়েছিল তাকে প্রথম পর্ব বলা যায়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে মৌখিক প্রতিবাদ ও নিয়মতান্ত্রিক বিক্ষোভগুলি সম্যকরূপ কার্যকর হয়েছিল। সোজা কথায়, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে নরমপন্থী নেতাদের পরিচালিত আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

১৯০৫-এর আগষ্ট মাসে ঐতিহাসিক টাউন হলের জনসভা দিয়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাবিত সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সংগ্রামমুখী রাজনৈতেক পদ্ধতির প্রয়োগ ১৯০৮-এর অ্যালিপুর ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। এই সময় নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাব প্রশমিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং মতাদর্শ জাতীয় আন্দোলনে প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের

তীব্র উৎপীড়ন এবং দমন প্রকটিত হয়েছিল। তৃতীয় পর্বের শুরু হয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকে এবং এই পর্বের শেষ হয় ১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায়। তীব্র সরকারী রোষ ও দমন পীড়নের সম্মুখে তৃতীয় পর্বে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নেতারা আংশিকভাবে সরকারকে অগ্রাহ্য করে পশ্চাদপসরণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

ক প্রথম পর্ব: নরমপন্থী নেতৃত্ব ও বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে বাংলাদেশের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় ছিল। রিসলের পত্র প্রকাশের পর বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সম্ভাব্য সবরকমের মৌখিক প্রতিবাদ ও নিয়মতান্ত্রিক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেন। আন্তরিকভাবে তাঁরা আশা করেছিলেন যে ব্রিটিশের ন্যায়-বোধ এবং ব্রিটিশ সরকারের উদারনৈতিক দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত চরম রক্ষণশীল লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনাকে রোধ করতে পারবে। তাঁরা মনে করতেন শেষ পর্যন্ত বঙ্গ-বিভাগ কার্যকর হবে না।

১৯০৩-এর ডিসেম্বরে বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য সভা সমিতি সারা বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৯০৫ পর্যন্ত ছোট বড় এবং অতি বিশাল প্রায় দুহাজার বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভায় বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। বাংলার মতো ঘনসন্নিবিষ্ট এবং সম-প্রকৃতি সম্পন্ন প্রদেশকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। বিভিন্ন সভাসমিতি থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর না করার জন্য ভাইসরয়কে অনুরোধ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডের সেক্রেটারী অফ স্টেটকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ কমন্স সভার হস্তক্ষেপ দাবি করেন। ষাট হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি কমন্স সভায় প্রেরণ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে গোপালকৃষ্ণ গোখেল বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পদ্ধতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী রাজনৈতিক বিক্ষোভে বাংলার বহুমানভাজন অরাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের ফলে এই আন্দোলন মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

কারণ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ময়মনসিংহ এবং কাশিমবাজারের বড় বড় জমিদার বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনে গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী ঘোষের মত সম্মানিত বুদ্ধিজীবীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন জমিদার ও সামন্ত শক্তির প্রতিভূ পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাময়িকভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদীয়মান নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় হাত মিলিয়েছিলেন।

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাবিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সভাসমিতি, বক্তৃতা, স্মারকলিপি, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ইত্যাদির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৫ পর্যন্ত বহু প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে ভারতের এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। এই সব প্রচার পুস্তিকায় জনসাধারণ বা গণ-আন্দোলনের প্রতি কোনো আবেদন ছিল না। উচ্চ আদালতে সফল উকিলের পদ্ধতি অনুসরণ করে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব-বিরোধী যুক্তিগুলি জোরালো ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ ক'রে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং জনমতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হ'ত। তাঁরা আশা করেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং জনমতের দরবারে লর্ড কার্জনের প্রতি ক্রিয়াশীল প্রস্তাব খারিজ হয়ে যাবে।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন ক'রে সরকার প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তি দেখিয়েছিল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বাংলাকে অখণ্ড রেখে কেমনভাবে উচ্চস্তরে প্রশাসনিক সুবিধা অর্জন করা যায় তার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মত বাংলায় পূর্ণ গভর্ণর এবং তাঁর কর্মপরিষদ প্রবর্তন করা হলে অখণ্ড বাংলায় যথেষ্ট প্রশাসনিক সুবিধা অর্জ্জন করা যাবে। বাংলার অত্যধিক প্রশাসনিক বোঝা লাঘব করার জন্য তাঁরা হিন্দী ওড়িয়া ভাষাভাষী জেলাগুলিকে স্বতন্ত্র করার সুপারিশ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় সর্বস্তরের বাঙালী উচ্চশিক্ষা এবং কর্মনিয়োগের সুযোগ হ্রাসের সম্ভাবনা আশংকা করেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে বাঙালীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে।

বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনার করাল ছায়ার মধ্যে ১৯০৩-এ মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেস সভাপতি লালমোহন ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের প্রভাবে মাদ্রাজ কংগ্রেস অত্যন্ত অনিচ্ছুক ভাবে বাংলা ভূখণ্ডকে ভাগ করে এই প্রদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও প্রশাসনিক ঐক্যকে ব্যাহত করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। সর্বভারতীয়

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বঙ্গ-বিভাগ বিষয়টিকে প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁরা মনে করতেন বঙ্গবিভাগ ব্যাপারটি সর্বভারতীয় ব্যাপার নয়, এটি নিতান্তই প্রাদেশিক। অবশ্য বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের তীব্র চাপের সামনে তাঁরা তাঁদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

১৯০৪-এর বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে আরও এক পদক্ষেপ অগ্রগতি সূচিত হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনাকে বাঙালীর জাতিসত্তাকে খণ্ডিত করার পরিকল্পনা বলে অভিহিত করে। বাংলা প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্যই লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা পেশ করেছেন। বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের দাবি ধ্বনিত করে ১৯০৪-এর কংগ্রেস বাংলাকে পরিপূর্ণ গভর্ণর শাসিত প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯০৪-এর কংগ্রেস বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ গত দুবছর যে সব যুক্তিগুলি দেখিয়েছিলেন সেগুলিকেই প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করে।

দেড় বছর সময় কাল পর্যন্ত বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের বঙ্গবিভাগ-বিরোধী উদারনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতিগুলি পূর্ণোদ্যমে প্রয়োগ করা হয়েছিল। কারণ তখন তাঁরাই ছিলেন বাংলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা। সারা ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার নরমপন্থীরা ১৯০৩ ও ১৯০৪-এর কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সর্বপ্রকার মৌখিক প্রতিবাদ এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সত্ত্বেও ১৯০৫-এর ১৯শে জুলাই সরকারীভাবে বঙ্গ-বিভাগ কার্যকর করা হল। বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অসহায় ভাবে লক্ষ্য করলেন তাঁদের রাজনৈতিক পদ্ধতি সমূহের অসাফল্য। ১৯০৪-এ বঙ্গদর্শনে' 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নরমপন্থী রাজনীতির আন্দোলন পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তিনি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে লেখেনঃ 'যদি সত্য তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালী জাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ?' তিনি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে 'রুদ্ধদ্বারে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি' এবং 'নৈরাশ্যের ক্রন্দন' বলে বর্ণনা করেছেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবর্তে তিনি সংঘাত চেয়েছিলেন। কারণ 'সংঘাত ব্যতীত বড় কোন জিনিসই গড়িয়া ওঠে না।'

খ. দ্বিতীয় পর্ব : চরমপন্থী নেতৃত্ব ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের সূচনা

নরমপন্থী প্রভাবিত আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ১৯০৩-এর রিসলে পত্র প্রকাশকাল থেকে ১৯০৫-এর জুলাই পর্যন্ত পুরোদমে চলেছিল। নরমপন্থীদের ব্রিটিশের ন্যায়বোধ ও বিবেকের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সত্ত্বেও ১৯০৫-এ ১৯শে জুলাই বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। বিশ শতকের প্রথম দিকে নব বিকাশমান সংগ্রামপন্থী জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রতিনিধিগণ বঙ্গভঙ্গকে নরমপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতারূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ নরমপন্থী প্রভাবিত আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হয় নি। ১৯০৫-এর মাঝামাঝি সময় থেকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আবেদন-নিবেদনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এই সংঘাত-সংঘর্ষ বঙ্গবিভাগ থেকে শুরু হলেও এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে পড়তে দেখা যায়।

নরমপন্থী এবং সংগ্রামপন্থী মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয় ১৯০৫-এর বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে। বেনারসের অধিবেশন সদ্য ঘোষিত বঙ্গবিভাগের দুঃখময় ঘটনার পরেই অনুষ্ঠিত হয়। দাদাভাই নৌরোজী জাতীয় আন্দোলনের ভেতরে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠছে এ খবর রাখতেন। সেজন্য তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে ইংলণ্ড থেকে বাল গঙ্গাধর তিলককে লিখলেন যে কংগ্রেস সংগঠন যেন দ্বিধাবিভক্ত না হয়। দেখা গেল দুই মতাদর্শের নেতারা বঙ্গবিভাগকে নিন্দা করতে একমত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে ঘোষণা করলেন যতদিন বঙ্গবিভাগ রদ না হচ্ছে ততদিন বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনপন্থী ও চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্য হল রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণকে কেন্দ্র করে। সভাপতির ভাষণে গোপালকৃষ্ণ গোখেল স্বদেশী আন্দোলনকে প্রশংসা করলেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে বয়কট আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিদের সতর্ক করে দিলেন। তাঁর মতে বয়কটের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ আছে 'অপরকে আঘাত করার বিদ্বেষময় ইচ্ছা'। বলাই বাহুল্য গোখেল এই বক্তব্যের দ্বারা বলতে চাইলেন, বয়কট আন্দোলন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আঘাতের উদ্দেশ্যে

পরিকল্পিত হয়েছে। ১৯০৫-এর কংগ্রেস অধিবেশনে লালা লাজপত রায় রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গ্রহণের আবেদন জানান। কিন্তু মনে রাখতে হবে বেনারস কংগ্রেসের চার মাস আগে বিপিনচন্দ্র পাল নরমপন্থী রাজনীতিকে 'সোডা-জলের উজ্বাস' বলে বর্ণনা করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পন্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র এই সময় পৌরসভা, জেলা ও আঞ্চলিক বোর্ড এবং আইন সভাগুলির সদস্যদের পদত্যাগের জন্য অনুরোধ করেন। ১৯০৫-এর কংগ্রেস বয়কটের উপর প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও বাংলার বয়কট আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়।

১৯০৫ এর অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে বলে সরকার ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান অনুযায়ী এই দিনকে রাখীবন্ধন দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছিলেন বাংলার সমস্ত মতাদর্শের নেতৃবৃন্দ। বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ১৬ই অক্টোবর প্রতি বছর রাখীবন্ধন উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৬ই অক্টোবর শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং পথের দুধারে সবাই-এর হাতে রাখী পরিয়ে দেওয়া হয়। রাখী-বন্ধন উৎসব বঙ্গবিভাগ বিরোধী রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, ১৯০৫-এর ২৫শে আগষ্ট বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'অবস্থা-ও-ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে সমর্থন করেন নি। তিনি গঠনমূলক 'আত্মশক্তি' বিকাশের মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

১৯০৪-এর শুরু থেকে বিপিনচন্দ্র পাল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী নতুন জাতীয় চেতনা বিকাশে সক্রিয় হয়েছিলেন। তিনি 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে নতুন জাতীয় চেতনা প্রকাশ করেন। ১৯০৪-এর শেষের দিকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' নামে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম বান্ধব সংগ্রামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও পন্থার সমর্থক ছিলেন। চলতি ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশিত হত। শহর, আধা শহর, গ্রাম ও গঞ্জের স্বল্প-শিক্ষিত মানুষের কাছে 'সন্ধ্যা' দৈনিক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় চলে আসাতে বাঙালীর সংগ্রামমুখী রাজনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারিত হল। এক কথায়, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দ বাংলার সংগ্রামমুখী রাজনীতির সর্বময় নেতৃত্বে ছিলেন।

অরবিন্দ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-বিরোধী বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার সচেষ্ট হলেন। তিনি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 'পর্দার অন্তরালে শলা পরামর্শের' নীতির বিরোধিতা করলেন। তিনি বঙ্গবিভাগ বিরোধী সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক বিক্ষোভকে সুসংবদ্ধ কর্মসূচীভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার কথা প্রচার করলেন। বাংলার বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লাজপত রায় মিলিত হলেন। তিলক প্রথম থেকেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। তিলকের পরিচিতি ও খ্যাতি ছিল সর্বভারতীয়। তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাবের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি-বিরোধী সংগ্রামপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের মধ্যে সমবেত হলেন। তাঁরাই ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত নরমপন্থী নেতৃত্ব এবং তাঁদের কর্মসূচী ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিকল্প সংগ্রামমুখী ও চরমপন্থী রাজনৈতিক পন্থা উদ্ভাবন করলেন। বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করেই ভারতের রাজনীতিতে সংগ্রামমুখী চরমপন্থার প্রসার ঘটে।

১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে জাতীয় আন্দোলনের আবেদন-নিবেদন পন্থী ও সংগ্রামপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতাদর্শের সংঘাত-সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সমাবেশ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের শিবিরে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। সংকট এড়ানোর জন্য নরমপন্থী নেতারা লন্ডন প্রবাসী অশীতিপর দাদাভাই নৌরোজীকে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি হতে রাজী করালেন। সভাপতির ভাষণে নৌরোজী জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে 'স্বরাজ' শব্দটি উচ্চারণ করলেন। অবশ্য তিনি স্বরাজ বলতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য অথবা সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে যে ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রচলিত আছে তার কথাই বললেন। তিনি বললেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বৈরাচারী শাসক রুশিয়ার জার ঐ দেশের কৃষকদের 'ডুমা' (পার্লামেন্ট) গঠনের অধিকার দিয়েছেন। অতএব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় নাগরিকরা নিশ্চয়ই প্রতিনিধিত্বমূলক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধিকারী হবেন। নৌরোজীর বক্তৃতা প্রধানত আপোষমূলক ছিল। বাংলার ধূমায়িত সংগ্রামপন্থী রাজনৈতিক দাবির কথা মনে রেখে তিনি নরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বরাজ চেয়েছিলেন। নৌরোজীর ভাষণে নরমপন্থীরা যেমন খুশী হয়েছিলেন ঠিক তেমনই সংগ্রামপন্থী নেতাদের আশা অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল।

১৯০৬-এর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটি বয়কট প্রস্তাবকে অনুমোদন করে। অনুমোদিত প্রস্তাবে বলা হয় প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলার বয়কট আন্দোলন একান্তই আইনানুগ। প্রকাশ্য অধিবেশনে অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বিপিনচন্দ্র পালকে প্রস্তাবটি সমর্থন করতে বলেন। বয়কট প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র সংগ্রামপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বয়কট প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করে বললেন, এই সংগ্রাম প্রত্যেকটি শহরে, বিভাগে এবং প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে। বয়কট আন্দোলন সমস্ত ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য এবং সকল প্রকার সরকারি চাকরীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে। বয়কট আন্দোলন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস অধিবেশনে প্রায় রাজনৈতিক মতাদর্শের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি বললেন বয়কট আন্দোলন ততদিন চলবে যতদিন না পর্যন্ত দেশের প্রতিটি অভিযোগের প্রতিকার এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে ভারতীয় জাতি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বিপিনচন্দ্র পালের বয়কট প্রস্তাব ব্যাখ্যায় স্তম্ভিত হলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল বিপিনচন্দ্রের তীব্র বিরোধিতা করলেন। বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যার বিরোধিতা ক'রে মদনমোহন মালব্য বয়কট আন্দোলনকে বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে দেবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। বিশিষ্ট নরমপন্থী নেতা আশুতোষ চৌধুরী বাংলার বাইরে অন্য প্রদেশে বয়কট আন্দোলনের প্রসার সমর্থন করলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রামপন্থীদের ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের নীতির বিরোধিতা করলেন। তিনি বিপিনচন্দ্রের বয়কট ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ইঙ্গিত লক্ষ্য করলেন। তিনি জোরের সঙ্গে আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক পন্থার সমর্থন করলেন। বয়কট আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে ব্যবহার করার দৃষ্টিভঙ্গীকে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯০৬-এর কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থী নেতাদের নৈতিক জয় হয়েছিল। 'বয়কটের' পাশাপাশি 'স্বদেশী' এবং 'জাতীয় শিক্ষার' উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। নরমপন্থী নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস সংগঠনে বয়কটের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুমোদন করানো সংগ্রামপন্থীদের বিজয় সূচিত

করেছিল। দেখা গেল বয়কট আন্দোলনের আবেদন দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাংলার অন্যতম চরমপন্থী নেতা অরবিন্দ ঘোষ বয়কটকে কেন্দ্র করে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' রাষ্ট্রদর্শন রচনা করলেন। তিনি দেখালেন ভারতের দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক সম্পদের নির্গমনের মূলে রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী শোষণ। ভারতে সংরক্ষণনীতি অনুসৃত না হওয়ায় দেশের শিল্প ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। তিনি সমস্ত ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট ক'রে বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করার আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে বয়কট আন্দোলন ভারতে বিদেশী শোষণকে আঘাত করবে। বিপিনচন্দ্র পাল বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরোক্ষে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় সংরক্ষণের নীতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করলেন। তিনি পরাধীন দেশে সংরক্ষণ নীতির হাতিয়ার হিসাবে বয়কট আন্দোলনকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক টাউন হলের সভার পর জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন জোরদার হতে থাকল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল বাংলার ছাত্র-যুবসমাজ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-যুবসমাজের বিপুল সংখ্যায় যোগদান এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করেছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা তীব্র ছাত্র আন্দোলনের সামনে কঠোর দমন-পীড়ন নীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। ১৯০৫-এর অক্টোবরে সরকারী কার্লাইল সারকুলার ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য হুকুমনামা জারী করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করতে না পারলে তাদের আর্থিক অনুদান বন্ধ করা এবং অনুমোদন প্রত্যাহার করার হুমকি দেওয়া হল। আরেকটি সরকারী সারকুলারে পূর্ববঙ্গের স্কুলগুলিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করা হল। নিষেধনামা ভঙ্গকারী ছাত্রদের সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেওয়া হল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কটের জন্য নিরন্তর প্রচার চালিয়েছিল। এই সময় কলকাতার একহাজার ছাত্র সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলন নিষিদ্ধকারী সরকারী হুকুমনামাগুলি প্রচারিত হলে বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, আব্দুল রসুল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হীরেন্দ্র

নাথ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখরা বিভিন্ন জনসভা ও ছাত্রসভায় অপমানজনক সরকারী আদেশের তীব্র বিরোধিতা করেন।

পূর্ববঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী দমন-পীড়ন কলকাতার ছাত্র সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে। কলেজ স্কোয়ারে বিশাল জনসভায় ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ বসু সরকারী সারকুলার বিরোধী সংস্থা গঠন করে ছাত্র আন্দোলকে তীব্র করার আহবান জানান। এই সভায় 'অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটি' গঠিত হয়। এই সোসাইটি মফঃস্বলে বিতাড়িত ছাত্রদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বয়কট আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা এম এ এবং পি আর এস পরীক্ষা বর্জন করেন।

বয়কটকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায় সেইজন্য নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উদ্যোগী হলেন। আশুতোষ চৌধুরীর আহবানে বিশিষ্ট ন্যাগরিকদের সভায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ছাত্রদের পরীক্ষা বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হয়। বলা বাহুল্য এই সভার সিদ্ধান্ত সংগ্রামপন্থী নেতাদের খুশী করতে পারে নি। বিপিন পাল নরমপন্থী নেতাদের অনুরোধ সত্ত্বেও ছাত্রদের পরীক্ষা বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

১৯০৬-এর মার্চে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম ধাপে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রতিষ্ঠিতা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি-বিদ্যাভিত্তিক ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়।

কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে চরমপন্থী নেতারা জাতীয় আন্দোলনের নূতন লক্ষ্য ঘোষণা করলেন। এতদিন প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্রিটিশ শাসনের নিয়ন্ত্রণবিহীন পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করলেন। অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় স্বাধীনতাকে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করলেন। জাতীয়-বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতার

ধ্বনি তুলেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে ভারতের নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা শোনা গেল।

১৯০৬-এর মাঝামাঝি বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আসার চেষ্টা করলেন। বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা সমবেত হলেন। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার জন্য পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে। আইন ভঙ্গের জন্য পুলিশ সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে এবং দ্বিতীয় দিনের সভায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য শেষ পর্যন্ত সভা পণ্ড হয়ে যায়।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকা, সংগ্রামপন্থীদের 'বন্দে মাতরম্' ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা এবং জাতীয় বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রচার বহু গুণ বেড়ে যায়। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের রাজনৈতিক আবেদন ও কর্মসূচী এই তিনটি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। সংগ্রামপন্থী গণ-মাধ্যমের বহুল প্রচার গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। 'সন্ধ্যা', 'বন্দে মাতরম' ও 'যুগান্তর' পত্রিকাগুলি গণ-মাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

গণ-মাধ্যমে সংগ্রামপন্থী মতাদর্শ দ্রুত প্রচারে গণ-সংযোগ বৃদ্ধি পেলে ব্রিটিশ শাসকেরা শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। ১৯০৭-এ ব্রিটিশ শাসক বাংলার সংগ্রামপন্থী পত্রিকাগুলিকে একের পর এক মিথ্যা মামলায় জড়িত করে। প্রথমে 'যুগান্তর' পত্রিকা, তারপর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা এবং শেষে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার উপর সরকারী আক্রমণ এসে পড়ে। বিভিন্ন মামলায় এই সব পত্রিকাগুলিকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯০৮ এর কুখ্যাত সংবাদপত্র দলন আইন প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামপন্থী পত্রিকাগুলিকে প্রকাশনা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়।

১৯০৮-এর জুন মাসে রাজদ্রোহের অপরাধে বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের প্রহসনের পর তিলক ছ'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিলকের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির শ্রমিকেরা সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। এই ধর্মঘটকে লেনিন ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক ইঙ্গিত বলে

অভিনন্দিত করেছিলেন। এই সময় স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের বহু বিশিষ্ট নেতাকে হয় দণ্ডিত নয়তো নির্বাসিত করা হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত একমাত্র বাংলাদেশেই ৫৫০টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই সঙ্গে পুলিশের অসম্ভব জুলুম এবং পুলিশ কর্তৃক বলপূর্বক জনসভা ভাঙ্গার ঘটনা প্রায়ই ঘটতো।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে শ্রমিক আন্দোলনের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। চরমপন্থী নেতারা গণ-আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীকে যুক্ত করায় প্রয়াসী হন। এই সময় কলকাতার সরকারী ছাপাখানায় দু'হাজার শ্রমিক এক মাস ধর্মঘট পালন করেন। ছাপাখানার শ্রমিকেরা বেঙ্গল প্রেস ওয়োকার্স ইউনিয়ন গঠন করেন। ১৯০৫-এর ধর্মঘট আন্দোলন বহু শিল্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। হাওড়ার বার্ন কোম্পানী এবং কলকাতার ট্রাম শ্রমিকেরা ধর্মঘট পালন করেন। কলকাতা কর্পোরেশনের দু'হাজার শ্রমিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। পূর্ব ভারতীয় রেলের গার্ডেরা বেতন কাঠামো উন্নতির দাবিতে ধর্মঘট করেন। বিপিনচন্দ্র পাল ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখেন। কলকাতার ছাপাখানা শ্রমিকদের সভায় বাল গঙ্গাধর তিলক, খাপারডে এবং মুঞ্জের মতো সর্বভারতীয় নেতারা বক্তৃতা করেন। ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের সভায় চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতিত্ব করেন এবং বিপিনচন্দ্র পাল ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। বাংলার বিশিষ্ট আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রদ স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের আংশিক বিজয় সূচিত করে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সংগ্রামপন্থী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন যেভাবে বিস্তারিত হয়েছিল তার প্রভাব সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনে পড়তে দেখা যায়। এই পর্বে গণ-আন্দোলনের সূচনা এবং ছাত্রযুব আন্দোলনের বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বয়কটের মতো অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করার কৃতিত্ব চরমপন্থী নেতাদের প্রাপ্য। কংগ্রেস আন্দোলনের বাইরে এই সময়েই পূর্ণ স্বাধীনতার রাজনৈতিক লক্ষ্য ধ্বনিত হয়। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে বাংলার চরমপন্থী নেতাদের অগ্রগামী রাজনৈতিক দাবি জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছিল ১৯২৯ সালে।

৪. স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও তাৎপর্য

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বিক্ষোভ স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে পূর্ণতা লাভ করেছিল। তৎসত্ত্বেও স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য বহুলাংশে অপূর্ণ থেকে

গেছে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতে রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়েছিল এবং গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব সূচিত হয়েছিল। ব্যাপক গণ অংশগ্রহণের নিরিখে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মত সুবিশাল গণ-আন্দোলন বলা যায় না। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশে আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক আনুগত্যের সৃষ্টি করেছিল। বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় পার্শ্ববর্তী বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে এই আন্দোলনের প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব সুদূর মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতে পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির মানুষ স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের মধ্যে বাঙালীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিল।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। ১৯০৫ এবং ১৯০৬-এর রাজনৈতিক উত্তেজনাময় দিনগুলিতে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কর্মপদ্ধতির সাফল্য ধীরে ধীরে সারা ভারতে অনুভূত হতে থাকলে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভীত হলেন এবং সুকৌশলে ১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থীদের সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হলেন। ১৯০৯-এর মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার স্বদেশী বয়কট আন্দোলনের কোনো আশা পূর্ণ করতে পারে নি। উপরন্তু মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তন ক'রে ভারতীয় রাজনীতিতে তীব্র সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করল এবং ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদে ইন্ধন জোগালো। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের ব্রিটিশ শাসনের বাইরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারের দাবিকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা হতে আরো দু' দশক সময় লাগল। অবশ্য বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা রাজনৈতিক প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত করেছিলেন।

বয়কট আন্দোলন অতি শীঘ্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বয়কট আন্দোলনের প্রথম দিকে বিদেশী পণ্যদ্রব্য আমদানী অনেক কমেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯০৭-এর পর বয়কট আন্দোলনের তীব্রতা দ্রুত হ্রাস পায় এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় কলকারখানা ও অর্থনীতির বিকাশ। দেখা গেল স্বদেশী উত্তেজনা প্রশমিত হবার

পর সেই যুগে গড়ে ওঠা ছোট ছোট কলকারখানা ও দোকানগুলির ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় পুঁজির উদ্যোগে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার আশানুরূপ পুনরুজ্জীবন ঘটে নি।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই তীব্র অর্থাভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, পরিচালন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের অভাব এবং সর্বোপরি জনসমর্থনের অভাবে জাতীয় স্কুলগুলি মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেগুলি স্থায়িত্বলাভ করে নি। স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সাময়িকভাবে ভারতীয় রাজ-নীতিতে মেরুবিন্যাস ঘটে। স্বদেশী যুগে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ 'মাতৃ-মতবাদ' 'কৃষ্ণ-মতবাদ' ইত্যাদি প্রচার করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শন সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আবেদনে হিন্দু সমাজ সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু বাংলা-দেশের মুসলমান সমাজ হিন্দু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আবেদনে সাড়া দেয় নি। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ 'পশ্চিম ইউরোপের সব কিছুর' বিরুদ্ধে 'প্রাচীন ভারতের সব কিছু ভালোর' মতবাদ সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। কারণ আধুনিক পশ্চিম ইউরোপ উন্নত ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতীক। প্রাচীন ভারতের সমাজ বিন্যাস ও ধর্মীয় চিন্তা দিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদী ইউরোপের শিল্প ও যন্ত্রবিজ্ঞানে অগ্রসর সভ্যতার সম্মুখীন হওয়া যায় না। ফলে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু পুনরুজ্জাগরণের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে সংগ্রামপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতের সুবিশাল কৃষক শ্রেণীকে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল করতে পারেন নি। কারণ স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে কৃষক শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি নিরসনের কোনো কর্মসূচী ছিল না। ভারতের কৃষক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও মহাজনের শোষণ ও উৎপীড়নে চরম দুর্গতির মধ্যে পড়েছিল। সংগ্রামপন্থী নেতৃবৃন্দ কৃষক শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রস্তুত না করায় বিশাল সংখ্যক কৃষকের কাছে এই আন্দোলন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সংগ্রামপন্থী নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় স্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। কারণ বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে তাঁদের প্রভাব সীমিত ছিল। উপরন্তু সংগ্রামপন্থীদের কোনো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই আন্দোলন

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এবং গৌরবময় ঐতিহ্য রেখে গেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সংগ্রামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং ভারতীয় স্বার্থ কখনই এক নয়। দুই বিপরীত-মুখী স্বার্থ সংঘাতের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনকে গতিশীল করেছিল। সংগ্রামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সমঝোতা না করে এই শাসনের অবসান চেয়েছিল। সেজন্য ব্রিটিশ জনমতের পরিবর্তে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আবেদন করা হয়েছিল। শাসন সংস্কার ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল এই যুগে। উচ্চবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে মধ্য ও নিম্নবিত্তের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছিল এই পর্বে।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংস্কৃতিক রেনেশাঁস এনেছিল। সেজন্য ১৯০৫-কে বাংলার সুবর্ণযুগের প্রভাত বলা যায়। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ অমর গানগুলি রচনা করেছিলেন। এই চিরায়ত গানগুলি আজও পর্যন্ত বাঙালীকে প্রেরণা জোগায়। রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সৈয়দ আবু মহম্মদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজি প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকরা সৃষ্টিশীল কাব্য ও সাহিত্য রচনা করে দেশপ্রেমের অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। স্বদেশী যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও ঐতিহাসিক নাটকগুলি বাংলার দেশপ্রেমিক মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এই সময় অসংখ্য কবি জেলায় জেলায় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে এবং গান লিখে স্বদেশী আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

বরিশালের মুকুন্দদাস স্থানীয় কথ্য ভাষায় দেশপ্রেমের গান ও যাত্রা রচনা করে সারা পূর্ববঙ্গে অসীম উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন। মুকুন্দদাস সারা পূর্ববঙ্গে কিংবদন্তীতে পরিণত হন। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতার মাধ্যমে গণমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল মুকুন্দদাসের গান ও যাত্রা। ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, পাবনা প্রভৃতি বাংলাদেশের জেলাগুলিতে দেশপ্রেমের গান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে গাওয়া হত। এই সময় লোকসঙ্গীত খুবই জনপ্রিয় হয়। কাব্যসংগীতের পাশাপাশি স্বদেশী যুগের আরেকটি অবদান হল মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক

তাৎপর্য বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা প্রবন্ধ লিখতেন। সেজন্য স্বদেশী যুগ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দুটির মধ্য দিয়ে স্বদেশী যুগের মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যক্ত করেছিলেন।

সাহিত্য, কাব্য ও সংগীতের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে স্বদেশী যুগ শিল্পের ক্ষেত্রেও স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছে। প্রাচ্যাভিমানী ওকাকুরা, নিবেদিতা এবং হাভেলের প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করলেন। অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগী শিল্পীরা পাশ্চাত্যশিল্প পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে ভারতীয় ইতিহাসকে শিল্প সৃষ্টির বিষয় করেছিলেন। তাঁদের শিল্পকলায় মুঘল এবং রাজপুত শিল্প প্রকরণ পদ্ধতির প্রভাব দেখা গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত মাতা' শিল্পটিতে রাজনৈতিক আবেদন দেখা যায়।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন বলা সমীচীন নয়। এই আন্দোলনের যুগে ভারতীয় মনীষার পুনর্জাগরণ হয়েছিল। গান্ধীজি লিখেছিলেন যে ভারতের প্রকৃত পুনর্জাগরণ ঘটে বঙ্গবিভাগের যুগে। রাষ্ট্র-চিন্তা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি মানববিদ্যার সর্বক্ষেত্রে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের প্রভাব দেখা গিয়েছিল।

৫. জাতীয় আন্দোলনে ভাঙন ও নরমপন্থীদের সাময়িক জয়

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম তীব্র করেছিল। এই আন্দোলন কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত প্রসার ঘটিয়েছিল। ফলে ভারতের ছাত্র ও যুব সমাজের উপর চরমপন্থী চিন্তাধারার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। চরমপন্থীদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি নরমপন্থী শিবিরে প্রবল উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল। ১৯০৫ এবং ১৯০৬-এর কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বজায় ছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৬-এর কংগ্রেসে স্বদেশী-বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা দাবি করে যুগান্তকারী প্রস্তাব অনুমোদন করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। দাদাভাই নৌরোজী ঘোষিত ঔপনিবেশিক স্বরাজের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সুকৌশলে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণবিহীন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য রূপে প্রচার করেছিলেন। স্বদেশী-বয়কট ও জাতীয় শিক্ষাকে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের

হাতিয়ার রূপে ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী মতাদর্শ ও কর্মসূচী প্রত্যাখ্যানে সক্রিয় ভাবে অগ্রণী হলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল বলেছিলেন 'উন্মাদ ব্যক্তিরাই কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে'। কারণ নরমপন্থীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কোনো বিকল্প হতে পারে না এবং জাতীয় আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত হবে। সেজন্য ১৯০৭-এর কংগ্রেস অধিবেশনে সামগ্রিকভাবে চরমপন্থী চিন্তাধারা ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন। ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেস অধিবেশন চরমপন্থীদের পিছু হটতে বাধ্য করে এবং নরমপন্থীদের সাময়িক জয় সূচিত করে।

১৯০৭-এর তেইশতম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে মতভেদ শুরু হয়। লাজপৎ রায় জেল থেকে ছাড়া পেলে চরমপন্থীরা তাঁর নাম সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করেন। অপরদিকে নরমপন্থীরা সভাপতিরূপে রাসবিহারী ঘোষকে মনোনয়ন করেন। লাজপৎ রায় সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসম্মত হলে চরমপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষের মনোনয়নকে তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে অরবিন্দ ঘোষ সুরাটের সন্নিকটে হরিপুর শহরে জাতীয়তাবাদীদের সম্মেলনে আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে অরবিন্দ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং বাল গঙ্গাধর তিলক মুখ্য বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সম্মেলনে যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যকে জাতীয়তাবাদী বলে শপথ নিতে হয়েছিল।

রাসবিহারী ঘোষের অপঠিত সভাপতির ভাষণ থেকে জানা যায় যে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস থেকে চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্নতা আশা করেছিলেন। সুরাট অধিবেশনে একজন প্রভাবশালী নরমপন্থী নেতা লাঠিধারী চল্লিশ জন লোককে মোতায়েন রেখেছিলেন। সেজন্য মনে হয় চরমপন্থীদের বিতাড়িত করার জন নরমপন্থীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ আনীত খসড়া প্রস্তাবগুলি ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসের চরমপন্থী প্রভাবিত প্রস্তাবগুলিকে নাকচ করার জন্য রচিত হয়েছিল। সুরাট কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবে স্বদেশী প্রসঙ্গে ১৯০৬-এর 'Even at some sacrifice' এর পরিবর্তে 'preference where possible' বলা হল এবং বয়কট প্রসঙ্গে 'বয়কট আন্দোলন' শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হল। জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে 'জাতীয় ধারা ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা' শব্দগুলিকে পরিত্যাগ করা হল।

সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনই গোলমাল শুরু হয়ে যায়। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী ঘোষকে তেইশতম অধিবেশনের সভাপতিরূপে মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেই তুমুল হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। ফলে সেদিন সভার কাজ স্থগিত রাখতে হয়। পরের দিন বাল গঙ্গাধর তিলক সভাপতি পদে রাসবিহারী ঘোষের মনোনয়নের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সভাপতির নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সভাপতি হিসাবে রাসবিহারী ঘোষ তিলকের সংশোধনী প্রস্তাবকে বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। এই সময় তিলক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা শুরু করলে প্রবল হট্টগোল ও ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করে। এইভাবে সুরাটের তেইশতম কংগ্রেস অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে যায়।

কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙ্গে যাওয়ার পর ফিরোজ শা মেহতা, ডিনশা ওয়াচা, রাসবিহারী ঘোষ, গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা নরমপন্থীদের জন্য একটি পৃথক সম্মেলন আহবান করলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভাঙন এড়াতে চেষ্টা করে যান। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে সহযোগিতার প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী তিলক রাসবিহারী ঘোষের সভাপতি প্রার্থীদের বিরোধিতা প্রত্যাহার করতে পারেন একটি মাত্র শর্তে। শর্তটি হল ১৯০৭-এর কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯০৬-এর প্রস্তাবগুলি হুবহু অনুমোদন করতে হবে। অনেক বাদানুবাদের পর তিলক ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

সুরাট কংগ্রেসের প্রাঙ্গনে নরমপন্থীরা সম্মেলন আহবান করলেন। এই নরম-পন্থী সম্মেলনে ৯০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। প্রথম প্রস্তাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসিত সরকার অর্জনের লক্ষ্যকে রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে কঠোর ভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি সুশৃংখলভাবে অনুষ্ঠিত করা এবং নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করার কথা বলা হয়। অপরদিকে অরবিন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে ৩০০ জন চরমপন্থী প্রতিনিধি স্বতন্ত্র একটি সভায় মিলিত হন। এই সভা ১৯০৬-এর স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবগুলিকে পুনরায় অনুমোদন করে। ১৯০৭ এর তেইশতম কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতভেদ প্রকাশ্য ভাঙনে পরিণতি

লাভ করে। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৮-এ এলাহাবাদ শহরে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের জন্য সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানে সুরাটে অনুষ্ঠিত নরমপন্থীদের স্বতন্ত্র অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল। প্রত্যেক সদস্যকে কংগ্রেসের ঘোষিত লক্ষ্যগুলির প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের শপথ নিতে বলা হল। এই ভাবে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে কংগ্রেস সংগঠনকে নিজেদের কুক্ষিগত করলেন।

সুরাট কংগ্রেসের পর নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অগ্রণী হলেন। চরমপন্থীদের বিতাড়নের মূলে নরমপন্থীদের উপর মর্লি-মিণ্টোর প্রভাব যে ছিল না সেকথা বলা যায় না। মর্লিকে লেখা মিণ্টোর এক পত্রে জানা যায় যে ১৯০৬ এর পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন প্রভাবশালী নরমপন্থীনেতা এবং নেতৃস্থানীয় মুসলমান মিণ্টোর কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পালের সংগ্রামমুখীতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিণ্টোকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সুচতুর ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতে 'দমন পীড়ন নীতি' গ্রহণের পাশাপাশি 'সুযোগ সুবিধা দানের' নীতি গ্রহণ করেছিল। তাই দেখা যায় ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞের পর ব্রিটিশ শাসকবর্গ প্রবল দমন পীড়নের চণ্ডনীতি গ্রহণ করে। ১৯০৭-এ 'রাজদ্রোহাত্মক সভাসমিতি আইন' পাশ করনো হল। ১৯১০-এ পাশ হ'ল এক নূতন ও মারাত্মক প্রেস আইন। চরমপন্থী নেতাদের বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য ১৮১৮-এর কুখ্যাত আইনের আশ্রয় নেওয়া হল। ১৯০৮-এর ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হল। এই আইনে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য জুরীর সাহায্য ব্যতিরেকে হাইকোর্টে বিচারের ব্যবস্থা করা হল। শুধু তাই নয়, এই কুখ্যাত আইন সমিতি-সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দিল। এই ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ব্রিটিশ সরকার ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি', বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' এবং 'সাধনা সমিতি'কে অবৈধ ঘোষণা করল। এই সঙ্গে বহুশত রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হল। বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হল।

এবারেও দমন-পীড়নের চণ্ডনীতির পরেই নরমপন্থীদের খুশী করার জন্য কিছু শাসন সংস্কার ক'রে রাজনৈতিক সুবিধা দান করা হল। ১৮৯২-এর ভারতীয় কাউন্সিল আইনে প্রবর্তিত নির্বাচন-পদ্ধতি সামান্য সম্প্রসারিত করে ১৯০৯-এ মর্লি

মিণ্টো শাসন সংস্কারের সুবিধা দেওয়া হল। এই শাসন সংস্কারে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কিছু সংখ্যক এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের বেশী সংখ্যক প্রতিনিধিকে অগণতান্ত্রিক পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল। মনে রাখতে হবে ১৯০৯-এর শাসন সংস্কারের আওতায় আইন পরিষদগুলি পরামর্শদানের সংস্থায় পরিণত হল। কারণ আইন পরিষদগুলির কোনো রকম কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের আশা ১৯০৯-এর শাসন সংস্কার পূর্ণ করতে পারে নি। গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবুও নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা হারান নি। ১৯১০-এ ভারতে নূতন বড়লাট এলেন এবং তারপর ১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রদ করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

৬. গান্ধীপূর্ব জাতীয় আন্দোলন ও নেতৃত্ব : নরমপন্থী ও চরমপন্থী

ক. নরমপন্থী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী ধারা দু'টি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অন্যতম প্রধান দু'টি রাজনৈতিক ধারা হিসাবে বিদ্যমান ছিল। জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম একটি রাজনৈতিক ধারা। জাতীয় বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

নরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির উদ্বোধক ছিলেন রামমোহন রায়। কালক্রমে রামমোহনের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ভারতীয় নরমপন্থী শিবিরকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী। ব্রিটিশ শাসনে গড়ে ওঠা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ভারতে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ উচ্চবিত্ত ও ধনী সমাজের প্রতিভূরূপে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও জাতীয় আন্দোলনকে সমৃদ্ধশালী করেন।

১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থীদের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। ১৯০৬-এ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সংগঠিত প্রয়াসের ফলে জাতীয় আন্দোলনে সংগ্রামমুখী কর্মপদ্ধতির সূচনা হয়েছিল। চরমপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে নরমপন্থী

নেতৃবৃন্দ অতিশয় ভীত হয়েছিলেন। ১৯০৭-এ সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়লে চরমপন্থীরা সাময়িকভাবে পিছু হটেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে ১৯০৭ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত নরমপন্থীদের প্রাধান্য বজায় ছিল। ১৯১৬-এ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পুনরায় কংগ্রেসের মধ্যে পুনর্মিলিত হন। এই সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থীদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি', 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি', 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন', 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এবং পুণার 'সার্বজনীক সভা' প্রভৃতি ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়। নরমপন্থী চিন্তাধাবা ও কর্মপদ্ধতি এইসব রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর নরমপন্থীরা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। দাদাভাই নৌরোজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, ফিরোজশাহ মেহতা, দিনশা ওয়াচা, রাসবিহারী ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখরা নরমপন্থী নেতারূপে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ না করলেও ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিকে তাঁরা আধুনিক করার পক্ষপাতী ছিলেন। নরমপন্থীরা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংগে যুক্ত জাত-পাত ব্যবস্থাকে কখনও সমর্থন করেন নি। তাঁরা হিন্দু সমাজকে কখনই আদর্শ সমাজ বলে মনে করতেন না এবং হিন্দু সমাজকে রামরাজ্যে পরিণত করার কোন প্রস্তাবকে তাঁরা আমল দেন নি। তাঁরা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনকে আদর্শ বলে মনে করতেন। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ তাঁরা দাবি করেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল ১৯১২ সালে অসবর্ণ বিবাহ বিল সমর্থন করেছিলেন। তিনি তথাকথিত নিম্ন জাত-পাতের মানুষদের সমমর্যাদা দানে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৯৭-তে দক্ষিণ ভারতের নরমপন্থী নেতা শঙ্করণ নায়ার ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সুফলগুলিকে গ্রহণ করার আবেদন করেছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে চেয়েছিলেন।

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতের জন্য আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পোন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আবেগ ও উচ্ছ্বাস ত্যাগ ক'রে মূলধন, বাণিজ্যিক সংগঠন এবং কারিগরি জ্ঞানের সম্প্রসারণে ভারতীয় শিল্প ব্যবস্থার বনিয়াদ মজবুত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন-পর্বে নরমপন্থী নেতারা জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগে পশ্চিমী মানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মত বিশ্বে পণ্য দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ করাই ভারতের লক্ষ্য। নরমপন্থী নেতারা স্বদেশী আবেদনের মধ্য দিয়ে শ্রমিককে অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহিত করেছিলেন। দাদাভাই নৌরোজী ভারতের শিল্পপণ্য ও বাণিজ্যকে বিশ্ব বাজারে সম্প্রসারিত করার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেন।

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসকের জাতি বৈষম্যের নীতিকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা জাতি বৈষম্যের পরিবর্তে জাতিসমূহের ঐক্য চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবি উত্থাপিত করে ব্রিটিশ জনমত ও পার্লামেন্টকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ, উচ্চ প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের অধিকতর নিয়োগ, আইন পরিষদগুলির সম্প্রসারণ ক'রে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শুল্ক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন ক'রে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিসাধন ইত্যাদি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলি জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা উচ্চ প্রশাসনিক পদগুলির ভারতীয়করণ চেয়েছিলেন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ দাবি করেছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্র স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করলে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল 'ইণ্ডিয়ান অফিসিয়ালস সিক্রেটস এ্যাক্ট' (১৮৯৯) এবং সংবাদপত্র স্বাধীনতা হরণকারী প্রেস বিলের (১৯১০) বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে-ছিলেন। তিনি 'সিডিসাস্ মিটিংস বিলের' বিরোধিতা করেন। জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে নরমপন্থী নেতারা আইনের শাসনকে সম্প্রসারিত করতে

চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করা এবং আটক আইনগুলিকে বাতিল করার দাবি ধ্বনিত করে তাঁরা ভারতে আইনের শাসন প্রবর্তন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দাদাভাই নৌরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গোপলকৃষ্ণ গোখেল এবং রমেশচন্দ্র দত্ত পশ্চিমী দেশগুলির মত ভারতের জন্য আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাবি করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করলে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাগুলি পরিস্ফুট হয়। তাঁরা ভারতে ব্যাপক শিল্পায়ণ চেয়েছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রর সক্রিয় ভূমিকা দাবি করেছিলেন। কর ও শুল্কের সহায়তায় ভারতীয় শিল্পগুলি যাতে বিকাশলাভ করতে পারে সেরকম অনুকূল নীতি গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ঠভাবে তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রকাশ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন লাভ করাকেই তাঁরা চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তাঁরা বিবর্তনবাদী (evolutionary) এবং উদারনৈতিক (liberal) রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। দীর্ঘদিন আইন পরিষদ, সরকারি প্রশাসন, জেলা বোর্ড ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিতে শিক্ষানবিশী করেই রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব এই রকম ধারণা তাঁরা পোষণ করতেন। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের রাষ্ট্রদর্শন ছিল 'প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা এবং প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার' নীতি অনুসরণ করা।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। এই যুগে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নিয়মতান্ত্রিক ও সংগ্রামমুখী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির সুস্পণ্ট প্রভেদ দেখা যায়। নরমপন্থীরা নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে পদক্ষেপে রাজনৈতিক অগ্রগতি চেয়েছিলেন। তাঁরা বয়কটকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়াররূপে দেখেন নি। তাঁরা দেশীয় শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের অন্যতম শর্তরূপে বয়কট ও বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জনের আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা ছিলেন উদীয়মান শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি।

খ. নরমপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মূল্যায়ন

গান্ধী-পূর্ব ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উদারনৈতিক মতবাদ পশ্চিমী উদারনীতিবাদ থেকে কোন কোন অংশে পৃথক ছিল। পশ্চিমী উদারনীতিবাদ অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্পপুঁজি পরিচালিত অবাধ বাণিজ্যের (free trade) সমর্থক ছিল। কিন্তু ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দেয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমী অবাধ বাণিজ্য তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান ক'রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকার করেছিল। পশ্চিমী উদারনীতিবাদের প্রবক্তাদের সঙ্গে ভারতীয় নরমপন্থী উদারনীতিবাদের সমর্থকদের এই অসামঞ্জস্যের মূলে আছে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। এখানে ইউরোপের মত স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বলিষ্ঠ পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে নি। সেজন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে ঔপনিবেশিক ভারতে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন।

ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রাধান্য মুক্ত ভারতীয় শিল্পের বিকাশ চেয়েছিলেন। শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত হিসাবে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা তাঁরা দাবি করেন। সেজন্য দেখা যায় উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ আদর্শের পরিবর্তে কঠোর অর্থনৈতিক বাস্তববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার কেউ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থ-নৈতিক সমবণ্টনের কথা বললেও তাঁরা কিন্তু কোন মতেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমর্থক ছিলেন না। কারণ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের ধ্বণিত অর্থনৈতিক দাবিগুলি ভারতে নতুন বিকাশমান উচ্চবিত্ত ও পুঁজিপতির স্বার্থ সম্যকরূপ প্রতিফলিত করেছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সরকারি উচ্চপদে নিয়োগের আকাংখাকে ব্যক্ত করে-ছিল। তাঁরা বিচার বিভাগের সংস্কার দাবি করেন। তাঁদের এই দাবি বিকাশমান উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের আকাংখা ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থীদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে তাঁরা ভারতের সর্বাঙ্গীন আধুনিকীকরণ চেয়ে-ছিলেন। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যকে তাঁরা প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও কর্ম-পদ্ধতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রজনীপাম দত্ত বলেছেন ঃ 'প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতারা

কখনও প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাবিরোধী বিদেশী শাসকদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন না। বরং এর উল্টো কথাই সত্য। তাঁরা ছিলেন ঐ সময়ের ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তির প্রতিনিধি। ... ভারতের অন্ধতা ও অনুন্নত অবস্থার অবসানের উদ্দেশ্যে তাঁরা সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও আধুনিক ভাবধারা প্রচলনের ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ... ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই প্রগতিশীল ভূমিকার তাৎপর্য ভারতীয়দের অপেক্ষাও বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছিল।'

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দ্রুত প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ভূমিকা নিঃশেষিত হ'য়ে যায়।

গ. চরমপন্থী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি

জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে বিপরীতমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির প্রবল ঝোঁক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং কংগ্রেসের বাইরে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি জাতীয় আন্দোলনে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অনমনীয় নীতির বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে চরমপন্থীরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিশ্রুতি ও কাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান চরমপন্থীদের প্রবলভাবে বিচলিত করেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন ঘটনাবলীর বিকাশ চরমপন্থী চিন্তাধারা গড়ে ওঠায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। চরমপন্থী রাষ্ট্রদর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের পশ্চিম ইউরোপমুখী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রাচ্যমুখী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। নরমপন্থী প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও আধুনিক সমাজ এবং পশ্চিমী উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে চরমপন্থী নেতারা সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের আদর্শে ব্যাখ্যা করায় প্রয়াসী হন। নরমপন্থীদের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের প্রবল প্রাচ্যাভিমান গভীরভাবে অনুধাবনের বিষয়। সেজন্য চরমপন্থী নেতাদের চিন্তাধারায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় আন্দোলনকে তাঁরা ভারতীয়

গৌরববোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

বৈদিকযুগের সমাজ এবং সংস্কৃতি ও অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ বীর ও বীরাঙ্গনারা চরমপন্থী নেতাদের রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস ছিলেন। চরমপন্থী চিন্তাধারার প্রভাবে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাংলায় জঙ্গী জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করেছিল। মহারাষ্ট্রের সংগ্রামপন্থী জাতীয় চেতনার জনক ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। নরমপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্রে গণ-আন্দোলনমুখী রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তিলক রাজনৈতিক আন্দোলনকে গজদন্তমিনার থেকে মাটিতে নামিয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেস মণ্ডপ এবং আইন পরিষদ থেকে ভারতের রাজনীতিকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি সাধারণ মানুষের যোগদানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে এ ধারণা তিলক সর্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন। মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং অধিকারের উপর তিলকের অগাধ আস্থা ছিল। শিবাজী-উৎসব এবং গণপতি-উৎসব প্রবর্তন করে তিলক রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের যোগদানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। যদিও এই সব উৎসগুলির লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করা।

ব্রিটিশ শাসক স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে সর্বভারতীয় চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করে এবং বিচারের প্রহসনের পর তাঁকে ১৯০৮-এ ছ' বছরের জন্য মান্দালয়ে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করে। তিলকের গ্রেপ্তারের সংবাদে বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক ধর্মঘট পালন করে। ছ' বছর দ্বীপান্তরে থাকার পর তিলক ভারতের রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বা হোমরুল আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। তিলক ছিলেন হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। দশ বছর পর তিলকের উদ্যোগে চরমপন্থী নেতারা পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসে সমবেত হন। তার ফলে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯১৮-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে 'লিবারেল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া' গঠন করেন। ১৯২০-তে তিলকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জাতীয় আন্দোলনের নেতারূপে গান্ধীজীর উদ্ভব ঘটে।

পাঞ্জাবকে চরমপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির অন্যতম পথিকৃৎ প্রদেশ বলা যায়।

লাজপত রায়ের নামের সঙ্গে পাঞ্জাবের চরমপন্থী আন্দোলন যুক্ত হয়ে আছে। ১৯০১ থেকে লাজপত রায় নরমপন্থী প্রভাবিত কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। এই সময় তিনি কংগ্রেস আন্দোলনকে ইংরেজী শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ভারতীয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে এই উৎসব নেতাদের আত্মগরিমা প্রচার ও বাগাড়ম্বর প্রকাশের মঞ্চ মাত্র। তিনি সঙ্গতিসম্পন্ন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বেশভূষা ও কংগ্রেস মণ্ডপের সুনিপুণ সাজসজ্জার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে প্রতিনিধিদের ধারালো ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্যকে প্রকাশ করার পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সমৃদ্ধিকেই যেন জাহির করে। অরবিন্দ ঘোষের 'ইন্দু প্রকাশ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধমালার পরই ১৯০১-এ লাজপত রায়ের ইংরাজী 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকায় নরমপন্থী পরিচালিত কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে লাজপত রায় সক্রিয় ভাবে সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯০৪-এ কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তিনি ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য ইংলণ্ডে যান। ১৯০৫-এর কংগ্রেসে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ওয়েল্‌সের যুবরাজের প্রস্তাবিত ভারত সফরের সময় কোনরকম সৌজন্য প্রদর্শনের তীব্র বিরোধিতা করেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতারা ১৯০৫-থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত নিজেদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি বলিষ্ঠভাবে প্রচার করেছিলেন। লাজপত রায় ছিলেন চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯০৭-এর মে মাসে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে ব্রহ্মদেশে অন্তরীণ রাখে। তিনি ১৯২০-তে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন। সভাপতির ভাষণে তিনি শ্রমিক সংগঠনকে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিরোধিতা করার পরামর্শ দেন। তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্য পুনরায় তিনি ১৯২০-তে গ্রেপ্তার হন। সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেবার সময় পুলিশের নির্মম লাঠি চালনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত স্বাস্থ্য-হানির ফলে ১৯২৮-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রচার করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এঁরা প্রত্যেকেই বৈদিক যুগ, প্রাচীন ভারতের দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও সমাজ বিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বাংলার

চরমপন্থী চিন্তাধারায় গভীর ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এবং বিশেষ করে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস চরমপন্থী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। 'আনন্দমঠের' 'বন্দে মাতরম' কবিতাটি বাংলাদেশের সংগ্রাম-মুখী গণ-আন্দোলনকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ও দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি জনসাধারণের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক আবেগের সৃষ্টি করেছিল। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্কিম-চন্দ্রের 'মাতৃ মতবাদ' (Mother Cult) প্রচার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও 'মাতৃ-মতবাদ' হিন্দুদের মধ্যে অধিকতর ভাবে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়েছিল।

সংগ্রামমুখী চরমপন্থী চিন্তাধারায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ নির্ভিকতার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন। ভারতবাসী হিসাবে গর্ববোধ এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজের ভাই বলে মনে করার জন্য তিনি সবাইকে আহবান জানিয়েছিলেন। ভারতের মাটিকে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় এবং ভারতের মঙ্গলকে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক বলে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। শিক্ষিত মানুষের নকল সাহেবীয়ানাকে তিনি তীব্র ভাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন। ভারতবাসীকে সদাজাগ্রত থাকতে তিনি আহবান জানিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বাংলাদেশের সংগ্রাম-মুখী নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় বিপ্লবীদের গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল!

চরমপন্থী নেতাদের চিন্তাধারা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক বয়কটকে তারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁরা অর্থনৈতিক বয়কটকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও সংঘাত-সংঘর্ষের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বয়কটকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। নরম-পন্থীদের মত তাঁরা সাময়িক জয়ের জন্য বয়কট আন্দোলনকে ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গ রদ হলেই বয়কট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে এমত তাঁরা পোষণ করতেন না। বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কটের পাশাপাশি তাঁরা শিল্প শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী এবং সওদাগরী কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করছেন এবং বয়কট আন্দোলনে যাঁরা সামিল হচ্ছেন না তাঁদের সামাজিকভাবে একঘরে করার আহবান জানিয়েছিলেন।

জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ শাসকদের জাতীয় অপমানসূচক হুকুমনামা ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে ছাত্র আন্দোলন ধূমায়িত হয়েছিল। ছাত্রদের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হল এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাকে বিদেশী শাসক অপরাধ বলে ঘোষণা করল। বাংলার ছাত্র-যুব সমাজ ব্রিটিশ শাসকের জাতীয় অপমানসূচক নির্দেশনামাকে মানতে পারে নি। নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। চরমপন্থীদের প্রভাবে ১৯০৬-এর কংগ্রেসে 'জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষার' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন করার আহবান জানিয়েছিলেন। সে আহবানে অসংখ্য ছাত্র সাড়া দিয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কার্জনী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদীঘির গোলামখানা' বলে বর্ণনা করেছিলেন। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) গঠিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সংগ্রামবিমুখ পরিচালন ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীকেও অনুমোদন করেন নি।

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ ছিল। দাদাভাই নৌরোজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রমুখ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন। ১৯০৬-এর কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির ভাষণে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বরাজ দাবি করেছিলেন। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে ঐক্যমত ছিল না। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রায় স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের

চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেন নি। যদিও বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, 'স্বরাজ লাভ করা ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার'। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের নিয়ন্ত্রণ-বিহীন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক দাবি তাঁরা স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে উত্থাপিত করেছিলেন। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে বাংলার জাতীয় বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ধ্বনিত করেছিল।

ঘ. চরমপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মূল্যায়ন

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ঐক্যবদ্ধতা দেখা যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে স্বরাজ বা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বাংলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী-গত পার্থক্য ছিল। ঠিক তেমনি বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কর্মসূচী প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। বিপিন-চন্দ্র পাল চেয়েছিলেন শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন। অপর দিকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সমস্ত বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লাজপত রায় সর্বপ্রকার অত্যাবশ্যকীয় ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন দাবি করেছিলেন।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছিলেন। তাঁরা নরমপন্থী আবেদন-নিবেদন এবং বক্তৃতাসর্বস্ব কর্মপদ্ধতির পরিবর্তে আন্দোলনমুখী রাজনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামে তাঁরা সাধারণ মানুষকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের প্রধান কৃতিত্ব হল যে তাঁরা ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থের মধ্যে যে মূল বরোধ থেকে গেছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সেজন্য ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে অনাবশ্যক শাসন সংস্কারের আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে তাঁরা সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক উৎসাহ সৃষ্টি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ধনী ও উচ্চবিত্তের একচেটিয়া

রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটানোই তাঁদের আশু লক্ষ্য ছিল। সেজন্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই সময় থেকে ভারতের জনসাধারণ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। তার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণ-সমাবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় আবেদনের সাহায্যে গণ-জাগরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সেজন্য ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁরা আর এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলেন। ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি হিন্দুদের মধ্যে গণ-জাগরণের উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। ভারতের মত বহু ধর্মাবলম্বী দেশে হিন্দু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আবেদনে সমস্ত মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায় না। দেখা গেল, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক সুকৌশলে 'Divide and Rule' নীতি প্রয়োগ করে শাসন সংস্কারের নামে পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। তার ফলে ভারতের এক ধর্মগোষ্ঠীর মানুষকে অপর ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকভাবে উত্তেজিত করা সহজ হয়ে পড়ল। হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক আবেদনের যুগে মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬)। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি উদারনৈতিক নরমপন্থী প্রচারিত যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বনিয়াদকে যথেষ্ট দুর্বল করেছিল।

চরমপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে সীমাবদ্ধতা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু চরম-পন্থী নেতৃবৃন্দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল বিশ শতকের প্রথম দশকে আপোষহীন ও সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির প্রবর্তন। তাঁরা পরবর্তীকালের ভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে চরমপন্থীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের কর্মসূচী চরমপন্থী কর্মসূচীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

১৯০৮-এ বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, আমাদের নীতিগুলি প্রকাশ করার জন্য দুটি নতুন শব্দ রাজনৈতিক অভিধানে সংযোজিত হয়েছে। তা হল নরমপন্থী ও চরমপন্থী। শব্দ দুটির একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বের রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিফলিত করে। তিলক বলেছিলেন, 'আজকের চরমপন্থীরা আগামী দিনে নরমপন্থী হতে পারেন, যেমন আজকের নরমপন্থীরা বিগত দিনে চরমপন্থী ছিলেন।' অর্থাৎ, তিলক বলতে চান যে চিরকালের জন্য কেউ নরমপন্থী বা চরমপন্থী থাকেন না। তিলক নিজে শেষ পর্যন্ত চরমপন্থী ছিলেন। তিনি

হোমরুল আন্দোলন গড়ে তুলে চরমপন্থী ঐতিহ্য বহন করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে চরমপন্থী বলা যায় না। কারণ তিনিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করার পর নরমপন্থী-চরমপন্থী বিচারের উর্ধে উঠে যান।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের কথা বলে-ছিলেন। যদিও তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশ জোড়া ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। সেজন্য দেখা যায় চরমপন্থীদের আবেদনে গরীব ছাত্র, কর্মহীন শিক্ষিত যুবক ও স্বল্প বেতনের বুদ্ধিজীবীরা অধিক পরিমাণে সাড়া দিয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে যে সব শিক্ষিত যুবক ও মধ্যবিত্তের অগ্রগতির পথ সাম্রাজ্যবাদী নীতি রুদ্ধ হয়েছিল তাঁরাই চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের আবেদনে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার ফলে গণ-আন্দোলনের সূচনা হয় এই সময়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন
গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব

১. প্রথম মহাযুদ্ধ : পটভূমি ও তাৎপর্য

প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ শতকের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অতীতের সকল প্রকার যুদ্ধের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রকৃতিগত ও গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে বিশ্বের অগ্রণী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রাধান্যের ফলে বিশ্বের ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বল্গাহীন অর্থনৈতিক শোষণ চলেছিল। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ফলে বিশ্বের উপনিবেশগুলিকে শোষণের জন্য নতুন করে পুনর্দখলের প্রশ্ন উঠেছিল। একচেটিয়া পুঁজিশাসিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাতের ফলে বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে দখল করার প্রয়োজন থেকে বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব বিশ শতকের প্রথম দু'দশকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনুন্নত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বাজার দখল ক'রে শোষণ অব্যাহত রাখার তীব্র প্রতিযোগিতা সারা বিশ্বে যে রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী যুদ্ধের সৃষ্টি করেছিল ইতিহাসে তার নাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত সময়কালকে ধনতান্ত্রিক প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের কাল বলা হয়। এই সময় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমভাবে বিকশিত হয় নি। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের সুযোগে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের উন্নত পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হয়। ফলে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে অসম বিকশিত পুঁজিবাদের স্বার্থসংঘাত সৃষ্টি হয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থসংঘাত নিরসনের জন্য পুঁজিবাদী দুনিয়ায় পরস্পর বিরোধী শক্তিসমূহের বিন্যাস ঘটে। ফলস্বরূপ বিশ্বকে জবর-দখলের প্রেরণায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়

এবং তার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতএব ১৮৭১ সালে যে এক-চেটিয়া পুঁজির প্রাধান্য বিস্তার শুরু হল কালক্রমে ১৯১৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধে তার ভয়ংকর রূপ দেখা গেল।

একচেটিয়া পুঁজির বৈশিষ্ট্য হল শিল্প পুঁজির সঙ্গে ব্যাংক ও ফিনান্স পুঁজির মিতালি। ফলে অতিকায় এবং সর্বশক্তিমান আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট এবং কার্টেল সারা বিশ্বে পুঁজি রপ্তানী করল এবং বিশ্ব বাজার করায়ত্ত করল। এইভাবে আন্তর্জাতিক ট্রাস্টগুলি ফিনান্স পুঁজির সাহায্যে বিশ্বকে পুনর্দখলে লুব্ধ হয়েছিল। কারণ একচেটিয়া ফিনান্স পুঁজির স্বার্থে বিশ্বকে নিজেদের সুবিধামত দখল না করলে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি টিঁকে থাকতে পারে না। সেজন্যই ১৯১৪-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল। এই বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগারিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি জড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের বাইরে তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়েছিল।

১৯১৪ সালের আগস্টের মাঝামাঝি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জল, স্থল এবং আকাশপথে নজিরবিহীনভাবে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিল। যুদ্ধ সম্ভার, ভয়ংকর মারণাস্ত্র ব্যবহার, জল-স্থল-নৌ বিভাগের বিশাল সৈন্য সমাবেশ এবং ভয়াবহ বিধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর নিরিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের সর্বপ্রকার যুদ্ধকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভারতের সম্মতি না নিয়ে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতের অর্থসম্পদ ও মানবসম্পদ ব্রিটিশ শাসকেরা এই যুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। ফ্রান্স থেকে চীন পর্যন্ত সুদূরে প্রসারী সমরাঙ্গনে দশলক্ষেরও বেশি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে নিয়োগ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের স্বার্থে বহু সহস্র যুদ্ধরত ভারতীয় সৈনিক আহত হয়েছিলেন এবং প্রাণ দিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের মোট ব্যয় হয়েছিল প্রায় তেরো কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের খরচ মেটাতে ভারতের জাতীয় ঋণ প্রায় তিরিশ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতের সাধারণ মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী ঋণের বোঝা বহন করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসক-বর্গ কোনো স্তরেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করে নি।

১৯১৪-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেবার পর ১৯১৭-এ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেট ইংলণ্ডের হাউস অফ কমনস-এ ঘোষণা করলেন যে 'ভারতে দ্রুত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য।' যুদ্ধকালীন তিনবছরেই

ভারতীয় অর্থসম্পদ ও মানব-সম্পদের অপূরণীয় ক্ষরক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় নরমপন্থী এবং চরমপন্থী নেতারা প্রথম মহাযুদ্ধের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যুদ্ধ শেষে বৃটেন ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করবে। যুদ্ধের শুরুতে ভারতীয়রা ব্রিটেনের মিত্রপক্ষকে যেভাবে সমর্থন করেছিলেন কয়েক বছর পর তাঁদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন স্বেচ্ছায় ভারতকে সাম্রাজ্যের অধীনে স্বয়ত্তশাসনের অধিকার দান করবে এ সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয়।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এই ধারণা তখন সুস্পষ্ট হয় নি। ভারতের মতো পরাধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা কখনই উপকৃত হতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ হল বলপূর্বক বিশ্বের বাজার দখল করা। বিশ শতকের দুই দশকে স্বেচ্ছায় কোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তার ঔপনিবেশিক অধিকারকে পরিত্যাগ করতে পারে না। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে নির্মমভাবে অর্থনৈতিক শোষন এবং রাজনৈতিক শাসন চালিয়েই বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

২. ভারতে যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ক. অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি

ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথম মহাযুদ্ধ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল বৈদেশিক বাণিজ্য। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের লক্ষনীয় অবনতি ঘটেছিল। তার ফলে, ভারতে অত্যন্ত সীমিত আভ্যন্তরীন বাজার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যুদ্ধ সামগ্রী মজুত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে বাধ্য হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথম মহাযুদ্ধ আরও একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একদিকে শিল্পজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অপরদিকে কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ার জন্য শিল্পোৎপাদনে কাঁচামালের মূল্যহ্রাস। এই সময়ে সাময়িক ভাবে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানি লক্ষ্যণীয় ভাবে কমেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার পর ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের এক ভয়াবহ আকৃতি দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। ভারতের পাট শিল্প যুদ্ধের প্রয়োজনে অবিরাম উৎপাদন করেছিল। ঠিক তেমনই তুলা ও পশম শিল্পগুলি সামরিক বাহিনীর পোষাক সরবরাহে নিযুক্ত ছিল। ভারতের কাঁচামাল বিশ্ব বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটেনে রপ্তানি করা হয়েছিল।

যুদ্ধের খরচ মেটাতে ভারতীয়দের উপর অসহনীয় করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের হার প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। কাগজ ছাপিয়ে মুদ্রা সরবরাহের জন্য মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে ফাটকাবাজি ও মজুতদারি বৃদ্ধির সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০০ ভাগের বেশি বেড়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার উপর যেমন আঘাত এসেছিল ঠিক তেমনি ভারতের শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়েছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন স্তিমিত হবার পর ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের সীমিত অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি যুক্ত হওয়ার ফলে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের পুঁজিবাদী অথনীতিতে এই সংকট সাময়িকভাবে উপশমিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় পুঁজির শিল্পোদ্যোগের সামনে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির তীব্র প্রতিযোগিতাকে সাময়িক ভাবে হ্রাস করেছিল। ভারতে শিল্পজাত পণ্য দ্রব্যের বাজার উন্মুক্ত হল। যুদ্ধসামগ্রী ও সরঞ্জাম সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন করে ভারতীয় শিল্পপতিরা তাদের পণ্যোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়েছিল। অবশ্য ভারতীয় পুঁজিবাদী উদ্যোগের সামনে ব্রিটিশের সৃষ্টি করা অনেক অর্থনৈতিক বাধা বিপত্তি এসে পড়েছিল। যেমন জাহাজ পরিবহন এবং রেলপথ পরিবহনের অভাব, শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব এবং সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার স্বল্পতা ভারতে শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছিল।

তৎসত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের শক্ত বনিয়াদ তৈরীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। সেজন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৬-এ ভারতে শিল্পায়নের সমস্যা ও সুযোগগুলি সামগ্রিক ভাবে বিচার করার জন্য 'ইণ্ডিয়ান

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন' গঠন করে। এই কমিশনের অন্যতম বিচার্য বিষয় ছিল কেমনভাবে ভারতীয় উদ্যোগে শিল্পক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করা যায়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে ভারতের তুলাজাত শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই সময় ভারতের রসায়ন শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। তা সত্ত্বেও ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বজায় থাকার জন্য দেশীয় পুঁজির উদ্যোগে শিল্প ব্যবস্থা আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারে নি। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের মূল শর্ত হল শিল্প মুনাফা পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ করা। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কল্যাণে ভারতীয় শিল্পপতির সামনে মুনাফার পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগের সুযোগ ছিল না। কারণ শিল্পনীতি নির্ণয়ে ভারতীয় শিল্পপতিদের কোন হাত ছিল না। সামগ্রিকভাবে শিল্পনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে রচিত হত। সেজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ ভারতীয় শিল্পপতিরা তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারে নি।

পাট, তুলা, তৈলবীজ ও অন্যান্য কৃষি পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ায় ভারতীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যাহত হয়েছিল। ভূস্বামী এবং বণিকেরা এই সময়ে কৃষকদের আরো নিবিড়ভাবে শোষণ করেছিল। সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায় ১৯১১ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে ভারতীয় কৃষকের ঋণের পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার মিলিয়ন মুদ্রায় দাঁড়িয়েছিল। ফলে দলে দলে মাঝারি ও গরীব কৃষকেরা তাদের চাষের জমি বন্ধকী দিয়েছিল বা বিক্রি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় ভারতের হস্ত ও ক্ষুদ্র শিল্পীদের উৎপাদন যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। ফলে তাদের আয় নিম্নগামী হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবে ভারতে ব্যপক মহামারী দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বহু লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

খ. রাজনৈতিক পরিস্থিতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ ভারতীয়ের সহযোগিতা পাবার জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হল গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ। সেজন্য তাঁরা বিশ্বে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের একটি বড় অংশ মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দের আশ্বাসবাণীতে

আস্থা স্থাপন করেছিলেন। যুদ্ধশেষে দেখা গেল মিত্র শক্তির নেতৃবৃন্দের আশ্বাস-বাণী এবং তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। বিশ্বের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অবসানের জন্য মিত্রশক্তি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করল না।

যুদ্ধশেষে রাষ্ট্রপতি উইলসন ঘোষিত চোদ্দ দফা প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য দেখানো হল। অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রস্তাব চোদ্দ দফায় স্থান পেল না। মিত্রশক্তি সম্পাদিত শান্তিচুক্তির শর্তগুলিকে ভারতীয়রা ভালো চোখে দেখেন নি। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের পরিবর্তে মিত্রশক্তি বিজিত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিল। ফলে দেখা গেল মধ্য ইউরোপের দেশগুলি স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত হল। মিত্রশক্তির যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতিকে ধুলায় লুটিয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তার ফলে ভারতের মুসলমান সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁরা তুরস্কের খলিফাকে ধর্মগুরু বলে মনে করতেন। তুরস্ক সাম্রাজ্য ও খলিফার অবসান ঘটানোর বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমান সমাজ ব্রিটিশ-বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীজীর যোগদান ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। ভারতীয় মুসলমানেরা মনে করেছিলেন তাঁদের ধর্মগুরু খলিফার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীর স্বাধীনচেতা মুসলমানের স্বার্থ ও অধিকারকে ক্ষুন্ন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা এল আয়ারল্যান্ড থেকে। আয়ারল্যান্ডের নেতা মাইকেল কলিন্সের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতীয়রা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করেন। ব্রিটিশের অমানুবিক দমন নীতি সাময়িক ভাবে আয়ারল্যান্ডের মুক্তিসংগ্রামকে দুর্বল করেছিল। ভারতীয়দের ব্রিটিশের দমননীতির স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্য আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁরা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিশরের জাতীয়তাবাদী দল ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম করেছিল। ১৯২০-তে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এই সময় তুরস্কের কামাল পাশার নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। দূর প্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনে জাপানী পণ্যদ্রব্যের বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল জারশাসিত রাশিয়ায় সমাজ-

তান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং বিশ্বে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্মলাভ। পুঁজিবাদ ও আধা-সামন্ত সমাজের অবসান ঘটিয়ে রুশ বিপ্লবীরা লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাম্রাজ্যবাদী নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন জার আমলের নিপীড়িত জাতিগুলির প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকার করল। দেখা গেল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো জোরদার হয়ে উঠল।

ভারতের হোমরুল আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৭-এর জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে অ্যানি বেসান্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন: 'রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা ভারতের পূর্বেকার অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এশিয়ার এপার থেকে ওপারে, হিমালয়ের ধারে স্বাধীন ও স্বশাসিত জাতিগুলি ছড়িয়ে আছে। ভারত আর তার এশীয় প্রতিবেশীদের জারের পদানত হিসাবে দেখবে না।' ১৯১৮-এ কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ভারতের জন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ঘোষিত হয়। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের উচিত 'ভারতের জনপ্রতিনিধিদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করা।'

১৯১৯-এ বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, বলশেভিকবাদের অর্থ হল 'ধনীদের ও তথাকথিত উচ্চশ্রেণীদের শোষণ ও পীড়ন ছাড়াই মুক্তিতে ও সুখে বাস করার জন্য জনগণের অধিকার।' বিপিনচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ১৯২০-তে লাজপত রায় বললেন, 'সমাজতান্ত্রিক, বলশেভিক ন্যায়নীতি পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ন্যায়নীতির চেয়ে অনেক শ্রেয়, নির্ভরযোগ্য ও মানবিক।'

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমিবণ্টনের সংবাদ ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে ভারত স্বায়ত্তশাসন অধিকারকেই একমাত্র কাম্য মনে করে না। স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে ভারতীয়ের পূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদার দাবি ধ্বনিত হল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

৩. হোমরুল আন্দোলন

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ভারতে জনজাগরণের সৃষ্টি করল। সেই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হল। ১৯১৪-এ বাল গঙ্গাধর তিলক কারামুক্ত হন। সুরাট কংগ্রেস থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে মন্থরতা দেখা দিয়েছিল তার শীঘ্রই অবসান ঘটল। পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রাম-মুখী জাতীয়তাবাদী শক্তি নেতৃত্বে অবতীর্ণ হল। ১৯১৫-এ ফিরোজশাহ মেহতা এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মত সর্বভারতীয় নরমপন্থী নেতৃদ্বয়ের মৃত্যু হয়। ফলে সর্বভারতীয় নরমপন্থী নেতৃত্ব খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয়ের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণভাবে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রতি মানুষের আস্থা খুবই কমে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রতি স্বায়ত্তশাসন দানের প্রতিশ্রুতি যুদ্ধাবসানে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রে উৎপীড়িত জাতিগুলিকে প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশ-গুলিতে উৎসাহের সঞ্চার করে। এই রকম আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে পুনরায় বাল গঙ্গাধর তিলক যোগ দেন। এই সময় শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হন।

১৯১৫-এর কংগ্রেস অধিবেশনের পর অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে ভারতে অনুরূপ আন্দোলন পরিচালনায় উদ্যোগী হন। স্বায়ত্তশাসিত সরকারের পরিবর্তে তিনি হোমরুল শব্দটিকে বেছে নেন তার কারণ তিনি মনে করেছিলেন ব্রিটিশ জনগণের কাছে এর আবেদন অনেক বেশি হবে। ভারতের জন্য হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসিত সরকার তিনি দাবি করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। ইউরোপের উৎপীড়িত জাতিগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতার জন্য ভারতীয়রা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করুক তিনি তা চেয়েছিলেন।

অ্যানি বেসান্ত মনে করেছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয়দের যোগদান এবং ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা ব্রিটিশ জনগণকে ভারতের স্বাধীনতার আকাংখার প্রতি সহানুভূতিশীল করবে। অবশ্য যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পুরস্কারের পরিবর্তে ভারতের স্বশাসিত সরকার অর্জনের অধিকারের উপর তিনি গুরুত্ব

আরোপ করেন। তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধের সময় ভারত স্বশাসন চেয়েছিল। যুদ্ধাবসানে ভারত আবার সেই দাবি করবে। কিন্তু সেটা পুরস্কার হিসাবে নয়, নিজের অধিকারের জোরেই সে দাবি করবে। এ ব্যাপারে কোন ভুলত্রুটি হবে না।' ১৯১৭-এর কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি চীনে মাঞ্চু রাজত্বের পতনের পর চীন প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্যকে স্বাগত জানান। তিনি ঘোষণা করেন ভবিষ্যতে ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর মত স্বশাসন অর্জন না করলে এখানে অসন্তোষ দেখা দেবে। তিনি যুদ্ধোত্তরকালে ভারতে স্বশাসনের দাবি ধ্বনিত করেছিলেন। সেজন্য দেখা যায় ১৯১৭-এর কংগ্রেস অধিবেশন ভারতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বশাসন অর্জনের দাবি প্রস্তাবাকারে পাশ করে।

তিলকের কারামুক্তির পর বোম্বাই-এর কংগ্রেস অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তের পরামর্শে কংগ্রেসের সদস্যপদ চরমপন্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হল। তিনি বুঝেছিলেন যে চরমপন্থীদের ফিরিয়ে না আনলে জাতীয় আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হবে না। অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সারা দক্ষিণ ভারত এবং এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে এই আন্দোলন বিস্তারলাভ করে। হোমরুল আন্দোলন নতুন কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ সৃষ্টি করতে না পারলেও জাতীয় আন্দোলনে একটি দাবি ধ্বনিত করেছিল। অ্যানি বেসান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের জন্য স্বশাসিত সরকার চেয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য সংগ্রামমুখীনতা প্রকাশ করে নি। কিন্তু স্বশাসন দাবির সমর্থনে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে ভারতীয়ের রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হোমরুল আন্দোলনের আর একজন পথিকৃৎ হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিলকের প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগের উদ্দেশ্য হল: 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হোমরুল বা স্বশাসন অর্জন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের জনমতকে শিক্ষিত ও সংগঠিত ক'রে তোলা।' তিনি হোমরুলের স্বপক্ষে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে যুদ্ধ চলাকালীন ইংলণ্ডে আয়ারল্যাণ্ডের জন্য হোমরুল আলোচনা যদি চলতে পারে তবে যুদ্ধ শেষে ভারতকে হোমরুল থেকে কেন বঞ্চিত করা হবে? তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে ভারতের জন্য স্বশাসিত সরকারের দাবি স্বীকার করে আইন প্রণয়নের কথা বলেন। কারণ 'all are demanding

Swaraj now, and the British cau no longer resist the demand.'

তিলক প্রধানতঃ পশ্চিম ভারতে হোমরুল আন্দোলন পরিচালনা করেন। হোমরুল আন্দোলনের স্বপক্ষে তিনি সারা ভারতে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। এই সময় দেশবাসী তাঁকে লোকমান্য আখ্যায় ভূষিত করে। তিলক হোমরুল দাবির সমর্থনে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করেন। ভারতের যেখানেই তিনি যান সেখানকার জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। যুদ্ধোত্তর ভারতে তিনি জনজাগরণের সৃষ্টি করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সবকার তিলক ও অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হোমরুল আন্দোলনকে দমন পীড়ন নীতির দ্বারা স্তব্ধ করায় প্রয়াসী হয়। ১৯১৬-এ তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হয়। বিচারে তিনি দোষী প্রমাণিত হলে তাঁকে বহু সহস্র অর্থ জরিমানা দিতে হয়। এই সময় অ্যানি বেসান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার উপর আর্থিক জরিমানা করা হয়। অবশ্য বোম্বাই হাইকোর্ট তিলকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খারিজ করে দেয়। ১৯১৭-এ অ্যানি বেসান্তকে ওটাকামণ্ড শহরে অন্তরীণ করা হয়। এই সময়ে তিলককেও অন্তরীণ করা হয়। হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার বহুকর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ব্রিটিশের দমন নীতি সত্ত্বেও ভারতীয়ের মনোবল অটুট থাকে। ব্রিটিশের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। জাতীয় কংগ্রেস দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

হোমরুল আন্দোলন বহ্নিশিখার মত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলন পরিচালনার সময় ধর্মীয় আবেদন করা হয়েছিল। অ্যানি বেসান্ত ছিলেন 'থিওসফি' আন্দোলনের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন বহু ক্ষেত্রে প্রার্থনা সভায় পর্যবসিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত হোমরুল আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দক্ষিণ ভাবতের মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে বহু সাধু ও সন্ন্যাসী হোমরুল আন্দোলনের দাবিকে ধর্মীয় আবেদনের সঙ্গে এক করে ফেলেন। সেজন্য দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ গ্রামে ধর্মীয় প্রার্থনার সঙ্গে স্বশাসনের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। অ্যানি বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনের দাবিকে প্রায় রাজনৈতিক মন্ত্রে পরিণত করেন। ঠিক তেমনি বাল গঙ্গাধর তিলক পশ্চিম ভারতে হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে শিবাজী উৎসবের মত ধর্মীয় উৎসবকে এক করে ফেলেন। হোমরুল আন্দোলনের ধর্মীয় চেহারাটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেনি। সেজন্য হোমরুল আন্দোলনের

যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল।

হোমরুল আন্দোলনে সাফল্যের দিকগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অ্যানি বেসান্ত এবং তিলকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হোমরুল আন্দোলন জাতীয় স্বরাজ দাবির আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। বলা যায় পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির অন্যতম পদক্ষেপ হল ভারতের জন্য স্বশাসন দাবি। তিলক হোমরুল লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের তুলনা করে বলেছেন, কংগ্রেস হল মূলত একটি বক্তৃতা করার এবং প্রস্তাব গ্রহণের মঞ্চ। অপরদিকে হোমরুল লীগ হল সারা ভারতে আন্দোলন পরিচালনার একটি মঞ্চ। যদিও প্রধানতঃ হোমরুল আন্দোলন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও বলা যায় এই আন্দোলনের প্রভাবে জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে নরমপন্থীরা দূরে সরে যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাব হ্রাস করায় হোমরুল আন্দোলনের ভূমিকা যথেষ্ট। এই সময় নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

(হোমরুল আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্য উপস্থাপিত করে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে চরমপন্থী নেতারা কংগ্রেস মঞ্চের বাইরে বিদেশী নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বায়ত্তশাসনের দাবি ধ্বনিত করেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের জয়ের ফলে জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির ফলে তিলক ও অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হোমরুল আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। যার ফলে চরমপন্থীরা পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসেন।)

হোমরুল আন্দোলনের আর একটি কৃতিত্বের দিক হল ভারতে গণজাগরণ সৃষ্টি করা। এই আন্দোলন দেখাল যে, শুধুমাত্র বক্তৃতা ও প্রস্তাব-সর্বস্ব রাজনীতি জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেজন্য নেতৃবৃন্দের ব্যাপক গণসংযোগ করা একান্ত প্রয়োজন। তিলক ও অ্যানি বেসান্ত ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ করে প্রমাণ করলেন যে গণ-সংযোগ ও গণ-জাগরণ ব্যতীত রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় না।

হোমরুল আন্দোলনের সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ১৯১৬-এ সুবিখ্যাত লখনৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে ভারতের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ঐক্যমতে আবদ্ধ হন। লখনৌ চুক্তি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সম্প্রীতি ও

সৌহার্দ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। তিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলন লখনৌ চুক্তিকে আরও ব্যাপক গণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন : স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর যোগদান ও নেতৃত্ব

১৯১৮-এর আগে গান্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দীর্ঘকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অর্থাৎ ১৯১৫-এ ভারতের রাজনৈতিক জীবনে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সুরাট কংগ্রেসের পর এবং ১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রদের পরবর্তীকালে ভারতে রাজনৈতিক উত্তেজনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়েছিল। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্ব দখলের জন্য নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের লড়াই এবং ১৯০৭-এ সুরাট অধিবেশনে চরমপন্থীদের কংগ্রেস ত্যাগ জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে দুর্বল করেছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সারা ভারতে সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় নেতারূপে পরিচিত হতে পারেন নি। এই সময় মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রচারে মুসলিম লীগ খুবই তৎপর হয়েছিল। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের রাজনীতি সম্প্রসারণে হিন্দু মহাসভার ভূমিকা লক্ষ্য করার মতো। তিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনকে সারা ভারতের গণ-আন্দোলন বলা যায় না। কারণ হোমরুল আন্দোলন প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই রকম এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় নেতার প্রধান কর্তব্য হল এমন একটি মতাদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি জাতির সামনে উপস্থিত করা যা সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হবে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্য অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করছিল কেমন ভাবে সমাজের পরস্পর বিরোধী স্বার্থগুলিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সামিল করানো যায়। গান্ধীজী বহুল পরিমাণে এই অসাধ্য কাজটি করতে পেরেছিলেন।

ভারতের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের গোঁড়া সমর্থকবৃন্দ এবং হোমরুল আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সবাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চে গান্ধীজীর আগমনকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। তার কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকালীন গান্ধীজী চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের সমর্থনে

উগ্র জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সফল হয়েছিলেন। ভারতের সমস্ত মতামতের প্রতিনিধিরা গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেছিলেন। তাঁদের কাছে মতাদর্শ বা রাষ্ট্রদর্শনের প্রশ্নটির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচীটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সোজা কথায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের শক্তিশালী নবীন বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে এমন একজনকে চেয়েছিলেন যিনি সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হতে পারেন। নরমপন্থী অথবা চরমপন্থী অথবা হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অতি উদার বা চরমপন্থী বা আঞ্চলিকতার রাজনৈতিক আবেদনের চেয়ে আরো ব্যাপক আবেদনের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং অবিসংবাদী নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা বলা হয়।

গান্ধীজীর বক্তৃতা এবং রচনাবলীতে উদারনীতিবাদের অর্থনৈতিক বক্তব্য যেমন পাওয়া যায় ঠিক তেমনি চরমপন্থীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন দেখা যায়। সেই রকম যুদ্ধোত্তর তুরস্ক ও আরাবিয়ার ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করে তিনি জাতীয় আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯১৯-২১-এ গান্ধীজীর আন্দোলনের পদ্ধতিতে হোমরুল আন্দোলনের পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের ধারাগুলিকে তিনি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। ভারতের নবীন বুর্জোয়া শ্রেণী গান্ধীজীর মধ্যে এক অসামান্য নেতাকে আবিষ্কার করেছিল। গান্ধীজীকে নরমপন্থী অথবা চরমপন্থী অথবা জাতীয় বিপ্লবী আখ্যায় ভূষিত করা যায় না।

ভারতে আগমনের তিন বছরের মধ্যেই গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। কারণ তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের প্রবর্তক। ভারতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের রহস্যটি রয়ে গেছে গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতিতে (tehniques)। এই কর্মপদ্ধতি তাঁকে অবিসংবাদী জাতীয় নেতা করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতীয় পরিস্থিতিতে ১৯১৬-এর লখনৌ চুক্তির মধ্য দিয়ে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ভারতীয়দের আরও স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ করার পথ সুগম করল।

প্রাক-গান্ধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর মৌলিক পার্থক্য আছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সকল প্রকার জীবনধারা ও কর্মপদ্ধতিকে অতিক্রম করে

গান্ধীজী এক নতুন কর্মপন্থা দেখালেন। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনধারা, আশা-আকাঙ্খা, অনুভূতি এবং সমবেদনার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করেছিলেন। রাজনীতি তাঁর কাছে নেতৃবৃন্দের চুলচেরা বিতর্ক সভার মঞ্চ ছিল না। রাজনীতি তাঁর কাছে জনগণের নিঃস্বার্থ সেবার ব্রতরূপে দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির প্রথম সফল পরীক্ষা হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয়বিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রামে। ভারতে এসে তিনি তাঁর গণমুখী রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিকে বারবার প্রয়োগ করেছিলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরে তিনি ১৯১৫-এর প্রথম দিকে রাজকোটে যাচ্ছিলেন। মধ্যবর্তী পথে ট্রেনের সহযাত্রীরা তাঁকে বীরগ্রামের কুখ্যাত বেষ্টনী প্রথার জন্য ট্রেন যাত্রীর চরম দুর্ভোগের কথা জানায়। গান্ধীজী তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন যে বীরগ্রামের কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারকে চিঠি লেখেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের হুমকি দেন। তাঁকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে হয় নি। কারণ ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে বীরগ্রামের কুখ্যাত বেষ্টনী প্রথা উঠে যায়। ভারতে প্রত্যাগমনের পর গান্ধীজীর এটাই হল প্রথম রাজনৈতিক সাফল্য।

বীরগ্রামের পর গান্ধীজী উত্তর বিহারে চম্পারণ অঞ্চলে নীলচাষের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। উত্তর বিহারে নীলকর কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরে উগ্র সামন্ত অত্যাচারে উৎপীড়িত হচ্ছিল। চম্পারণের কৃষকেরা গান্ধীজীর কাছে সাহায্য চাইতেই তিনি সম্মতি দিলেন। এই সময় হোমরুল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তিনি চম্পারণের নিরক্ষর কৃষকদের অহিংস মতবাদ সহজ করে বোঝালেন। তিনি তাঁদের অহিংস আন্দোলনের স্বার্থে নিপীড়ন ও কারাবরণকে সহজভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। চম্পারণ আন্দোলনের সময় ইউরোপীয় নীলকর সাহেবদের প্রবল বিরোধিতা গান্ধীজী উপেক্ষা করলেন। তিনি নীলচাষে নিযুক্ত কৃষকদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করলেন। তিনি কৃষকদের নীলচাষ করতে নিষেধ করলেন। অবশ্য চম্পারণের কৃষকদের নীলচাষ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবসময় অহিংস ছিল না। যে কোন গণ-আন্দোলনের মতো চম্পারণের কৃষক আন্দোলনের একটি স্তরে হিংসামুখী প্রবণতা দেখা দেয়। অবশ্য ব্রিটিশ সরকার বলপ্রয়োগের হুমকি দেখিয়ে চম্পারণের কৃষকদের আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারে নি। চম্পারণ কৃষক সংগ্রামে গান্ধীজীর সঙ্গে মজহরউল হক, ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জে, বি, কৃপালনী প্রমুখ তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যোগ দেন। পরবর্তীকালে

তাঁরা সর্বভারতীয় নেতা হন।

চম্পারণের কৃষক সংগ্রাম কয়েকটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম ইউরোপীয় নীলচাষ মালিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় মালিক এবং ব্রিটিশ আমলাদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীজী এই সংগ্রামকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেজন্য চম্পারণের কৃষক আন্দোলনকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রামের 'dress-reharsal' বলা হয়।

১৯১৮-এ আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দান গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমেদাবাদে শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। সেজন্য মিল মালিকেরা ষোল দিন মিলগুলি বন্ধ রাখে। কারখানাগুলি খোলার পর শ্রমিকেরা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। গান্ধীজী শ্রমিকদের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বেতন বৃদ্ধি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মিল মালিকেরা গান্ধীজীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। গান্ধীজী সুতাকল শ্রমিকদের পঁয়ত্রিশ ভাগ মজুরী বৃদ্ধির দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। তিনি সাধারণ সভায় শ্রমিকদের ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ হল মালিকরা শ্রমিকদের দাবির শর্ত মেনে নিলে অথবা বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিকে সালিশী-বোর্ডের কাছে প্রেরণ করলে শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে হবে। মালিকদের অনমনীয় মনোভাবে শ্রমিক আন্দোলন আরও জোরদার হয়। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী শ্রমিকের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু করেন। তিনদিন পর মিল মালিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিটি সালিশী বোর্ডের কাছে প্রেরণ করতে রাজি হলে শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

সুতাকল শ্রমিকদের দাবির প্রতি মিল মালিকদের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অনশন কর্মপদ্ধতিটি আকাংখিত সাফল্য আনে। শ্রমিক আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব দান এবং সাফল্য লাভের ঘটনাটি আকস্মিক নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বীকৃত পদ্ধতিগুলিকে এড়িয়ে গান্ধীজী ব্যক্তিগত উপবাসের দ্বারা এই আন্দোলনে জয়ী হলেন। অর্থাৎ, আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকদের আন্দোলন যখন জঙ্গী আকার ধারণ করছিল ঠিক সেই সময় গান্ধীজী তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন।

অনুরূপভাবে খেদা অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে গান্ধীজী হস্তক্ষেপ করেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত খেদার কৃষকেরা সরকারকে খাজনা দান স্থগিত রাখার দাবি করেছিল।

গান্ধীজী দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি কৃষকদের অন্যায়ভাবে আটকে রাখা শস্য মাঠ থেকে তুলে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখানেও কৃষক আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে পড়লে গান্ধীজী অসন্তুষ্ট হন। যদিও তিনি খেদার কৃষক আন্দোলনে 'great awakening among the people' লক্ষ্য করেছিলেন।

গুজরাটের খেদা জেলায় গান্ধীজী প্রত্যেক গ্রাম থেকে কুড়ি জন সমর্থ মানুষকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানান। তিনি এই আহবানকে 'sacrifice for empire and swaraj' বলে বর্ণনা করেন। শুধু গান্ধীজীই নন এমনকি লোকমান্য তিলক পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের যোগদানের আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ তহবিলের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে গান্ধীজীকে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গান্ধীজীর ভূমিকাকে 'Recruiting Sergeant' নামে আখ্যা দেন। অবশ্য যুদ্ধে যোগদানের জন্য গান্ধীজীর আহবান খেদা জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর পদ্ধতিই হল আন্দোলন সৃষ্টি করা। সে আন্দোলন কোন সময়ে কৃষক আন্দোলন কোন সময়ে শ্রমিক আন্দোলন আবার কোন সময়ে যুদ্ধের জন্য সৈনিক নিয়োগ আন্দোলনের সৃষ্টি করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক নিয়োগের ভূমিকায় গান্ধীজীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কোন মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি যুদ্ধ শেষে ভারতের জন্য স্বরাজ লাভের লক্ষ্যকেই প্রাধান্য দেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হ'ল 'expediency rather than a rigid principle'। গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনি মতাদর্শগতভাবে কখনও নরমপন্থী বা চরমপন্থী ছিলেন না। শুধুমাত্র মতাদর্শের জন্যই তিনি কর্মপদ্ধতি স্থির করেন নি। সেজন্য দেখা যায় অহিংস মতবাদের প্রবল সমর্থক হয়েও তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত নিদারুণ সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য ভারতীয় সৈনিক নিয়োগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চমপারণের কৃষক সংগ্রাম, আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দান এবং খেদা জেলায় গণজাগরণের সৃষ্টি গান্ধীজীকে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসে। এতদিন জাতীয় আন্দোলনে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর যোগদানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে, এখন থেকে সাধারণ মানুষেরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করল। কারণ গান্ধীজী তাঁর জীবনধারা ও রাজনৈতিক পদ্ধতি

দিয়ে গ্রাম ও শহর, ক্ষেত ও খামারের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। সেজন্য বুদ্ধিজীবী নেতাদের পরিবর্তে সাধারণ মানুষ গান্ধীজীকে তাদের কাছের লোক বলে ভাবতে শুরু করে। এই কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর যোগদান ও নেতৃত্ব নতুন যুগের সূচনা করে।

৫. সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আশা অপূর্ণ থেকে যায়। হোমরুল আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় আন্দোলনের উপর নতুন ভাবে আক্রমণ শুরু করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসক তাই শুরু থেকেই শক্ত হাতে জাতীয় আন্দোলন দমনে প্রয়াসী হয়েছিল। অবস্থা যাতে ব্রিটিশের আয়ত্তের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য জরুরী আইন ও বিশেষ ক্ষমতা চালু করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে যুদ্ধকালীন ভারত-রক্ষা আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি শুধুমাত্র ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিফলন নয়। কারণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের আন্দোলনের যোগসূত্র সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেজন্য দেখা যায় রুশ বিপ্লব জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে যেভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরল তাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিব্রত হয়ে পড়েছিল। রাশিয়ার জার-তন্ত্রের পতনের পর পাঁচ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য হলঃ 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিভাজ্য অংশ হিসাবে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা।'

শুধুমাত্র জাতীয় আন্দোললেন চাপে ব্রিটিশ সরকার স্বয়ত্তশাসনমূলক সরকার ভারতের জন্য অনুমোদন করেছিল এই রকম মনে করা সঙ্গত নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চাপে পড়েই অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবেই ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণা করেছিল। মনে রাখতে হবে, ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতির সঙ্গে প্রকৃত মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৯১৯-এর শাসন সংস্কারে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে দ্বৈত-শাসন (dyarchy) নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ শাসন সংস্কার রূপায়নের

সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ শুরু হয়েছিল। রজনীপাম দত্ত এই আক্রমণকে 'iron hand of imperialisim beneath the velvet glove of Reform' বলে বর্ণনা করেছেন। শাসন সংস্কারের মখমলের তলায় সাম্রাজ্য-বাদের চণ্ডনীতি শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতে গণ-আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায় নি বরং নতুন উদ্যমে গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি চলেছিল।

ক. রাওলাট আইন

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রস্তাবকে 'un-worthy of England to give and of India to take' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজী এই শাসন সংস্কার প্রস্তাবকে 'deserves sympathetic handling rather than summary rejection' বলে অভিহিত করে-ছিলেন। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন সংস্কারের সঙ্গে চণ্ডনীতি প্রয়োগের সম্ভাবনাকে কল্পনা করতে পারেন নি। সেজন্য তিনি শাসন সংস্কারের প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল বিবেচনার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কুখ্যাত দু'টি বিল ভারতীয় আইনসভায় উত্থাপিত হয়েছিল। এই বিল দু'টি রাওলাট বিল নামে পরিচিত। প্রথম রাওলাট বিলে রাজদ্রোহ মামলা বিচারের জন্য একটি নতুন বিচারালয় গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। এই বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না। মোট কথা, ভারত-রক্ষা আইন যুদ্ধশেষে উঠে গেলেও রাজদ্রোহ দমনের নামে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন দমন করার জন্য সরকারের হাতে অস্বাভাবিক ক্ষমতা দান করাই হল প্রথম বিলের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য ছিল ফৌজদারী আইন বা ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তন করা। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি না নিয়েই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্ত করে কাউকে দোষী সন্দেহ করলে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারত। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর নির্ভর করত সমস্ত ব্যাপারটা। তারা খেয়াল খুশীমত এই আইন প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন স্তব্ধ করার ক্ষমতা পেয়েছিল।

কুখ্যাত রাওলাট বিল আইনসভায় উত্থাপিত হল। গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন এবং সত্যাগ্রহ অভিযান শুরু করলেন।

প্রথমে তিনি বিল দু'টি প্রত্যাহার করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজীর অনুরোধে বড়লাট কর্ণপাত না করলে তিনি ঘোষণা করলেন: 'এই আইনগুলি এবং এই ধরণের অন্যান্য আইন আমরা ভদ্রভাবে মেনে নিতে রাজি নই।' অবশ্য অহিংসভাবে আন্দোলন চলবে এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তির কোন ক্ষতি হবে না এই প্রতিশ্রুতি গান্ধীজী দিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে বল্লবভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, প্রমুখ চব্বিশজন রাওলাট আইনবিরোধী ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন।

গান্ধীজীকে সভাপতি করে সত্যাগ্রহ সভা গঠিত হয়। এই সভা সারা ভারতে একদিনের জন্য হরতাল পালনে আহবান জানায়। সেই অনুযায়ী ১৯১৯-এব এপ্রিল মাসে একদিন সারা ভারতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হরতালকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল। দিল্লীতে পুলিশ জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল। সংঘর্ষ ও অসন্তোষ দিল্লী থেকে অমৃতসরে ছড়িয়ে পড়লে পাঞ্জাবের নেতারা গান্ধীজীকে স্থানীয় উপদ্রুত অঞ্চলগুলি সফরের জন্য অনুরোধ জানালেন। পুলিশের বাধাদানে গান্ধীজী পুনরায় বোম্বাই-এ ফিরে এলেন।

হাণ্টার কমিটির প্রতিবেদনে জানা যায়, রাওলাট আইনবিরোধী আন্দোলনে দু'জন সরকারী কর্মচারী সমেত আটাশজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয় এবং একশ তেইশজন আহত হন। আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আমেদাবাদের বিভিন্ন স্থানে টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়। পশ্চিম ভারতে রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে গান্ধীজী ১৯১৯-এর এপ্রিল মাসে এই আন্দোলন স্থগিত রাখতে আবেদন জানান। তিনি ঘোষণা করলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসার স্থান নেই। তাঁর মতে সত্যাগ্রহ দর্শনে মানুষ অনুপ্রাণিত না হলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। সেজন্যই অহিংস রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন পশ্চিম ভারতে সহিংস আকার ধারণ করে। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেওয়াকে 'Himalayan miscalculation' বলে অভিহিত করেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তিনদিন উপবাস করলেন।

রাওলাট আইন বিরোধী গণ আন্দোলনকে মাঝপথে স্থগিত রাখার জন্য অনেকে গান্ধীজীকে সমালোচনা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতে সাম্রাজ্যবাদী

আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার জন্য গান্ধীজীকে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন সব সময় অহিংস আন্দোলন হওয়া উচিত। সেজন্যই তিনি মাঝপথে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন।

খ. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহ অভিযান স্থগিত রাখার আগেই পাঞ্জাবে ব্রিটিশের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। পাঞ্জাবের লেফটন্যাণ্ট-গভর্ণর মাইকেল ডায়ার সারা প্রদেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ ক'রে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু ক'রে দেয়। তাঁর নির্দেশে বহু শত ব্যক্তিকে অন্তরীণ রাখা হয়। শুধু তাই নয় তিনি আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। ডায়ারের দমন পীড়নমূলক কার্যকলাপ ১৯১৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনে পাঞ্জাব প্রতিনিধিদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

রাওলাট আইন বিরোধী হরতাল সফলভাবে পালিত হবার পরেই পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। হরতাল পালনের এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে বিক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। বিক্ষোভ দমনে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার তাণ্ডবলীলার ভয়াবহ ইতিহাস রচনা করল। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে লাহোরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কয়েক শত ছাত্রের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। অন্য একটি স্থানে দশ হাজারের বেশি জনতা সমবেত হলে পুলিশ তাদের উপর বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণ করে। পাঞ্জাবের কাসুর অঞ্চলে গণবিক্ষোভ দেখা দিলে পুলিশ নির্মমভাবে তা দমন করে।

অমৃতসরে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার লাহোর ও কাসুরের পুলিশী আক্রমণকে ম্লান করে দেয়। ১৯১৯-এর এপ্রিল মাসে এক দিনের হরতাল অমৃতসরে শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। বিনা প্ররোচনায় মাইকেল ডায়ার পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃদ্বয় ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুকে অন্তরীণের আদেশ দেয়। অন্তরীণ আদেশের প্রতিবাদে অমৃতসরে হরতাল পালিত হয় এবং জনতা শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এই সময় গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের খবর প্রচারিত হলে জনতা শান্তিপূর্ণভাবে পুনরায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শান্তিপূর্ণ জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ সারা শহরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অমৃতসর শহরে প্রতিবাদ

মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে হলগেট সেতুর কাছে পৌঁছলে পুলিশ তাদের উপর পুনরায় গুলিবর্ষণ করে। ফলে তিরিশজনের মৃত্যু হয়।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের আগমণে পাঞ্জাবে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার চরমতম আকার ধারণ করে। জেনারেল ডায়ার সামরিক আইন জারি না করেই অসামরিক কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি যথেচ্ছ গ্রেপ্তার শুরু করে দেন এবং সেই সঙ্গে সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ডায়ারের আক্রমণের প্রতিবাদে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা ডাকা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই ডায়ার জনসমাবেশকে অবৈধ ঘোষণা করেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগে অমৃতসরের জনতা সম্মিলিত হবার সঙ্গেই জেনারেল ডায়ার কোনরকম হুঁশিয়ারী না করে দশহাজার জনতার উপর গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে প্রবেশ অথবা প্রস্থানের একটিমাত্র দরজা ছিল। সেই দরজা বন্ধ ক'রে জেনারেল ডায়ারের সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র অসামরিক জনতার উপর নির্মমভাবে গুলি বর্ষণ করে। জনতার মধ্যে স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। ঘটনাস্থলেই প্রায় এক হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ১৫ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার সামরিক আইন জারি করেন। দু'দিন আগে সামরিক আইন জারি না করেই অত্যন্ত ঠাণ্ডা-মাথায় এবং সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা করা হল। হাণ্টার কমিটির সামনে সাক্ষ্য-দানকালে জেনারেল ডায়ার স্বীকার করেন যে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবেই সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিচালনার আদেশ দেন। তিনি বলেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'to strike terror into the whole of the Punjab.' তিনি স্বীকার করেন যে গুলি না চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা যেত। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ জনতাকে শুধুমাত্র ছত্রভঙ্গ করাটা 'derogatory to his dignity as a defender of law and order.'

পাঞ্জাবের পাঁচটি জেলায় সামরিক আইন জারি করা হয়। সামরিক শাসনে উপদ্রুত জেলাগুলিতে সন্ত্রাস ও তাণ্ডবলীলা চলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ এই জেলাগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। যে কোন সভ্য সরকারের কাছে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন পাঞ্জাবের ঘটনাগুলি চরম লজ্জাজনক ব্যাপার। বীভৎস তাণ্ডবলীলার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাঞ্জাবের সামরিক শাসন। অমৃতসর শহরে কয়েক সপ্তাহ ধরে সান্ধ্য আইন বলবৎ রইল। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে শহরে সাময়িকভাবে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ

বন্ধ করা হল। তার নির্দেশে প্রধান রাস্তাগুলিতে পথচারীদের হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা হল। সামরিক শাসনে বেত্রাঘাত সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হল। জেনারেল ডায়ারের সহকর্মী ক্যাপ্টেন ডাভটন কাসুর শহরে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে চরমতম দৈহিক নির্যাতন শুরু করেছিল। যুদ্ধ জয়ের পর শত্রুর ভূখণ্ডের চেয়েও বেশি অত্যাচার পাঞ্জাবে করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা শত্রু ভূখণ্ড শাসিত হয় কিন্তু পাঞ্জাবের সন্ত্রাস ও তাণ্ডবলীলা কোন সভ্য আইনের দ্বারা সমর্থিত হয় না।

ভারত সরকার প্রায় আট মাস পাঞ্জাবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ঘটনাগুলিকে জনসমক্ষের আড়ালে রেখেছিল। ক্রমে ক্রমে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী প্রকাশিত হ'লে সারা ভারতে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ে। জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। বড়লাটকে লেখা প্রতিবাদ পত্রে রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ 'সময় এসেছে যখন দেখতে পাচ্ছি সম্মানসূচক অভিজ্ঞানপত্র অপমানসূচক পরিস্থিতিতে বেমানান হ'য়ে আমাদের লজ্জাকে আরো প্রকট করছে, তখন নিজের দিক থেকে আমি সব রকমের বিশেষ সম্মান পরিত্যাগ ক'রে মানুষের অযোগ্য তথাকথিত নিষ্ফল তুচ্ছতা আর মর্যাদাহানিকর অবস্থায় আমার যে দেশবাসী রয়েছেন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চাই।'

মদনমোহন মালব্য পাঞ্জাবের নির্মম ঘটনাবলীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ক'রে কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রশ্নাকারে পেশ করেন। বড়লাট এই প্রশ্নগুলিকে আইন-সভায় উত্থাপিত হতে দেন নি। শুধু তাই নয় পাঞ্জাবের বেআইনী কার্যকলাপকে আইনসিদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় Indemnity Bill উত্থাপিত হয়। মদনমোহন মালব্যের আনীত প্রশ্নগুলি ভারতে তুমুল আলোড়নের সঞ্চার করে। সমস্ত ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেবার জন্য বড়লাট তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আশ্বাস দেন।

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকেরা জেনারেল ডায়ারের অপকীর্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে। তারা জেনারেল ডায়ারকে তার নারকীয় কার্যকলাপের পুরস্কার স্বরূপ কুড়ি হাজার পাউণ্ড ও একটি তরবারি উপহার দেয়।

১৮৫৭-এর মহাঅভুত্থানে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের পরেই ১৯১৯-এ পাঞ্জাবের ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের আক্রমণ ভারতীয়ের মনে তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঘৃণার সঞ্চার করে।

গ. খিলাফত আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের পাশাপাশি সংগঠিত হয়েছিল গণ-আন্দোলন। ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন ও দমন নীতিকে নীরবে মাথা পেতে মেনে নেয় নি। পাঞ্জাবের সাম্রাজ্যবাদী গণহত্যা ও গণ-অত্যাচারের পরেই দেখা দিয়েছিল একটি নতুন আন্দোলন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতে খিলাফত আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দেয়। এই ঘটনায় ভারতীয় মুসলমান সমাজ বিব্রত বোধ করে। কারণ তুরস্কের সুলতান খলিফাকে ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মগুরু বলে মনে করতেন। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবার জন্য যুদ্ধ শেষে তুরস্ককে ন্যায়বিচার দানের আশ্বাস দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ১৯১৮-এ ঘোষণা করেন যে, তুরস্ককে তার সমৃদ্ধশালী ভূখণ্ড থেকে বঞ্চিত করার জন্য মিত্রশক্তি যুদ্ধে যোগ দেয় নি। এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি এক বাণীতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসদানকে সমর্থন করেন। মিত্রশক্তির প্রধান নেতৃদ্বয়ের আশ্বাসে ভারতীয় মুসলমানেরা মনে করেছিলেন যে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন তুরস্কের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে না। কিন্তু যুদ্ধশেষে যুদ্ধবিরতির শর্ত প্রকাশিত হ'লে ভারতীয় মুসলমানদের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা হতাশায় পর্যবসিত হয়। কারণ তুরস্কের একটি অঞ্চল গ্রীসকে দেওয়া হয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের সমগ্র এশিয়া অঞ্চলটি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়। তার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তুরস্কের সুলতান খলিফাকে তাঁর সকল প্রকার অধিকার ও কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। মিত্রশক্তির তত্ত্বাবধানে গঠিত হাইকমিশনের অধীনে খলিফাকে আনা হয়। ধর্মগুরু সুলতান খলিফার কর্তৃত্ব ও অধিকার চ্যুতি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নিদারুণ ব্রিটিশবিরোধী বিক্ষোভের সঞ্চার করে।

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিরা সারা ১৯১৯-এর বছরটিতে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিবাদে কোন রকম সাড়া দেয় নি। ১৯২০-এর প্রথম দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানেরা মিত্রশক্তির তুরস্ক নীতি পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপসৃষ্টির আন্দোলনই খিলাফত আন্দোলনের জন্ম দেয়। খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে গান্ধীজীর যোগদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনা। গান্ধীজী মনে করেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী খিলাফত আন্দোলন যথার্থ এবং ন্যায্য। তিনি যুদ্ধের সময় প্রদত্ত ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রীর আশ্বাসবাণীকে রূপায়িত করার অনুরোধ করেন। সেজন্য তিনি খিলাফত আন্দোলনকে হোমরুল আন্দোলনের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেছিলেন। সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলন মুসলমানদের যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ উৎসবে যোগদানে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করে। গান্ধীজীর পরামর্শে এই সম্মেলন মুসলমানদের পক্ষে সম্মানজনক শর্তে তুরস্ক সমস্যার সমাধান না হলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানায়। মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

১৯১৯-এর শেষের দিকে মহম্মদ আলী এবং সৌকত আলী (আলি ভ্রাতৃদ্বয়) জেল থেকে ছাড়া পেলেন। তাঁরা খিলাফত আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। মহম্মদ আলির নেতৃত্বে খিলাফত কমিটি শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হল। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের আহবানে ভারতীয় মৌলবীরা ব্রিটিশবিরোধী খিলাফত আন্দোলনে সামিল হন। এই সময় গান্ধীজী উত্তেজনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবমুখী মূল্যায়ন করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ভারতীয় মুসলমানের প্রকৃত অভিযোগই খিলাফত আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। তিনি খিলাফত আন্দোলনকে শুধুমাত্র মুসলমানের অভিযোগের পটভূমিতে দেখেন নি। যদিও ধর্মীয় অভিযোগই এই আন্দোলনকে সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এই আন্দোলনে দেখেছিলেন an opportunity of uniting Hindus and Muslims as would not arise in hundred years.'

১৯২০-এর প্রথমদিকে খিলাফত কমিটির পক্ষে গান্ধীজী একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তেহার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারণ এই ইস্তেহারে তিনি অহিংস অসহযোগ তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এই ইস্তেহারে গান্ধীজী হিন্দুদের ভারতীয় মুসলমানের খিলাফতের দাবিকে সমর্থন করার জন্য আহবান জানান। তাঁর মতে খিলাফত প্রশ্ন ভারতের শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নকে ম্লান করে দিয়েছে। সারা ভারত খিলাফত কমিটি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। এলাহবাদে মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সমর্থিত হয়।

খিলাফত কমিটি বড়লাটকে একটি চিঠিতে জানায় যে, ১৯১৯-এর ১লা আগষ্টের মধ্যে তুরস্ক সমস্যার সম্মানজনক মীমাংসা না হলে ভারতীয় মুসলমানেরা অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন। একই দিনে গান্ধীজী বড়লাটকে লেখা এক পত্রে খিলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। পুনরায় গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বড়লাটকে চরম পত্র দেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই ১৯২০-এর আগষ্ট মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত কমিটি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণে অগ্রণী হয়। ব্রিটিশের দেওয়া কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক গান্ধীজী এই সময় ফেরত দেন। খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাকিম আজমল খাঁ ব্রিটিশের দেওয়া সম্মান ফিরিয়ে দেন। গান্ধীজী এবং আজমল খাঁকে অনুসরণ করে ভারতীয় মুসলমানেরা ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেন।

খিলাফত আন্দোলনের তাৎপর্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে ধর্মীয় আবেদন অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। খিলাফত প্রশ্নটিকে ধর্মীয় আবেদনে প্রচার করার সঙ্গেই সমগ্র স্বাধীনতার প্রশ্নটিকেও ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধর্মনিরপেক্ষ উদ্দেশ্যকে ম্লান করেছিল। ১৯২২-এ কামাল পাশার নেতৃত্বে নতুন তুরস্ক সরকার গঠিত হওয়ায় সুলতান খলিফা তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। খিলাফত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুলতান খলিফার কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু ১৯১২-এর পর খিলাফত আন্দোলন রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। কামাল পাশা তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব'লে ঘোষণা করেন।

খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে সাধারণভাবে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। আন্দোলনের প্রভাব শহুরে বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্তের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র মুসলমান সমাজের দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকের মধ্যে খিলাফত আন্দোলনের তেমন প্রভাব পড়ে নি। দরিদ্র শ্রমজীবী মুসলমানেরা শোষণবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। কারণ খিলাফত আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবিরোধী অর্থনৈতিক শোষণের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে নি।

খিলাফত আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, স্বাধীনতা

সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ খিলাফত আন্দোলন ভারতে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চরম রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। এই রাজনৈতিক বিভেদকে ইন্ধন জোগায় মুসলিম লীগ এবং হিন্দু ধর্মের উগ্র সংস্থাগুলি। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের পর ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যথেষ্ঠভাবে বিঘ্নিত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা খিলাফত আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, খিলাফত আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মুসলমানের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করা।

৬. অসহযোগ আন্দোলন

(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় অসমর্থ ব্রিটিশ শাসক ভারতে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে। রাওলাট আইন, পাঞ্জাবে গণহত্যা এবং তুরস্কের খলিফা সুলতানের কর্তৃত্ব হরণ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ভারতের উত্তেজনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গণ-আন্দোলনমুখী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করায় অগ্রনী হলেন গান্ধীজী) তিনি এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন হন। লাজপত রায় ভারতের যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি রূপে আখ্যা দেন। অবশ্য তিনি ভারতীয়ের প্রকৃতিতে বিপ্লববাদের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করেন। যদিও ভারতের জাতীয়-বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন এই সময়ে। লাজপত রায়ের মূল্যায়ন কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গান্ধীজী প্রথম থেকেই বিপ্লববাদ তথা সহিংস আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। (যুদ্ধোত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করেন।)

খিলাফত আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময় কলকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন (১৯২০) অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে

স্বীকৃত হয়। তুরস্কের খলিফা এবং পাঞ্জাবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে গান্ধীজী কলকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর গান্ধীজীর উত্থাপিত প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। কংগ্রেস অধিবেশন খিলাফত কমিটি প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে সাত দফা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান, সরকারের মনোনীত সদস্যদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হতে পদত্যাগ ; সর্বপ্রকার জাঁকজমকপূর্ণ সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন ; সরকার পরিচালিত স্কুল কলেজ বয়কট ; ব্যবহারজীবী ও মামলাকারীদের ব্রিটিশ আদালত বর্জন ; মেসোপটেমিয়ায় ব্রিটিশ সামরিক চাকুরি প্রত্যাখ্যান ; আইনসভার নির্বাচন ও ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট ইত্যাদি প্রস্তাব ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বিশেষ অধিবেশনের তিনমাস পরে নাগপুরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করা হয়। ১৯০৮-এ জাতীয় কংগ্রেস 'self-governing member of the British Empire'-কে চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য ১৯১৯ পর্যন্ত বহাল থাকে। ১৯২০-এর বাৎসরিক অধিবেশনে 'the attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means'-কে কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করা হয়। ঔপনিবেশিক ধরণের সরকার-এর পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ ও আইন-সম্মত উপায়ে স্বরাজ অর্জনকেই জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারকে হুঁশিয়ারী করে বলেন যদি ভারতীয়দের উপর প্রত্যাশিত সুবিচার না করা হয় সেক্ষেত্রে 'সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা হবে প্রত্যেক ভারতীয়ের একান্ত কর্তব্য।' শুধু তাই নয় এই অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মৃত ও কবরস্থ হয়েছে।

কলকাতায় বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করে এর প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। গান্ধীজী উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলা হয়েছে 'যে শ্রেণীগুলি এত দিন জনমতের প্রতিনিধিত্ব ক'রে এসেছে' তারাই অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। অর্থাৎ বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকবে। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীগুলি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে যথেষ্টভাবে হয়রানি করবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র চরম অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কোনক্রমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলবে না। লক্ষ্য করার বিষয় হল প্রস্তাবের কোন জায়গায় শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট বা কৃষকের খাজনা বন্ধের আন্দোলন অথবা উদ্বৃত্ত জমি দখলের জঙ্গী কর্মসূচী উল্লেখ করা হয় নি। অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতি এবং ভূস্বামীদের স্বার্থবিরোধী কর্মসূচী অসহযোগ গণ-আন্দোলনের কর্মসূচীতে স্থান পায় নি। এমন কি ব্রিটিশ শাসকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর সফল আঘাত হানতে পারে এমন কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও কর্মসূচী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের উপর প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ১৯২০-তে কবরস্থ করতে চান নি।

কলকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাবে স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যকে জহরলাল নেহরু 'delightfully vague' বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ এই প্রস্তাব স্বরাজ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার সৃষ্টি করে না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকুরী ত্যাগ করে সদ্য ইংলণ্ড প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করে হতাশ হয়েছিলেন। কারণ গান্ধীজী তাঁকে কেমনভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন নি।

১৯২১-এর বছরটি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বরূপে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্থায়ী ছাপ রেখেছে। এই বছর ৪০০টি শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট হয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫ লক্ষেরও বেশি শিল্পশ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ মালিকানাধীন আসামের চা বাগানে অন্ততপক্ষে ১২ হাজার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রবল হুমকি ও ভীতি সত্ত্বেও ধর্মঘট চালায়। তাদের অনেককে ব্রিটিশ মালিক কর্মচ্যুত করে। সদ্য বরখাস্ত চা শ্রমিকদের কোনো রকম সাহায্য করতে সরকার অস্বীকৃত হয়। শেষ পর্যন্ত কর্মচ্যুত শ্রমিকেরা চাঁদপুরের স্টীমারঘাটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং তার অনুচরেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে চা শ্রমিকদের নির্মমভাবে প্রহার করে এবং জলে ফেলে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ভারতীয় কর্মচারীরা এবং স্টীমার কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করে দেয়। কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে শ্রমিকের পাশে না দাঁড়ালেও

সাধারণ মানুষের হস্তক্ষেপে চাঁদপুর ঘাটে অবরুদ্ধ শ্রমিকদের বাড়ী পাঠানো হয়। গান্ধীজী চা শ্রমিক ধর্মঘট এবং অন্যান্য ঘটনায় আদৌ খুশী হন নি।

১৯২১-এর এপ্রিলে বিক্ষুব্ধ মুলসীর কৃষকেরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহের পথে পা বাড়ায়। গান্ধীজী মুলসীর জমির মালিক বিখ্যাত শিল্পপতি টাটা পরিবারকে কৃষকদের সঙ্গে আপোষ ক'রে বিষয়টি মিটিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি অন্ধ্রের চিরালা-পেরালার গ্রামগুলির কৃষকদের দাবি সমর্থন করেন। এখানকার কৃষকেরা মিউনিসিপ্যালিটি গঠনে তীব্র আপত্তি জানায়। কারণ মিউনিসিপ্যালিটির অর্থই হল কৃষকদের পক্ষে অধিকতর কর দান। গান্ধীজী মেলাগাঁও-এর কৃষকদের অসহযোগ আন্দোলনের সময় অহিংস পথ থেকে সরে আসার জন্য ভংসনা করেন। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলিতে কৃষক বিক্ষোভ মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে সাতজনের মৃত্যু হয় এবং বহু কৃষক আহত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ উত্তরপ্রদেশের প্রায় সত্তর হাজার কৃষক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেয়।

বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ১৯১৯-এর একটি আইনে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়। কারণ ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিধি ব্যবস্থা সত্ত্বেও জেলা পর্যায়ের সরকারি আমলারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইউনিয়ন বোর্ড কৃষকদের কোন রকম সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর ব্যবস্থা করেছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়েছিল। কৃষকেরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের চাপানো কর দিতে অস্বীকার করে। সারা জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের কর বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জেলার কৃষক শ্রেণী সরকারের অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হয়। ১৯২১-এ নির্মম উৎপীড়ন ও অত্যাচার সত্ত্বেও মেদিনীপুরের কৃষকের মনোবল অক্ষুন্ন থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯২২-এ ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রত্যাহৃত হয়।

পাঞ্জাবের শিখ কৃষকেরা অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়। নানকানা সাহেবের গুরুদ্বারে নির্মম হত্যাকাণ্ড তাদের মনোবলকে আরও দৃঢ় করে। বেশ কিছুদিন থেকেই শিখ কৃষক এবং মধ্যবিত্তেরা শিখ ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। শিখ ধর্ম স্থানগুলি দুর্নীতিপরায়ণ ও অপদার্থ মোহান্তদের

কুক্ষিগত হয়েছিল। ১৯২১ সালে শিখেরা দুর্নীতিপরায়ণ মোহান্তদের বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এই সুযোগে শিখ গুরুদ্বারের মোহান্তের অনুচরেরা ধর্ম মন্দিরের মধ্যেই প্রায় ১০০ শিখ উপাসনাকারীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সারা ভারত এই হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়। মন্দিরের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা পাঞ্জাবে শিখেরা অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে দেয়। শিখ গুরুদ্বারগুলির গণতন্ত্রীকরণ ও সংস্কারের আন্দোলন 'অকালী' আন্দোলনের উদ্ভব ঘটায়।

এই সময়ে মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ অসহযোগ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অসহযোগ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ মোপলাদের প্রজ্বলিত করে। ব্রিটিশ অফিসারেরা মোপলাদের ধর্মগুরুকে চূড়ান্ত অপমান করলে মোপলা কৃষকেরা সশস্ত্র আন্দোলন চালায়। তারা পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রগুলিকে আক্রমণ করে। দীর্ঘদিন ধরে ভূস্বামী ও মহাজনদের অত্যাচারে নিপীড়িত মোপলার কৃষকেরা এই সময়ে জমিদার ও সুদখোর মহাজনকে আক্রমণ করে। মালাবারের মোপলা কৃষকেরা স্বল্প সময়ের জন্য সমগ্র অঞ্চলটির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা মালাবারের মুসলমান মোপলা কৃষক বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ রূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁরা সুকৌশলে মোপলা কৃষকদের ব্রিটিশবিরোধী এবং জমিদার-মহাজন বিরোধী আন্দোলনের চরিত্রটি আড়াল করার চেষ্টা করেছেন।

গান্ধীজী এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব মালাবারের মোপলা কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশের অত্যাচারের নিন্দা করেছিল।

সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মানসিক প্রস্তুতির চেয়ে ভারতের জনগণ গণ-আন্দোলনের জন্য আরো বেশী প্রস্তুত হয়েছিল। ১৯২১-এর জুলাই মাসে গান্ধীজী বোম্বাই শহরে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে পৌরহিত্য করেন। তিনি বুঝেছিলেন জনগণের রাজনৈতিক চাহিদা পূরণের সময় এসেছে। অসহযোগ আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে সারা ভারতে ছড়িয়ে প'ড়ে গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জনগণ ও নেতৃবৃন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজদ্রোহের অপরাধে আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের গ্রেপ্তার করে। গান্ধীজী ব্রিটিশের তীব্র আক্রমণের সম্মুখে দৃঢ়তার সঙ্গে খিলাফত কমিটি এবং

মুসলমান নেতাদের পাশে দাঁড়ান। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে তিনি ঘোষণা করেন ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারতে স্বরাজ আসবে। অবশ্য কেমনভাবে স্বরাজ আসবে তা তিনি বলেন নি।

(১৯২১-এর শেষের দিকে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। নভেম্বরের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর জনগণের আশা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় আইন অমান্য আন্দোলন এবং খাজনা বন্ধের আন্দোলন সারা ভারতে সংগঠিতভাবে শুরু হবে।) কারণ গত বছরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে এই বিষয়ের উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। (কংগ্রেস এই সময়ে ওয়েলসের যুবরাজের ভারত আগমনের বিরোধিতা করে) এবং যুবরাজের জন্য আয়োজিত সর্বপ্রকার সভাসমিতি ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বয়কটের আহবান জানায়। যুবরাজ ১৯২১-এর নভেম্বর মাসে ভারতে আগমন করলে সেই দিন সারা ভারতে প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। (কংগ্রেস সর্বত্র অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হরতালের নির্দেশ দেয়। কিন্তু বোম্বাই শহরের হরতালে সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফলে ৫৩ জন মারা যায়। সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধীজী পাঁচ দিন অনশন করেন।)

(ব্রিটিশ সরকার গণ-আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস সেবাদল সংগঠন এবং খিলাফত কমিটিকে বেআইনী ঘোষণা করল।) অর্থাৎ কংগ্রেস সেবাদল এবং খিলাফত কমিটির সদস্য হওয়া আইনের চোখে অপরাধ ঘোষিত হল। সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণের (প্রতিবাদে কংগ্রেস দেশবাসীকে দলে দলে কংগ্রেস সেবাদল প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আহবান জানায়।) সারা দেশে প্রথম সারির কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহ বহু সহস্র রাজনৈতিক কর্মীকে গণ-আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। (সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা দলে দলে সেবাদল প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে কারাবরণ করেছিল। সারা ভারতে তিরিশ হাজারের বেশী মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়।)

(সারা দেশ যখন জেলখানায় পরিণত হয়েছে এমন উত্তেজনাময় পরিবেশের মধ্যে আমেদাবাদে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন হয়।) চিত্তরঞ্জন দাশ জেলে থাকার জন্য তাঁর পরিবর্তে হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজ ১৯২১-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এল না। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস অধিবেশনে (যতদিন না স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়

ততদিন উৎসাহের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজীকে 'sole executive authority of the Congress' রূপে নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ কংগ্রেস কর্মপরিষদের সর্বময় কর্তৃত্ব গান্ধীজীর উপর অর্পণ করা হল। ১৯২১-এর আমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে মৌলানা হসরত মোহানী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে স্বরাজকে 'complete independence, free from all foreign control' বলে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। গান্ধীজী মৌলানা হসরত মোহানী আনীত প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বললেন যে, বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জোরদার ঐক্য। শুধু তাই নয় তিনি মৌলানার প্রস্তাবে 'lack of responsibility' লক্ষ্য করলেন। ভারত সরকার মৌলানার সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলন প্রস্তাবটি বাদ যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে ইংলণ্ডে তারবার্তা পাঠায়।

আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েকমাস অতিবাহিত হবার পরও গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন না। বহু জেলা থেকে খাজনা বন্ধ আন্দোলন স্থানীয় ভাবে পরিচালনা করার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাওয়া হল। অন্ধ্রের গুন্টুর জেলায় রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করলে গান্ধীজী তাঁদের ভৎসনা করেন। শুধু তাই নয় গান্ধীজী সময়মত সমস্ত দেয় খাজনা পরিশোধের নির্দেশ দেন। জনগণ যখন খাজনা বন্ধ আন্দোলনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত তখন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সেই পথে উৎসাহিত করলেন না।

অবশেষে ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী বড়লাটকে এক পত্রে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সর্বপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবি জানালেন। এই দাবি না মানা হলে তিনি গণ-আইনঅমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। গণ-আইনঅমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি গুজরাতের বরদৌলি জেলাকে বেছে নিলেন। এই জেলার শান্তিপ্রিয় কৃষক শ্রেণীকে তিনি অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের উপযুক্ত বলে মনে করলেন। বড়লাটের কাছে গান্ধীজীর চিঠি সবেমাত্র পৌঁছেছে এমন সময় উত্তর প্রদেশে চৌরিচৌরা গ্রামের সংবাদ গান্ধীজীকে প্রবলভাবে বিচলিত করেছিল। চৌরিচৌরা গ্রামের উত্তেজিত কৃষক সমাবেশের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে কৃষকেরা থানায় গিয়ে আক্রমণ চালায় এবং তার ফলে বাইশজন পুলিশের মৃত্যু হয়। গান্ধীজী চৌরিচৌরার ঘটনাকে 'bitterest humi-

liation' বলে বর্ণনা করেন।) তিনি বরদোলি জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সংকল্পকে 'Himalayan miscalculation' বলে বর্ণনা করেন।

(অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বরদৌলি জেলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ডাকা হল এবং সেখানে আইন অমান্য আন্দোলনকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে) সারা দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের অস্পৃশ্যতাবিরোধী, মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন এবং শিক্ষামূলক ও চরকায় সুতো কাটার কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানানো হয়। (আইন অমান্য গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে সারা ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলের মধ্যে নেতারা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।) পট্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেনঃ 'জেলের ভেতর থেকে পন্ডিত মতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায় দীর্ঘ পত্র পাঠালেন। একটা অঞ্চলের পাপের জন্য সারা দেশকে শাস্তি দানের জন্য তাঁরা গান্ধীজীকে দোষারোপ করলেন। পন্ডিতজী প্রশ্ন করলেন, কন্যাকুমারীকার একটি গ্রাম যদি অহিংস নীতি মেনে না চলে তার জন্য হিমালয়ের পাদদেশের শহরকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?' সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তকে 'nothing short of a national calamity' বলে বর্ণনা করলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে জেলে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে জেলের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমেত সমস্ত জাতীয় নেতারা গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হন।

(১৯২২-এর মার্চ মাসে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়।) বিচারের পর আদালতের রায়ে তাঁকে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গান্ধীজীর গ্রেপ্তার এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সারা ভারতে যেমন আশা করা গিয়েছিল ঠিক তেমন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। (এই সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।) জনগণকে অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী করানোর পূর্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়ার যে কি পরিণতি হতে পারে গান্ধীজীর মতে চৌরিচৌরার ঘটনাবলী তার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'Madras (Malabar) did give the warning, but I heeded not. But God spoke clearly through Chauri Chaura'.

৭. অসহযোগ আন্দোলনের মূল্যায়ন

(সমালোচকেরা প্রশ্ন করেন যে, গান্ধীজীর ১৯২০-২১ এর অসহযোগ আন্দোলন

সফল অথবা ব্যর্থ হয়েছে কি না ?) রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন 'perhaps the correct view would be that it was neither a complete success nor a complete failure, and the truth, as often happens, lies between the two.' (যদি মনে করা হয় যে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে তাহলে স্বীকার করতে হয় যে আন্দোলন ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি। কারণ খিলাফত এবং পাঞ্জাবের অন্যায় ঘটনাবলীর কোন সুরাহা হয় নি। উপরন্তু গান্ধীজীর ঘোষণা সত্ত্বেও এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করা যায় নি। আইন-সভা, আদালত এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন সর্বব্যাপী হয় নি। অবশ্য পিকেটিং করে বিদেশী পণ্যদ্রব্য এবং মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সীমিত সাফল্য লাভ করেছিল।)

১ (অসহযোগ আন্দোলন যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। কারণ এই আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সরকারের নির্যাতন এবং শাস্তি বরণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি স্তব্ধ হয়ে গেলেও তার স্মৃতি ভারতীয়ের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গণ-জাগরণের মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছিল। বহু সহস্র মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্ম-ত্যাগে সমৃদ্ধ অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে এক স্বকীয় স্থান অর্জন করেছে। বক্তৃতা ও প্রস্তাবসর্বস্ব রাজনীতি থেকে জাতীয় সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।)

২ (অসহযোগ আন্দোলনের আগেকার আন্দোলনগুলি স্থানীয় দাবির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ, কয়রা প্রভৃতি স্থানে গান্ধীজী যে আন্দোলনগুলি পরিচালনা করেছিলেন সেগুলি নিতান্তভাবেই আঞ্চলিক দাবির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজী সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় গুরুত্বমণ্ডিত বিষয়গুলির উপর সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় গুরুত্বমণ্ডিত কয়েকটি মৌলিক বিষয়কে তুলে ধরে।)

৩ (অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনে প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দেয়। কংগ্রেস জনগণের কাছে কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের জন্য রাজনৈতিক আবেদন জানালে সেই আবেদনে জনগণ সাড়া দেয়। এতদিন জাতীয় আন্দোলনকে

যারা সৌখীন রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা সবাই কংগ্রেস ত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের আবেদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ সাড়া দিয়েছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরা তাদের লোভনীয় আয়ের পেশা সাময়িকভাবে ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরুর মত বহু বিশিষ্ট আইনজীবী একেবারেই ব্রিটিশের আদালত ত্যাগ করে সর্বসময়ের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দেন। সারা ভারতে বহু সহস্র ছাত্র এবং শিক্ষক স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং গুজরাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। সারা ভারতের গ্রাম ও শহরে অনেক জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রভূমি হয়েছিল। ১৯১৯-এর ভারত সরকার আইন অনুসারে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন বয়কটের ডাকে জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মীরা সাড়া দিয়েছিলেন। কারণ শুধুমাত্র জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসা নরমপন্থীরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কটের কর্মসূচীতে ভারতের ছাত্র ও যুব সমাজ অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিয়েছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন 'education may wait but Swaraj cannot.' অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সমাজ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তার ফলে ভারতের রাজনীতিতে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন জন্ম নেয়। ১৯২১-এর আমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। এর পর থেকে প্রতি বছরে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। রাজনৈতিকভাবে অগ্রগামী কয়েকটি প্রদেশে প্রতিবছর প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করা হত। নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল যে জাতীয় স্কুল এবং কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ রক্ষা করা।

জাতীয়-বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা প্রথমদিকে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে বাংলার জাতীয়-বিপ্লবী নেতারা গান্ধীজীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বারে আলোচনায় সম্মত হন। গান্ধীজী তাঁদের অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলে তাঁরা সাময়িকভাবে এই আন্দোলনকে

সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী জাতীয়-বিপ্লবীদের সাময়িক কালের জন্যও অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন আদায় করা ব্যাপারটি খুব সহজসাধ্য ছিল না।

চৌরিচৌরার ঘটনার পর বারদৌলিতে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে জাতীয় আন্দোলনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রকৃত কারণ কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনাবলী নয়, অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রকৃত কারণ আরও গভীরে নিহিত। জহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছেন, 'ব্যহ্যতঃ প্রবল শক্তি ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলন খণ্ড খণ্ড হবার উপক্রম হয়েছিল।' এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন অর্থে জাতীয় আন্দোলন খণ্ড খণ্ড হবার উপক্রম হ'ল। রজনী পাম দত্ত বলেছেন, 'এর অর্থ যদি এই হয় যে, আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সংস্কারপন্থী শান্তিবাদীদের হাত থেকে সরে আসার উপক্রম হয়েছিল, তা হ'লে সে সত্য স্বীকার করতে হবে।' গণ-আন্দোলন জোরদার হলে জাতীয় আন্দোলনের সংস্কারপন্থী শান্তিবাদী নেতাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। সেজন্যই বোধ হয় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অন্ধ্রের গুন্টুর জেলায় কৃষকেরা শান্তিপূর্ণভাবে খাজনা বন্ধের অভিযান চালিয়েছিল। তা সত্ত্বেও গান্ধীজী খাজনা বন্ধের আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। অতএব আন্দোলন সহিংস আকার ধারণ করছে অতএব তাকে প্রত্যাহার করতে হবে গুন্টুরের ঘটনাবলী এই মত সমর্থন করে না।

১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাটের লণ্ডনে প্রেরিত তারবার্তায় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতার প্রকৃতি জানা যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, অসহযোগ আন্দোলন ভারতের শহরগুলির সাধারণ মানুষকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। কোন কোন অঞ্চলে কৃষকেরাও আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সমগ্র দেশে মুসলমান জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। তিনি ভারতে মারাত্মক অবস্থা দেখা দিতে পারে বলে ব্রিটিশ সরকারকে সাবধান করে দিয়েছেন। ভারতের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে বড়লাটের মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায় যে দেশের অনুকূল অবস্থায় গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ড আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্ব দিলে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদই পরাস্ত হত তাই নয়, সেই সঙ্গে জমিদারী প্রথাও আঘাত পেত। স্পষ্ঠতই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্তবিরোধী আন্দোলনের সুযোগ গান্ধীজী গ্রহণ করেন নি।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে বারদৌলিতে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল সেটি বিশ্লেষণ করলে আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রকৃত কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই প্রস্তাবে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় জমিদার ও সরকারের প্রাপ্য কর বা খাজনা মিটিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। কর-খাজনা বন্ধ করার সঙ্গে হিংসা বা অহিংসার কোন প্রশ্ন জড়িয়ে নেই। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে প্রশ্নটি হ'ল শ্রেণী সম্পর্কের, শোষক বা শোষিতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্ত বিষয়টিকে সঠিকভাবে বিচার করা। কারণ খাজনা বন্ধকে কোনমতেই হিংসাত্মক কাজ বলা যায় না। বরং খাজনা বন্ধের আন্দোলন গণ-অসন্তোষ প্রকাশের শান্তিপূর্ণ উপায় মাত্র। এই আন্দোলনকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নামে অভিহিত ক'রে জমিদার ও সরকারকে কর ও খাজনা দেওয়াকে শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গত কাজ বলে ঘোষিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবিরোধী ব্যাপক গণ-আন্দোলনে কৃষকেরা যাতে স্থায়ী ভাবে যুক্ত না হ'য়ে পড়ে সেজন্য তাদের কর ও খাজনা বন্ধের আন্দোলনে যোগ দিতে নিবৃত্ত করা হয়েছে।

কৃষক শ্রেণী জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সামন্তবিরোধী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্ত হলে তারা নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলনের লক্ষ্য ও পদ্ধতি ঠিক করে নিত। সেজনাই বোধ হয় জাতীয় নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে চাইলেন না। জাতীয় আন্দোলনে কৃষকেরা যুক্ত হলে বিপুল গতিবেগের সঞ্চার হত। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার ফলে জাতীয় আন্দোলনের বহুমুখী সম্ভাবনা স্তব্ধ হয়ে গেল।

৬) (ডি. রদারমণ্ড লিখেছেন, গান্ধীজীর 'অসহযোগ অভিযানে প্রকৃত কেন্দ্র-বিন্দুর (focus) অভাব ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যাবার তাঁর সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে মজবুত না ক'রে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বাড়িয়েছিল।') কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হ'লে খিলাফত আন্দোলন তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র তুরস্কের সুলতান খলিফার কর্তৃত্বচ্যুতিকে কেন্দ্র করে ভাবাবেগের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে স্থায়ী করা যায় না। (হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হ'লে ঐক্যবিরোধী যে সব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণগুলি আছে তার অবসান ঘটানো দরকার। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে ভারতীয় মুসলমানের অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি স্থান পায় নি।)

৮. গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলের বিদ্রোহ

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা হলে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি প্রভাবশীল অংশের মধ্যে ভবিষ্যতে আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়। মতিলাল নেহরু, লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখেরা অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য গান্ধীজীকে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে অসহযোগ গণ-আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করে গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন অধিকতরভাবে শাসন সংস্কারের পথ সুগম করবে। মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখেরা অসহযোগ আন্দোলন সহিংস হয়ে বিপজ্জনক পথে ধাবিত হচ্ছে গান্ধীজীর এই ধরণের মতকে সমর্থন করেন নি। সেজন্য অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর প্রদর্শিত অসহযোগ আন্দোলনের বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচী অন্বেষণ শুরু করেন। ১৯১৯-এর শাসন সংস্কার আইনে নবগঠিত আইনসভাগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জয়লাভ করে আইনসভার ভিতরে গিয়ে সরকারের কাজে প্রবল বাধা সৃষ্টি করার কর্মসূচীকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিলেন। আইনসভা বয়কট না করে, আইনসভার ভিতরে গিয়ে সবকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করাব রাজনীতিকে তাঁরা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করলেন। মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশ এই কর্মসূচীর প্রবল সমর্থক হলেন। অপরদিকে রাজাগোপাল আচারীর নেতৃত্বে গান্ধীজীর সমর্থকেরা আইনসভায় প্রবেশ নীতির তীব্র বিরোধিতা করলেন।

১৯২২-এ গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে আইনসভায় প্রবেশের প্রশ্নটি প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। সভাপতি ভাষণে চিত্তরঞ্জন দাশ সমবেত প্রতিনিধিকে আইনসভায় প্রবেশনীতিকে গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু রাজাগোপাল আচারী আনীত বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। তিনি ও মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের মধ্যে 'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ দল' গঠন করেন। এই দল স্বরাজ্য দল নামে খ্যাতি লাভ করে। সংখ্যালঘু হলেও স্বরাজ্য দলের নেতারা কংগ্রেসের প্রভাবশীল নেতা ছিলেন। কারণ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কয়েকজন নেতা স্বরাজ্য দল

গঠন করেন। তাঁদের সবচাইতে বড় সুবিধা ছিল যে আইনসভায় প্রবেশনীতির বিরোধীরা কংগ্রেসের সামনে কোন বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচী পেশ করতে পারেন নি।

মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিঠলভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গঠিত স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জন করাকেই রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করলেন। এই দলের কর্মসূচীতে পুঁজিবাদ ও জমিদারী ব্যবস্থা সুরক্ষা করার আশ্বাস ছিল। স্বরাজ্য দলের সমর্থকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী-সমন্বয় এবং শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থের অভিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ভূস্বামীর স্বার্থের সম্যকরূপ প্রতিফলন ঘটেছিল স্বরাজ্য দলের কর্মসূচীতে।

অনলস প্রচার অভিযানে স্বরাজ্য দল কংগ্রেস সংগঠনে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় ১৯২৩-এর দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজ্য দল কংগ্রেস সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বরাজ্য দলের নেতাদের সঙ্গে বিরোধী নেতাদের সমঝোতার ফলে বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে যাঁরা নতুন শাসন-সংস্কার আইনে আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের বিরুদ্ধে নীতিগত আপত্তি প্রত্যাহৃত হল। অর্থাৎ স্বরাজ্য দলকে আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হল। স্বরাজ্য দল নির্বাচনী ইস্তাহারে দেশের জন্য সংবিধান রচনার দাবি জানাল। আইনসভায় তাঁদের এই দাবি সরকার অগ্রাহ্য করলে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে আইনসভার মধ্যে 'uniform, continuous and consistent obstruction' চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল 'to make government through the Assembly and Councils impossible'.

প্রবল জন সমর্থন ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৯২৩-এর নভেম্বরে স্বরাজ্য দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে স্বরাজ্য দল কার্যত নরমপন্থীদের রাজনৈতিক দলকে ভারতের রাজনীতি থেকে মুছে দিতে সমর্থ হল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমেত সর্বভারতীয় নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের পরাজয় হল। স্বরাজ্য দলের নির্বাচনী জয় ভারতীয় রাজনীতিতে নরমপন্থীদের নিষ্প্রভ করে দিয়ে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করল। স্বরাজ্য দলের সাফল্য সব প্রদেশে সমান হয় নি। সেন্ট্রাল প্রভিনসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবের আইনসভায় এই দলের বেশী সদস্য জয়লাভ করতে পারেন নি।

বাংলায় স্বরাজ্য দল আইনসভায় সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে পরিণত হল। কিন্তু এখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। বোম্বাই, উত্তর-প্রদেশ এবং আসামের আইনসভাগুলিতে স্বরাজ্য দল শক্তিশালী দলরূপে স্বীকৃত হল। বিহার এবং উড়িষ্যার আইনসভায় স্বরাজ্য দলের একজন প্রার্থীও জয়লাভ করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের ৪৮ জন সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এই দল সর্ববৃহৎ একক দলরূপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্বরাজ্য দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার এই দল স্বতন্ত্র সদস্যদের সঙ্গে কর্মসূচীভিত্তিক সমঝোতা করে। অবশ্য এই সমঝোতা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি।

১৯২৪-এর প্রথম দিকে গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তিনি ব্রিটিশের জেল থেকে মুক্তি পান। তিনি মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চালান। তাঁর মতে কংগ্রেসীদের আইনসভায় প্রবেশের সঙ্গে অসহযোগ কর্মসূচীর কোনো সামঞ্জস্য নেই। ১৯২৪-এর মাঝামাঝি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীজীর সঙ্গে স্বরাজ্য দলের নেতাদের শক্তি পরীক্ষা হয়। অসহ-যোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে সমর্থন না করলে সেই সদস্যদের কংগ্রেস সদস্যপদে অযোগ্য বলে ঘোষণা করার জন্য গান্ধীজী সুপারিশ করেন। মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে গান্ধীজীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি গান্ধীজীর প্রস্তাবকে কংগ্রেসের সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করার দাবি জানান। ভোটাভুটিতে মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব পরাজিত হলে তিনি এবং চিত্তরঞ্জন দাশ সভামণ্ডপ ত্যাগ করেন। গান্ধীজী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জনপ্রিয়তা ও রাজনৈতিক গতিশীলতা সম্পর্কে সপ্রশংস ধারণা পোষণ করতেন। সেজন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলের প্রকাশ্য বিদ্রোহকে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হতে দেন নি। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহরুর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বরাজ্য দলের বিদ্রোহকে কংগ্রেসের স্বপক্ষে নিয়ে এলেন। গান্ধীজী এবং অন্যান্য দলের নেতাদের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার মূল কথা হল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে কংগ্রেসের পক্ষে স্বরাজ্য দল কাজ করে যাবে। অবশ্য স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে উৎসাহ দিতে হবে। বিদ্রোহ দিয়ে শুরু করে স্বরাজ্য দল গান্ধীজীর পরামর্শমত কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্বীকৃতি লাভ করল।

স্বরাজ্য দলের নেতা হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন স্বাধীনতার পরিবর্তে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকেই' ভারতের রাজনৈতিক

লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ শর্তে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেন। আইনসভার ভিতরে এবং বাইরে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা নীতির প্রবক্তা চিত্তরঞ্জন দাশের মত পরিবর্তন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনেকে অমূলক-ভাবে আশংকা করেছিলেন যে চিত্তরঞ্জন বোধ হয় গোপনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। ১৯২৫-এর ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে স্বরাজ্য দলে ভাঙন শুরু হয়।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজনীতিকে সমর্থন করে, দ্বিতীয় গোষ্ঠী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে সরকারি পদলাভে আগ্রহী হয় এবং তৃতীয় গোষ্ঠীতে পুরাণো স্বরাজ্য দলের কয়েকজন থাকেন। ১৯২৬-এর নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক ব্যর্থতা প্রকাশ পায়। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে স্বরাজ্য দলে ভাঙন দেখা দেয়।

৯. স্বরাজ্য দলের মূল্যায়ন

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার পর স্বরাজ অর্জনের সংগ্রাম পদ্ধতি কী হবে তাকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। এই মতভেদ জাতীয় কংগ্রেসে দুটি ভিন্ন সংগ্রামের পদ্ধতি সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর সমর্থকেরা জাতীর কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে গান্ধীজী প্রদর্শিত গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য তাঁরা হস্তশিল্পে উৎসাহ দান, চরখায় সুতা কাটা, অস্পৃশ্যতাবিরোধী এবং মাদকদ্রব্যবিরোধী আন্দোলনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীর সমর্থকেরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচী প্রধানত শহরের মধ্যবিত্ত, কারুশিল্পী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের প্রত্যাহারে শহর ও গ্রামের মানুষ যাতে কংগ্রেস নেতৃত্বের বাইরে চলে না যায় সেই উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অভিযান শহর ও গ্রামের মানুষকে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

কংগ্রেসের মধ্যে গঠিত স্বরাজ্য দল রাজনৈতিক স্বরাজ অর্জনের বিকল্প একটি

কর্মপন্থা উপস্থিত করেছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দল গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন-সংস্কার আইনে গঠিত আইনসভাগুলির ভিতরে গিয়ে অবরোধ সৃষ্টির পন্থাকেই রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে। স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক পদ্ধতির মূল কথা ছিল গণ আন্দোলন পরিহার করা। তার অর্থ হল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণকে প্রাধান্য না দেওয়া। গান্ধীজীর কর্মনীতি হতে নিজেদের আলাদা করতে গিয়ে স্বরাজ্য পার্টির নেতারা জনগণের থেকে আরো দূরে চলে গেলেন। গান্ধীজীর নীতি হতে উন্নততর কর্মনীতি গ্রহণের অর্থই হল কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থবাহী নীতি রচনা করা। শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যপদ লাভ করে সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমালোচনা করলেই শ্রমিক-কৃষক সমেত সাধারণ মানুষের স্বার্থের নতুন ভিত্তি রচনা করা যায় না। চিত্তরঞ্জন দাশ 'শতকরা ৯৮ জন লোকের স্বরাজের' কথা বললেন। কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা ২·২ ভাগ লোককে প্রতিনিধিত্ব করে এমন নির্বাচকদের দ্বারা গঠিত আইনসভায় স্বরাজ্য দল কেমনভাবে শতকরা ৯৮ জন লোকের জন্য স্বরাজ আনতে সমর্থ হবেন?

স্বরাজ্য দল সমাজেব উচ্চশ্রেণীর রাজনৈতিক দল। এই দল যতই শতকরা ৯৮ জন লোকের স্বার্থরক্ষার কথা বলুক না কেন, আসলে উচ্চবিত্তের সমর্থন লাভের জন্য এই দলকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে তারা জমিদার ও পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করবে। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠার সময় দলীয় কর্মসূচী ও লক্ষ্য ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, 'ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তির সম্পত্তিকে স্বীকার ও সুরক্ষা করা হবে, এবং ব্যক্তিগত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হবে।' অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের আশ্বাস দেওয়া হল। স্বরাজ্য দলকে জমিদারবিরোধী রাজনৈতিক দলরূপে যাতে ভুল না বোঝে সেজন্য ঘোষণা করা হল : 'এ কথা সত্য যে, পার্টি রায়তের প্রতি ন্যায়বিচার করবে, কিন্তু সেই ন্যায়বিচারের মান নীচু হয়ে যাবে যদি জমিদারের প্রতি অবিচার করা হয়।' পরিষ্কারভাবেই বলা হল যে রায়তের প্রতি সুবিচারের অর্থ জমিদারের প্রতি কোনরূপ অবিচার না করা।

স্বরাজ্য দল সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে প্রথমে বিরোধিতা এবং পরে সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়েছিল। যদিও এই দলের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল আইনসভার মধ্যে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে 'uniform and consistent obstruction' গড়ে তোলা, তবুও কার্যত দেখা গেল ১৯২৩-এর

নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই দল স্বতন্ত্র ও উদারনৈতিক সদস্যদের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে। মনে রাখতে হবে এই উদারপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আপোসকারী নরমপন্থীদের অংশ মাত্র। কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করে স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করলেন, তাঁর দল সম্ভব হ'লে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

শতকরা ২'২ নির্বাচকের রায়কে ভিত্তি করে স্বরাজ্য দল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করল তাতে শতকরা ৯৮ জনের সার্বভৌমত্বকে কার্যত অস্বীকার করা হল। স্বরাজ্য দলের কর্মসূচীতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা গঠনের কোনো প্রস্তাব দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দল সরকারের Steel Protection Committee (১৯২৪) এবং অন্যান্য কমিটিতে অংশগ্রহণ করেছিল। দেখা গেল wrecking the legislatures from within' নীতি পরিবর্তিত হয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি ক্রমান্বয়ে গৃহীত হল।

গণ-আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হলে স্বরাজ্য দল প্রধানত সংসদীয় পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আইন-সভায় উদারনৈতিক সদস্যদের সঙ্গে সমঝোতা করলেও স্বরাজ্য দল ভারতের 'লিবারেল ফেডারেশন দল' থেকে পৃথক ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখ স্বরাজ্য দলের সর্বভারতীয় নেতারা গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও নরমপন্থীদের মত কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বাধীন রাজনৈতিক দল গঠন করেন নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বরাজ্য দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই দল নবোদিত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। সেজন্য ভারতীয় উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণ, বৃহৎ শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি দাবী ধ্বনিত করে স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ পুঁজি ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব

১. ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

ব্রিটিশ শাসন ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক গতিবেগ ছিল না। সেজন্য গুরুতর সীমাবদ্ধতা নিয়েই ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশ শুরু হয়। ইউরোপের মত ভারতে সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভারতের পুরানো সমাজ ও অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটিয়েছিল কিন্তু সেই সমাজ ও অর্থনীতিকে পরিবর্তন করে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশ ঘটায় নি। সেজন্য ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথে অনেক বাধা বিপত্তি দেখা দিয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টি পুনরুজ্জীবনমূলক ভূমিকা। ধ্বংসাত্মক ভূমিকায় ব্রিটিশ শাসন ভারতের পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসন ভারতে নতুন যুগের উপযোগী এক বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিল। ভারতকে একটি রাজনৈতিক সূত্রে গ্রথিত করে, ভারতকে বিশ্বের ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে, ভারতে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, এই বিশাল দেশে পুনরুজ্জীবনের কাজ করেছিল। এরই ফলস্বরূপ আধুনিক শ্রমশিল্পের গোড়াপত্তন হয় এবং শ্রমিক ও কর্মী গড়ে ওঠে। এই সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতে নতুন যুগের উপযোগী বাস্তব ভিত্তি তৈরী করেছিল।

ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্রিটিশ ভারতে সামন্ত ও আধা-সামন্ত শক্তিগুলির সঙ্গে মিতালি করেছিল। এই শক্তিগুলিকে জিইয়ে রাখা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও প্রশাসনিক স্বার্থে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন, ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও শিল্পে পুঁজি নিয়োগ ভারতে নতুন শ্রেণী উদ্ভবের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। এই

যুগান্তকারী পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক ফল হল ভারতে নতুন দু'টি শ্রেণীর উদ্ভব: বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী। প্রধান দু'টি শ্রেণী মাঝখানে উদ্ভব ঘটেছিল ধনী-মাঝারি-গরীব-ভূমিহীন কৃষকের। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে জমিদার, জোতদার মুৎসুদ্দি ও আরও অনেক আধা-সামন্ত স্তরের উদ্ভব ঘটেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

ভারতে রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব। ১৮৫৩-এ প্রথম রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর সারা ভারতে সামরিক স্বার্থে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ব্যাপকভাবে রেলপথ প্রবর্তন করা হয়। রেলপথ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। কার্ল মার্কস বলেছেন: 'এই রেলপথই হবে ভারতের সত্যিকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।' রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গেই ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রেলপথের সহায়ক শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। রেলপথ ও আনুষঙ্গিক শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। বহু শত শ্রমিক রেলপথ নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত হয়েছিল।

রেল চলাচলের অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল হল কয়লা। সেজন্য দেখা যায় রেলপথ নির্মাণের পাশাপাশি কয়লাখনি শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছিল। কয়লাখনি শিল্পে বহু সহস্র শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবে কয়লাখনি শিল্পের অবদান যথেষ্ট। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক সহায়ক শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। কাঁচামালের সরবরাহ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য জলপথে জাহাজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। জলপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাহাজ পরিবহন এবং জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তার ফলে জাহাজ শিল্পে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

ব্রিটিশ পুঁজি ভারতের বাগিচা শিল্পে নিয়োগ করা হয়। ইউরোপে ভারতীয় চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ পুঁজি পূর্বভারতের চা বাগিচায় বিনিয়োগ করে প্রভূত মুনাফা লাভে সমর্থ হয়। বাগিচা শিল্পে বহু সহস্র শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (contract labour) বলা হত। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থা হয়ত দাসশ্রমিকের চেয়ে সামান্য

উন্নত ছিল। ব্রিটিশ পুঁজির অধীনে গড়ে ওঠা বাগিচা শিল্পে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের অবস্থা প্রায় আধা-দাস শ্রমিকের মত ছিল। ১৮২৯-এ ব্রিটিশ মালিকানায় প্রথম আসামে চায়ের কোম্পানি স্থাপিত হয়।

পাট শিল্পে ব্রিটিশ মূলধন প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়। পাটশিল্প বিকাশের প্রথমদিকে ব্রিটিশ পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৪-এ কলকাতার কাছে হুগলী জেলার রিষড়ায় ব্রিটিশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রথম পাটশিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়। পাটশিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ মূলধন খাটতে থাকে। পাটশিল্প দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে শিল্প শ্রমিকের উদ্ভব হয়।

ভারতীয় উদ্যোগে পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগ বিকাশে বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে ভারতীয় শিল্প মালিকদের বিকাশ ঘটে। বাংলায় কাঁচা পাটের উৎপাদন সব চাইতে বেশি হওয়ায় এখানে পাট-শিল্পের বিকাশ কেন্দ্রীভূত হয়। ঠিক তেমনি পশ্চিম ভারতে তুলোর চাষ সব-চাইতে বেশি হওয়ায় মহারাষ্ট্রে ভারতীয় উদ্যোগে বস্ত্রশিল্পগুলি গড়ে ওঠে। ১৮৫৪-এ বোম্বাইতে ভারতীয় উদ্যোগে প্রথম বস্ত্রশিল্প স্থাপিত হয়। পাট এবং তুলোকে কেন্দ্র করে ভারতে ব্যাপকভাবে পাটশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটে। এই সঙ্গে এই দু'টি প্রধান শিল্পে বহু সহস্র শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। আধুনিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবে পাট ও বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর ভারতের ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন আসে। মহাবিদ্রোহের পর ভারত প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। তার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের যুগ শেষ হয় এবং ব্রিটিশ শিল্প বুর্জোয়ার প্রাধান্য ভারতে শুরু হয়। ব্রিটিশ শিল্প বুর্জোয়ার নেতৃত্বে ভারতে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটলে এদেশে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি এবং জমিদারের একটি অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করে। অতএব ব্রিটিশ শিল্প বুর্জোয়ার উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা নানা রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংস্থাগুলিতে বহু সহস্র কর্মী ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। ভারতে আমদানী করা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয়রা অংশগ্রহণ করেছিল। তার ফলে এই সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল।

ভারতের কাঁচামাল এবং সস্তা মজুরী ব্রিটিশ শিল্পপুঁজিকে এদেশে কলকারখানা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাট, কয়লাখনি, চা বাগিচা ইত্যাদি শিল্পে ব্রিটিশ মূলধন লগ্নী করা হয়েছিল। ব্রিটিশ মূলধন লগ্নীর কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল কলকাতা শহর, অপরদিকে ভারতীয় মূলধন লগ্নীর কেন্দ্রস্থল হয়েছিল বোম্বাই শহর। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বড় বড় শিল্পসংস্থা গড়ে উঠেছিল প্রধানত ব্রিটিশ মূলধনে। সেজন্য দেখা গেল সারা ভারতে জলপথে শিল্পপণ্য আমদানি-রপ্তানি করার জন্য কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তিনটি বন্দর গড়ে ওঠে। বন্দর তিনটিকে কেন্দ্র করে বন্দর শহর গড়ে ওঠে। এই সঙ্গে বহু সহস্র শিল্প শ্রমিকের উদ্ভব ঘটে। এক জায়গায় বহু সহস্র শ্রমিকের অবস্থান তাদের মধ্যে সংগঠিত চেতনার উন্মেষ ঘটাল।

ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী উদ্ভবের সময়কে ১৮৫০ থেকে ১৯০০-এর মধ্যবর্তী পঞ্চাশ বছরকে মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা যায়। বিশ শতকে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক ভাবে উদ্ভবের বাস্তব ভিত্তি রচিত হয়। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ শুধু যে ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করেছিল তাই নয়, বঙ্গবিভাগ ভারতীয় উদ্যোগে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন এবং দেশী পণ্যদ্রব্য ক্রয়কে রাজনৈতিক রণধ্বনিতে পরিণত করা হয়েছিল। বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন করে ব্যাপকভাবে দেশী পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের রাজনৈতিক আহবানকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলন বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য সারা ভারতে ব্যাপকভাবে বর্জন করা হয়। এই সময় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে ভারতীয় বুর্জোয়ার উদ্যোগে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেইসময় ভারতীয় উদ্যোগ ও মূলধনে কলকারখানা, ব্যাংক ও বীমাশিল্প গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০৮-এ টাটাদের উদ্যোগে বিখ্যাত ইস্পাতশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়।

ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপন্ন সূতীবস্ত্র বয়কট আন্দোলন ভারতীয় বুর্জোয়ার সামনে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে ভারতীয় উদ্যোগ ও মূলধনে বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং বাংলার কিছু অংশে সূতীবস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠে। বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন এবং দেশী পণ্য ক্রয়ের আন্দোলনের ফলে সারা ভারতে দেশীয় উদ্যোগ ও মূলধনে ১৭৮ সূতাকল গড়ে উঠেছিল। তার ফলে এই সব কলকারখানায় বহু সহস্র শ্রমিক নিযুক্ত হয় এবং ভারতের শ্রমশিল্পে শ্রমিক শ্রেণীর

উদ্ভবের পটভূমিকে সম্পূর্ণ করে। অবশ্য সুতাকল ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানেও বহু সহস্র শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছিল।

ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের তাগিদে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের সূচনা হয় এবং স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগে গঠিত কলকারখানায় বহু সহস্র শ্রমিক নিয়োগের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, ইউরোপ এবং ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের পটভূমি হুবহু এক ধরনের নয়। যদিও শ্রমিক শ্রেণী উদ্ভবের পটভূমি সবদেশেই সমান। ইউরোপে পুঁজিবাদের অগ্রগতিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের হস্তশিল্পী ও কারিগরেরা তাদের পেশাগত বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়। কারণ বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের কলকারখানার সঙ্গে ছোট ছোট পেশাগত উৎপাদনী সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতায় একেবারে পিছনে পড়ে যায়। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের হস্তশিল্পী ও কারিগরেরা বড় বড় শহরে যন্ত্রশিল্পের কলকারখানায় নিযুক্ত হয়ে যায়। নতুন কলকারখানায় তারা যখন যোগ দেয় তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের পেশাগত দক্ষতা।

ভারতে শ্রমিক শ্রেণী উদ্ভবে ইউরোপের এই প্রক্রিয়াটি দেখা যায় না। ভারতে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল একান্তভাবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে। ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ ইংলণ্ড ও ইউরোপের মত সম্পূর্ণ হয় নি। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্রিটেন ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল সত্য কথা। কিন্তু ভারতের প্রাক্-পুঁজিবাদী সামন্ত ও আধা-সামন্ত ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে মিতালি ক'রে পুঁজিবাদী যাত্রা শুরু হয়েছিল। এদেশের প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের হস্তশিল্পী ও কারিগরেরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আঘাতে দ্রুত বৃত্তিচ্যুত হয়ে শহরের কলকারখানায় চাকরি না পেয়ে গ্রামে গিয়ে কৃষিশ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল। ফলে ভারতীয় হস্তশিল্পী ও কারিগরেরা তাদের পেশাগত দক্ষতা হারিয়ে ফেলল। রেলপথ এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজির লগ্নীতে যখন কলকারখানা গড়ে উঠল সেই সময় গ্রাম থেকে দু'পুরুষ আগে পেশাচ্যুত হস্তশিল্পী ও কারিগরেরা শহরে এসে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হল। এই সব শ্রমিকের কোন পেশাগত দক্ষতা

ছিল না। উপরন্তু দীর্ঘদিন গ্রামে বসবাসের ফলে এসব মানুষেরা গ্রাম্য অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সেজন্য দেখা যায় গ্রাম থেকে দলে দলে শহরের কলকারখানায় আসা শ্রমিকরা ধর্মীয় কুসংস্কার এবং আচার আচরণের প্রভাব থেকে নিজেদের একেবারেই মুক্ত করতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং আধা-সামন্ত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ভারতের নতুন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ অনেক দেরীতে ঘটেছিল। কারণ এইসব অন্ধ বিশ্বাস রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে সংস্কার-পন্থী চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব শ্রমিকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তৃতীয়ত, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধর্ম, অঞ্চল ও জাতপাতের প্রভাব প্রথম যুগে দেখা গিয়েছিল। ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ সর্বত্র সমানভাবে হয় নি। কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে পুঁজিবাদ ও শ্রমশিল্পের বিকাশ ঘটায় শ্রমিকশ্রেণী এই সব অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশ না হওয়ায় সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প।

২. শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা

ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতির নির্মম শোষণে এদেশের শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। ভারতে শিল্পবিকাশের প্রথম পর্বে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রমিককে কারখানায় কাজ করতে হত। ভারতীয় ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের (Indian Factory Labour Commission) প্রতিবেদনে জানা যায় যে, আমেদাবাদে প্রতিদিন গড়ে একজন শ্রমিককে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হত। কোন কোন শিল্পে শ্রমিককে চোদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করা হত। বোম্বাই-এর মিলগুলিতে গড়ে বারো ঘণ্টা করে খাটানো হত। বিদ্যুৎপরিচালিত বহু সুতাকলের কারখানায় শ্রমিককে তেরো থেকে পনেরো ঘণ্টা কাজ করতে হত। লেবার কমিশনের প্রতিবেদনে আরো জানা যায় যে, আগ্রায় শ্রমিকের কাজের সময় ছিল প্রতিদিন তেরো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে পনেরো ঘণ্টা পনেরো মিনিট পর্যন্ত। অমৃতসর ও লাহোরে গড়ে প্রতিদিন প্রায় তেরো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা শ্রমিককে কারখানায় খাটতে হত। কলকাতার সন্নিকটে ব্রিটিশ পুঁজি পরিচালিত পাটকলগুলিতে শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা আরো বেড়েছিল।

এখানে শ্রমিককে প্রতিদিন পনেরো থেকে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হত। ১৯০৮-এ প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের' প্রতিবেদনে শ্রমিকের নির্মম শোষণ ও মাত্রাতিরিক্ত কাজের ঘণ্টার কথা জানা যায়।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজের সময়ের অর্থ হল যতক্ষণ পর্যন্ত সামান্যতম দিনের আলো থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিককে কাজ করতে হত। বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তনের পর ভারতের কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকের কাজের সময় আরো বেড়ে গেল। ১৯০৬-এর 'টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিজ কমিটির' (Textile Factories Committee 1906) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তনের ফলে ভারতের কলকারখানায় শ্রমিকের কাজের সময় অত্যধিক বেড়েছিল। ভোর পাঁচটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত কলকারখানার যন্ত্রগুলিকে অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাওয়া হত। অর্থাৎ শ্রমিককে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত একই মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে হত।

বস্ত্র শিল্পে শ্রমিকের অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়েছিল। ১৯০৮-এর 'ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের' প্রতিবেদনে বস্ত্র শিল্পে শ্রমিকের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব শিল্পে প্রতিদিন সতেরো থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিককে কাজ করতে হত। এই প্রতিবেদনে আরো জানা যায় যে, ময়দা উৎপাদনের কারখানাগুলিতে শ্রমিককে মাঝে মঝে কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হত। মুদ্রণ শিল্পে একটানা সাত দিন পর্যন্ত শ্রমিককে খাটানো হত। ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের প্রতিবেদনে শিশু শ্রমিকের অত্যধিক খাটুনির কথা বলা হয়েছে। চোদ্দ বছরের নীচের শিশুকে প্রতিদিন দশ থেকে চোদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হত। আরো অল্প বয়স্ক শিশুকে অর্ধেক দিন কাজে লাগানোর নামে নির্মমভাবে খাটিয়ে নেওয়া হত।

উনিশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম ভারতের জনৈক শিল্পপতি তাঁর নিজের কারখানার শ্রমিকের কাজের সময় বর্ণনা করে বলেছেন, সাধারণ অবস্থায় ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে মেশিন চালানো শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মেশিনের চাকা রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত চলতে থাকে। সেইসঙ্গে শ্রমিকের কাজও চলে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মেশিনের চাকা চালানো হয়। দ্বিপ্রাহরিক আহারের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। মেশিন চলা অবস্থায় আহারের জন্য শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু সেই সময় অন্য শ্রমিক মেশিন চালনায় সাহায্য করত। উৎপাদনের চাপ থাকলে মাঝরাত

পর্যন্ত মেশিনের চাকা চালানো হত। সেই সঙ্গে শ্রমিককে কাজ করে যেতে হত। এইভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে আটদিন কাজ করার পর কর্মরত শ্রমিকের দলটি ক্লান্তি ও দুর্বলতায় ভেঙে পড়লে নতুন একদল শ্রমিককে সেই জায়গায় আনা হত। শিল্পপতি নিজেই স্বীকার করেছেন, অত্যাধিক খাটুনির ফলে অধিকাংশ শ্রমিক অকালে মারা যেত।

১৯০৮-এর ভারতীয় ফ্যাক্টরী শ্রমিক কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে একজন মিল ম্যানেজার বলেছেন, শিল্প শ্রমিকের একটানা কাজের সময়ের চেয়ে সেই কাজ বন্টনের পদ্ধতি আরো খারাপ ছিল। কারণ অনেক দূর থেকে ভোর চারটে, সাড়ে চারটের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়া এবং সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আবার বহুদূরে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত ক্লান্তিদায়ক ব্যাপক ছিল। এইভাবে শিল্প শ্রমিককে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় সারা বছরের নানাসময়ে যন্ত্রের মত হাজিরা দিয়ে আবার রাতের বেলায় ফিরে যেতে হত।

ভারতের শ্রমশিল্প বিকাশের আদিযুগে নারী ও শিশু শ্রমিকদের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। নির্মম শোষণ এবং অমানবিক কাজের পরিবেশ থেকে তারাও রেহাই পায় নি। সর্বত্র দশ বছরের নীচে শিশুদের নির্মমভাবে খাটিয়ে নেওয়া হত। ১৯০৮-এর ভারতীয় ফ্যাক্টরী শ্রমিক কমিশনের প্রতিবেদনে জানা যায়, কলকারখানাগুলিতে কর্মরত মোট শ্রমিকের শতকরা ত্রিশ ভাগের বেশি ছিল শিশু শ্রমিক। কলকাতার আশেপাশের পাটশিল্পগুলির কারখানায় শিশু শ্রমিকেরা তিন চার মাইল পায়ে হেঁটে সূর্য ওঠার আগে হাজিরা দিত। বেশি রাত পর্যন্ত নারী শ্রমিককে কারখানায় কাজ করতে হত। ফলে তাদের স্বাস্থ্য অকালে ভেঙে পড়ত। লেবার কমিশনের প্রতিবেদনে জানা যায়, বহু নারী শ্রমিক দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কোলে নিয়ে কারখানায় কাজ করত।

`১৯৩১-এর 'রয়্যাল কমিশন অন লেবার ইন ইণ্ডিয়ার' (Royal Commission on Labour in India 1931) প্রতিবেদনে উনিশ শতকের শেষ ভাগ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে কলকারখানায় শ্রমিকদের কী অত্যাধিক পরিশ্রম করতে হত সেকথা স্বীকৃত হয়েছে। দিনের পর দিন বস্ত্রশিল্পে পনেরো ঘণ্টা পর্যন্ত খাটুনির পর শ্রমিকরা দৈহিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ত। যতক্ষণ না তারা অক্ষম হয়ে পড়ত ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হত। কাজে অক্ষম হয়ে পড়লেই সেই শ্রমিককে ছেঁড়া কাপড়ের মত পরিত্যাগ করে নতুন শ্রমিককে নিয়োগ করা হত। এই রকম ভয়াবহ পরিবেশে শ্রমিককে কাজ করতে হত।

ভারতের বাগিচা শিল্পগুলিতে শ্রমিকের অবস্থার সঙ্গে শুধুমাত্র আধা-দাসত্বের তুলনা চলে। ব্রিটিশ সরকার প্রণীত কুলি আইনের দ্বারা বাগিচা শিল্প শ্রমিকের অমানবিক কাজের শর্ত নির্ধারিত হত। ভারতের বিরাট বিরাট চা-বাগিচাগুলিতে সভ্য দেশের কোন আইন প্রবেশ করতে পারে নি। বাগিচাগুলির ব্রিটিশ মালিকের স্বৈরাচারী মর্জির উপর শ্রমিকদের সব কিছু নির্ভর করত। একবার বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত হয়ে গেলে শ্রমিক ব্রিটিশ মালিকের সম্পত্তিতে পরিণত হত। শ্রমিকের বাগিচা ত্যাগ করার কোন অধিকার ছিল না।

১৮৫৯-এর আইন অনুসারে চা-বাগিচার শ্রমিক মালিকের সঙ্গে চাকুরির চুক্তি ভঙ্গ করলে সে ফৌজদারী বিধিতে অপরাধী সাব্যস্ত হত এবং তাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হত। ১৮৮১-এর চা বাগানের শ্রমিক সংক্রান্ত আইনকে Hindu Patriot পত্রিকা 'veritable slave Act' বলে বর্ণনা করে। এই আইনে চা-বাগিচার ম্যানেজার কর্মরত শ্রমিককে বাগিচার পাঁচ মাইলের ভেতর দেখতে পেলে তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করে কাজে যোগদানে বাধ্য করতে পারত। কার্যক্ষেত্রে চা-বাগিচার ম্যানেজার শ্রমিকের উপর দাস প্রভুদের মত আচার-আচরণ করত।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসামের চা-বাগিচায় গিয়ে শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করে 'সঞ্জীবনী' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখেন। দ্বারকানাথের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, আসামের চা-বাগিচায় শ্রমিককে বলপূর্বক আটকে রাখার জন্য অন্ধকার কারাকক্ষ ছিল। চা-বাগিচা শ্রমিকের নির্দিষ্ট কাজের সময় এবং মজুরি ছিল না। সব কিছু নির্ভর করত ব্রিটিশ মালিকের খেয়াল খুশির উপর। আইনে অবশ্য বাগিচা শিল্পশ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়ে থাকলেও উনিশ শতকের চা-বাগিচার মালিকরা কোন আইন মানত না।

শ্রমিকের কাজের শর্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে তার মজুরি। শ্রমশিল্প বিকাশের প্রথম যুগে শ্রমিককে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে হত। ভারতে পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প এবং তুলাশিল্প বিকাশের প্রথম দিকে শ্রমিকের মজুরি সংক্রান্ত তথ্য অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে কী নিদারুণ অল্প মজুরিতে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়েছিল। সরকারি প্রতিবেদনে জানা যায় উনিশ শতকের শেষের দিকে পাটশিল্পে অদক্ষ শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরি ছিল সাড়ে চোদ্দ আনা থেকে তিন টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ছিল পাঁচ থেকে সাত টাকা। ১৮৯২-তে

কলকাতার কাছাকাছি তুলাকলের শ্রমিকের মাথা পিছু সাপ্তাহিক মজুরি ছিল ছ' টাকা। সরকারি প্রতিবেদনে জানা যায় যে, কুলি শ্রমিকের মাসিক মাইনে ছিল সাত টাকা।

১৮৮৭-তে বোম্বাই-এর তুলাকলে পুরুষ শ্রমিকের মাসিক মজুরি ছিল কুড়ি টাকা এবং নারী শ্রমিকের মাত্র ন'টাকা। গড়ে তুলাকলের শ্রমিকের মাসিক মজুরি দাঁড়িয়েছিল এগারো টাকায়। ভারতের মজুরি হারের তারতম্য সর্বত্র দেখা যেত। আমেদাবাদের মিলগুলিতে গড়ে মাসিক মজুরির হার ছিল দশ টাকা। আরেকটি প্রতিবেদনে জানা যায় যে, আগ্রা ও কানপুরের তুলাকলে শ্রমিকের গড়ে মাসিক মজুরির হার ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা। শ্রমশিল্প বিকাশের প্রথম যুগে শিশু শ্রমিক ও নারী শ্রমিকের মজুরির হার আরো কম ছিল। ১৮৯০-এর 'ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীস কমিটির' (Indian Factories Committee, 1890) সংগৃহীত তথ্যে জানা যায় যে, নারী শিশু শ্রমিকের মাসিক মজুরির হার ছিল পাঁচ টাকা, বালকের ছ' থেকে সাত টাকা এবং নারী শ্রমিকের দশ থেকে বারো টাকা।

ভারতের শ্রমশিল্প বিকাশের প্রথম যুগে শ্রমিকের বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। শ্রমিককে বাধ্য হয়ে প্রায় গবাদি পশুর মত থাকতে হত। উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত শিল্প শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় শ্রমিকের বেশির ভাগ গ্রাম ছেড়ে শহরের কল-কারখানায় কাজ নিয়েছিল। কলকারখানাগুলির আশেপাশে গড়ে ওঠা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে শ্রমিকরা জীবন কাটাত। বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদনে জানা যায় যে, উনিশ শতকের শেষের দিক পর্যন্ত শ্রমিককে সপরিবারে একটিমাত্র ঘরে রাখার কোন ব্যবস্থা হয় নি। অনেক সময় দু'টি পরিবার একটি মাত্র আলো বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকতে বাধ্য হত। তার ফলে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটত। ১৯১১-এর ভারতীয় আদম সুমারির তথ্যে জানা যায় যে, বোম্বাই-এর শতকরা ৬৯ ভাগ জনসংখ্যা একটিমাত্র অস্বাস্থ্য-কর ঘরে বাস করত। আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯১১-এর আদম সুমারি থেকে কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হলেও বাসস্থানের দুরবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। ১৯৩১-এর ভারতীয় আদম সুমারির তথ্যে জানা যায় যে, বোম্বাই শহরে জন-সংখ্যার শতকরা ৭৪ ভাগ এক কামরাবিশিষ্ট বাসস্থানে থাকতে বাধ্য হ'ত।

ভারতের শ্রমশিল্প বিকাশের প্রথম পর্বে শ্রমিকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। শ্রমিকের কাজের সময়, মজুরি, বাসস্থান সমেত সামগ্রিকভাবে কাজের অবস্থা ও

পরিবেশ শ্রমিক স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকের অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ।

৩. শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব

ক. শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্বের উদ্ভব: ১৮৫০-১৯১৪

ভারতে পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থার যুগ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নভাবে কলকারখানা গড়ে উঠলেও ১৮৫০-এর পরের যুগকে ভারতের আধুনিক শিল্পবিকাশের প্রথম যুগ বলা হয়। যন্ত্রশিল্প ব্যবস্থা আবির্ভাবের ফলেই আধুনিক ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সেজন্য ১৮৫০ সাল থেকে যে যুগ আরম্ভ হল সে যুগকে শিল্প শ্রমিকের যুগ বলা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করলেও একেবারে ভেঙে ফেলে নি। সেজন্য দেখা যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলে ভারতের জমি থেকে বিচ্যুত অথবা কুটিরশিল্প থেকে বিতাড়িত বেশ কিছু কৃষক ও কারিগর শিল্পশ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে ব্রিটেন শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করে জন্মগত পেশাভিত্তিক সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করেছিল এবং সেই সঙ্গে ভারতে নতুন শ্রেণী উদ্ভবের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। ১৮৫০-এর আগেও বিক্ষিপ্তভাবে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনে সংগঠন অথবা চেতনা তেমন দেখা যায় নি। ১৮২৭-এ ব্রিটিশ শাসকেরা কলকাতার পালকিবাহকদের মজুরি বেঁধে দেবার জন্য আইন প্রণয়নে অগ্রণী হল। সরকারী আইন চালু হবার আগেই পালকিবাহকদের বিক্ষোভ সংগঠিত রূপ নেয়। ১৮২৭-এর মে মাসে কলকাতার ময়দানে পালকিবাহকেরা মজুরি সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের প্রথম সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সর্দার পাঁচু সুর। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাহরি। পালকিবাহকদের আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিল গাড়োয়ান এবং ঘাট মাঝিদের নেতারা।

পালকিবাহকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার মজুরি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ণ করল। প্রতিবাদস্বরূপ পাড়ায় পাড়ায় ঘরোয়া সভা করে পালকিবাহকেরা বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হল। সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার কয়েকদিন

পরে কয়েক হাজার পালকিবাহক লালবাজার পুলিস দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। এই সঙ্গে পালকিবাহকেরা একটি সংগঠন গড়ে তুলল। তারা শপথ গ্রহণ করে ঘোষণা করল যে, লাইসেন্স গ্রহণের আইন বাতিল না করলে পালকি বহন করা হবে না। সোজা কথায়, পালকিবাহকেরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যথাস্থানে দরখাস্ত পাঠিয়ে কোন ফল না হলে শেষ পর্যন্ত পালকি-বাহকেরা এক মাসেরও বেশি সময় ধর্মঘট চালিয়েছিল। পালকি ধর্মঘট সফল না হলেও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মঘট একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে সমাজসেবামূলক ও সংস্কারপন্থী কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শ্রমিকের মধ্যে কিছু কাজ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলায় শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকের মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজ শুরু করেন। ১৮৬৬-এর নভেম্বরে তাঁর উদ্যোগে শ্রমিকদের একটি সভা হয়। ১৮৭০-এ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রমজীবী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা এই প্রথম। ১৮৭১-এ তিনি ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে বিভিন্ন সভায় ভারতের শ্রমজীবীদের দুরবস্থার উপর বক্তৃতা করেন। ভারতের জনগণের উন্নতির জন্য যে কোন আন্দোলনে ব্রিটিশ জনগণ যাতে সাড়া দেয় সেইজন্য তিনি আবেদন জানান। তার ফলে লণ্ডন ব্রিষ্টল, বার্মিংহাম, এডেনবার্গ, গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি শহরে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়।

ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের বহু দশক পরেও কলকারখানায় কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেবার কোন আইন ছিল না। কিন্তু সেই সময় ইংলণ্ডের শ্রমিকদের জন্য কাজের ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে আইন তৈরী করা হয়েছিল। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে এ সব নিজের চোখে দেখেছিলেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন সভায় তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদের জন্য প্রণীত আইনগুলি ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও যাতে প্রবর্তিত হয় সে দাবিও করেছিলেন। ১৮৭২-এ ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে শ্রমজীবী মানুষের জন্য তিনি কাজ আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা মূল্যের একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা যথেষ্টভাবে বেড়েছিল এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে এর চাহিদা দেখা দিয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনে তিনি সংগ্রামমুখী ধর্মঘটের পরিবর্তে

আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে শ্রম-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন।

ভারতে রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক যুগ পরে রেল শ্রমিকরা ইতিহাস সৃষ্টি করল। ১৮৬২-এর মে মাসে হাওড়ার রেলওয়ে স্টেশনের প্রায় বারো'শ শ্রমিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করল। এ ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এল বাংলাদেশের সংবাদপত্র। সংবাদপত্র রেল কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকের দাবী মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করল। যদি সংবাদপত্রের এ অনুরোধ কর্তৃপক্ষ মেনে না নেয় তবে নতুন লোক নিয়োগ করার ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হল। এই বছরে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হিসাবরক্ষা বিভাগের বড় সাহেব বাঙালী করণিকদের অপমান করলে কর্মচারীরা পরের দিন ধর্মঘট করে এবং অফিসের সামনে বিক্ষোভ জানায়। শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভের সামনে সাহেবকে নতি স্বীকার করতে হয়।

১৮৭৩-এ বোম্বাইয়ের প্রেস কম্পোজিটারদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। এ ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রবল দমন নীতি চালায় এবং ধর্মঘট ভাঙার জন্য মাদ্রাজ থেকে লোক আমদানি করে। শ্রমিক আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু প্রকার কৌশল ও দমননীতি প্রয়োগ করে শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি।

১৮৮০ পর্যন্ত সময় কালকে ভারতের পুঁজিবাদী শিল্পবিকাশের প্রথম যুগ বলা যায়। এই সময়ে বাংলা, আসাম, বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সবেমাত্র কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। সংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণী তখনও ছিল অতি সামান্য। রেলপথ ও আধুনিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গেই শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা শুরু হয়। তবুও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রমিক চেতনা তখনও পর্যন্ত উদিত হয় নি। ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৮৮০-এর পর থেকে। ১৮৯০-এর এপ্রিলে বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের একটি সমাবেশ হয়। এটাই ছিল সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা। এই সভায় বোম্বাইয়ের দশ হাজার বস্ত্রশিল্প শ্রমিক উপস্থিত ছিল। এই সভায় গৃহীত স্মারকলিপিতে কারখানা আইনের সংশোধন এবং সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবি করা হয়েছিল। সংগঠিতভাবে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকেরা এই প্রথম সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবি করল।

দাবি আদায়ের জন্য বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকেরা 'বোম্বে মিলহ্যাণ্ডস

এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে। এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হলেন যথাক্রমে এন, এম, লোখান্দে ও ডি, সি, আঠেরী। সমিতির পক্ষ থেকে মারাঠী ভাষায় 'দীনবন্ধু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এন, এম, লোখান্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু লোখান্দের কার্যকলাপকে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন বললে অত্যুক্তি করা হয়। কারণ লোখান্দের 'বোম্বাই মিল মজুর সংঘ' আসলে শ্রমিক সংগঠন ছিল না। এই সংঘের নির্দিষ্ট সভ্য, তহবিল, নিয়মকানুন কিছুই ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন বলতে যা বোঝায় লোখান্দের 'বোম্বাই মিল মজুর সংঘ' ঠিক তার আওতায় পড়ে না।

শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে কারখানা আইনের প্রবর্তন, সপ্তাহে একদিন ছুটি, মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিগুলিকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট পরিচালনা করা হত। এই সব দাবিতে ধর্মঘট করা শ্রমিকদের পক্ষে তখন খুব সহজ ছিল না। এরই মধ্যে শ্রমিকদের অগ্রগামী অংশ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে যথার্থ সাহস দেখিয়েছিল। বোম্বে মিল মালিক সমিতি কারখানা শ্রমিকদের জন্য যে নিয়মাবলী রচনা করেছিল তাতে বলা হয়েছিল, যে সব ব্যক্তি ধর্মঘট করবে বা অন্যকে ধর্মঘটে যোগদানে উৎসাহিত করবে তাদের তখনই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে এবং তাদের পাওনা বেতন বাজেয়াপ্ত করে আইনসম্মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৮৮০ পর্যন্ত মালিক শ্রেণীর যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আইনগত কোন রক্ষাকবচ ছিল না। ভারতীয় দণ্ডবিধির সাহায্যে মিল মালিকেরা আদালতের মাধ্যমে শ্রমিকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারত। ভারতের উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের মারফত ১৮৮১ এবং ১৮৯১-এর ফ্যাক্টরী আইন দু'টি আদায় করেছিল। যার ফলে শ্রমিকশ্রেণী কিছুটা অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হল।

১৮৯০-এ ভারতে প্রথম সুতাকল শ্রমিকদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৮৯৬-এ জি আই পি রেলওয়ে সিগনেলার্সদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর ভারত ও ব্রহ্মদেশ রেলকর্মচারীদের 'এমালগেমেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সারভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া এণ্ড বার্মা'র জন্ম হয়। সারা ভারতে রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। ১৮৯৫-এ বাংলাদেশে চটকল শ্রমিকেরা 'ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন' গঠন করে। অবশ্য এই ইউনিয়ন গঠনের প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন জনৈক বাঙালী ব্যারিস্টার।

১৯০৫ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন এক গণভিত্তিক পরিধিতে বিস্তৃত হয়। শ্রমিক শ্রেণী ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এই সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা ঘোষণা করলে জাতীয় আন্দোলনের বারুদের স্তূপে যেন দেশলাইয়ের কাঠি এসে পড়ে। জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী ও নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রায় বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের সংগ্রামমুখী আন্দোলনের নেতারূপে আবির্ভূত হন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের সূচনা পর্বে চরমপন্থী নেতারা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বিপিনচন্দ্র, তিলক এবং লাজপত রায় শ্রমিক আন্দোলনে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান।

১৯০৫-১৯০৮-এর স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের কল-কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল। কোন কোন ধর্মঘট প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এই সব ধর্মঘট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন চরমপন্থী নেতারা। বোম্বাই ও বাংলাদেশের চরমপন্থী নেতারা সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে শুধু যুক্তই ছিলেন না, তাঁরা শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলায় সহায়তা করেছিলেন। বোম্বাইয়ের সংগ্রামমুখী চরমপন্থী নেতারা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ও কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে সভা সমাবেশ সংগঠন করেন।

চরমপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠাব আগে থেকেই বাল গঙ্গাধর তিলক বোম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৯৬-এ মহারাষ্ট্রের জি আই পি রেলওয়ে সিগনেলার্সদের যে ইউনিয়নটি গঠিত হয় তার পুরোভাগে ছিলেন তিলক। ১৮৯৯-এ সিগনেলার্স শ্রমিকেরা ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালন করে। তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা সরাসরি এই ধর্মঘটের সমর্থনে সোচ্চার হয়। তাঁর উদ্যোগে ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়। এই সময় থেকে তিলক প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বোম্বাইয়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫—১৯০৭-এ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সরকারের ডাক, প্রেসকর্মী ও রেলকর্মী এবং বেসরকারী সুতাকল-বস্ত্র-চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে কলকাতা করপোরেশনের ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট প্রবল আকার ধারণ করে। এই সব ধর্মঘট-

গুলো নিছক অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯০৫-এ ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রেস কর্মচারীরা সফলভাবে ধর্মঘট করে। প্রেসকর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে শ্রমিক ধর্মঘটগুলিকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। ১৯০৫-এ বোম্বাই-এর একটি বস্ত্রকলের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পুলিশ শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে এবং অনেককে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে। বালক শ্রমিকদের উপর বেত্রাঘাত করা হয়। ১৯০৬-এ জামালপুরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ সরকার নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ১৯০৮-এ জুলাইয়ের শুরুতে কলকাতার কাছে কাঁকিনাড়া জুট মিলের শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা করে। ১৯০৬-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ধর্মঘটী শ্রমিকদের যে ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার পুরোভাগে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। ১৯০৫–১৯০৭ সালে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট ও মজুরি বৃদ্ধি এবং ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের নেতাদের গভীর যোগ ছিল।

ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দেয় ১৯০৮-এ। ১৯০৮-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলে তার প্রতিবাদে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের রাজপথে পুলিশের সঙ্গে ব্যারিকেড লড়াই হয়। তিলকের মুক্তির দাবিতে বোম্বাই-এর পথে পথে হাজার হাজার সুতাকল শ্রমিক প্রতিবাদ মিছিল বার করে। শহরের বহু লক্ষ-শ্রমিক তিলকের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিলের উপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংসভাবে গুলি চালায়। শ্রমিকের রক্তে বোম্বাই-এর রাজপথ লাল হয়ে যায়। বোম্বাইয়ের শিল্পশহরের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের স্তব্ধ করতে ব্রিটিশ ফৌজ রাস্তায় নামে। পথে ঘাটে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদের লড়াই হয়। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম রাজপথ থেকে গলিপথে এবং রেল শ্রমিকদের ব্যারাকে সম্প্রসারিত হয়। বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক লড়াইকে লেনিন অভিনন্দিত করেছিলেন। বোম্বাইয়ের ধর্মঘটে তিনি দেখেছিলেন জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের সাক্ষ্য। বোম্বাই-এর হিন্দু-মুসলমান সমেত সমস্ত সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ভারতের জনগণের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক

চেতনা দেখা দেয়। কোন সংগ্রামী সংগঠন সৃষ্টি না হওয়ার ফলে বোম্বাই ও কলকাতার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনার সুসংবদ্ধ বিকাশ ঘটে নি। ১৯০৮-এর রাজনৈতিক চেতনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও ১৯১৮-এ ভারতের শ্রমিক শ্রেণী পুনরায় সুদৃঢ় রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দেয়। ১৯০৯ থেকে প্রায় ১৯১৭ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে পুনরায় সমাজসেবামূলক সংস্কারপন্থী কাজের আবির্ভাব ঘটে। বোম্বাইয়ের 'কামগড় হিতবর্দ্ধক সভা', 'সোশাল সার্ভিস লীগ', 'সারভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রভৃতি সংগঠনগুলি শ্রমিকদের মধ্যে সমাজসেবা-মূলক কাজ করতে থাকে।

১৯১০ সালে বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকেরা কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেবার দাবিতে ধর্মঘট করে। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ দাবি ও আন্দোলনের ফলে অনিচ্ছুক ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯১১-এ ভারতীয় কারখানা আইন প্রণয়ন করে। এই নূতন কারখানা আইনে কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া সমেত শিশু ও নারী শ্রমিকদের জন্য কিছু সুবিধাজনক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে।

১৯১২-এ কতকগুলি বস্ত্রশিল্পে মজুরি বিন্যাসের দাবিতে ধর্মঘট হয়। ১৯১৫-এ বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। এই সময় মুকুন্দলাল সরকার 'ক্লার্ক'স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী-কালে তিনি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলায় বিশেষভাবে অগ্রণী হন। শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি ১৯১৪-এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শুরু থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। সমাজসেবামূলক সংস্কারপন্থী কাজের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে থেকে আগত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আইনজীবীদের নেতৃত্ব দেখা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে। শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটেছিল আরও অনেক পরে।

গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি : ১৯১৪-২৬

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

এই সময়ে ভারতে ব্রিটিশের শিল্পনীতি খানিকটা নরম হয়ে আসে। কারণ বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি ও শিল্প গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেজন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পপতিদের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে হয়। তার ফলে যে সব ক্ষেত্র এতদিন ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছে অনধিগম্য ছিল সে সব ক্ষেত্রেও তাদের লগ্নী করার সুযোগ আসে। যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প মালিকদের মুনাফা শতকরা ২০০ ভাগ থেকে ২৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজিতে পরিচালিত চটশিল্পে শতকরা ২০০ ভাগ থেকে ৪৪০ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছিল। এই সময় শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী যুদ্ধকালের পরিমাপে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছিল। ভারতীয় মিল মালিক এবং ব্রিটিশ পুঁজির মালিকেরা কোনক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সামান্য সুযোগ পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেছিল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এই সময় থেকে প্রতিবাদে মুখর হতে শুরু করে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ভারতীয় পুঁজি পরিচালিত বস্ত্রশিল্পে তাঁতের সংখ্যা ১০৪,০০০ থেকে বেড়ে ১১৬,০০০-এ দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২৬০,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৮০,০০০-এ। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধকালীন অর্জিত মুনাফা দিয়ে টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি দু'টি বড় বড় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে তিনটি সিমেণ্ট উৎপাদনের কারখানা নির্মিত হয়। এই সময়ে ভারতীয় মূলধনে গঠিত রসায়ন শিল্পদ্রব্যের কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। তার ফলে লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, রসায়ন শিল্প, রেলসহ অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থা, কয়লা ও অন্যান্য খনিগুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের দুর্গতি ও দারিদ্র্যের পাশাপাশি বিদেশী ও ভারতীয় পুঁজি পরিচালিত কলকারখানা মালিকদের পাহাড় প্রমাণ মুনাফা অর্জন যুদ্ধোত্তর ভারতের সামাজিক বৈষম্যকে প্রকট করেছিল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছিল। যুদ্ধোত্তর কালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। গ্রামের মানুষেরা শিল্প পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনই শহর ও আধা-

শহরের মানুষেরা খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধোত্তর ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে রজনীপাম দত্ত বলেছেন: 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী তরঙ্গের ফলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন যেন এক লাফে পূর্ণ কর্মতৎপরতার জগতে এসে পৌঁছল। ভারতে শুরু হল আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন। এই নতুন জাগরণের মূলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমানভাবে কাজ করেছে।'

লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭-এর নভেম্বরে জার-শাসিত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং বিশ্বে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সারা দুনিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। মার্কসবাদের বৈপ্লবিক তত্ত্ব এবং লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিশ্বের ঔপনিবেশিক, আধা-উপনিবেশিক ও শোষিত মানুষের উপর পড়তে শুরু করল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে শ্রমিক শ্রেণীকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে সব চেষ্টা হয়েছিল, ১৯১৭-এ রেলশ্রমিকেরা সেই প্রচেষ্টার উপর প্রথম আঘাত হানল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বড় শ্রমিক ধর্মঘট হতে দেখা যায় নি। এই সময় ছোটখাট ঘর্মঘট হয়েছিল। ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারীতে করাচীর নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং জুন মাসে গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা রেলের ধর্মঘট ও প্যারেলের কারখানার পাঁচ হাজার শ্রমিকের কয়েকদিনের লাগাতার ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭-এর জুলাইয়ে জি আই পি রেল কারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। এই রেল শ্রমিকরা বোম্বে লেবার এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন করে। ১৯১৭-এর সেপ্টেম্বরে এই রেল-শ্রমিকরা পুনরায় তৃতীয়বার ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট ৩৫ দিন চলেছিল। এই বছর সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। একই সময়ে বোম্বাই-এর ডাক বিভাগের শ্রমিকরা ১৮ দিন ব্যাপী ধর্মঘট চালিয়েছিল। ১৯১৭-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের শিল্পভিত্তিক ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায় করে নিতে পেরেছিল।

১৯১৮-এ কলকাতা পৌরসভা ধর্মঘট, বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘট, বাংলাদেশের খড়গপুর রেলকারখানায় ধর্মঘট, মাদ্রাজ ট্রাম ও বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘট এবং লখনৌর রেল কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৮-এর একটি শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি রেঙ্গুনের কুলি ধর্মঘট এবং খড়গপুরের রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৮-এর বছরটি নানা কারণে স্মরণীয়। এই বছরে গান্ধীজী শ্রমিক আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় পুঁজির পীঠস্থান আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। শ্রেণীসচেতনতার পরিবর্তে তিনি শ্রেণী সহযোগিতার মতাদর্শে আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করায় প্রয়াসী হন। ১৯১৮-এ মাদ্রাজে বি পি ওয়াদিয়া মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সহযোগী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় ও সভ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন নিঃসন্দেহে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রথম প্রয়াসরূপে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা বি. পি. ওয়াদিয়ার শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে কলকারখানায় অসংখ্য নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। এই সময়কালে শ্রমিক ধর্মঘট ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৯ সালে বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পে দেড় লক্ষ শ্রমিকের শিল্পব্যাপী ধর্মঘট এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধি আদায় করে নিতে পেরেছিল। এই সময়ে রেল কারখানা, ট্যাকশাল, বন্দর ও ইনজিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে বোম্বাইতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশব্যাপী ৭৫টি কারখানা থেকে প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বোম্বাই প্রদেশে একই দাবির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা। এই বছরে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বেশ কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল।

১৯২০-তে শ্রমিক ধর্মঘট আন্দোলনে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়। এমন কোন শিল্প ছিল না যেখানে শ্রমিক ধর্মঘট হয় নি। ১৯২০-তে সর্বপ্রথম টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় তিরিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে। এই সময়ে লৌহ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৯২০-তে ভারত সরকারের ছাপাখানায়

ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। যাব ফলে কলকাতা, দিল্লী ও সিমলার সরকারী ছাপাখানার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২০-তে পশ্চিম বাংলার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বছরেই কলকাতার ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল।

যুদ্ধোত্তর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে ১৯২০-তে। এই সময় শ্রমিক শ্রেণী শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখে নি। ক্রমে ক্রমে শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া ধ্বনিত হতে লাগল। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন থেকে শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের আর দূরে রাখতে পাবল না। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশীল নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

১৯২০-তে ধর্মঘট আন্দোলনের গতি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে। প্রথম দু'মাসে দু'শোর বেশি ধর্মঘট হয়েছিল এবং তাতে পনেরো লক্ষেরও বেশী শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। এই ধর্মঘটগুলো আগেকার তুলনায় অনেক বেশি তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। তার ফলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী বহুক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের ঘণ্টা কমিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও ভারতে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। অবশ্য সারা ভারত ব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে ওঠার পরিমণ্ডল তখন সৃষ্টি হচ্ছিল। ১৯২০-তে একশো পঁচিশটি ইউনিয়নে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৫০,০০০।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ভারতের শ্রীমক শ্রেণী জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে প্রয়াসী হয়। তার ফলে ১৯২০-তে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যুক্ত মোর্চায় সম্মিলিত হয়। ১৯২০-এর অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধনী সম্মেলনে লালা লাজপত রায় সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী সভায় মতিলাল নেহরু এবং বিটলভাই প্যাটেলের মত প্রবীণ কংগ্রেসী নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়নেব বি. পি ওয়াদিয়া, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত, সি. এফ এণ্ড্রুজ, সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী, কে এফ নরিম্যান প্রমুখরাও উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে জোসেফ ব্যাপটিস্টা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই-এর বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অনেকেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন।

ভারতের সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কথা বলেছিলেন। ১৯২০-এর ১লা আগস্টে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ভারতে কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার প্রাক্কালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। স্বাভাবিক-ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জাতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গঠন করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ার প্রথম যুগে শ্রমিক শ্রেণীর যুক্ত মোর্চা গঠন করা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

সভাপতির ভাষণে লাজপত রায় সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের যমজ সন্তান বলে বর্ণনা করেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতিকে স্বাগত জানান। কারণ ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণী বুঝেছেন যে সারা দুনিয়ায় শ্রমিকে স্বার্থ এক ও অভিন্ন। যদিও লাজপত রায় মার্কসবাদী ছিলেন না তবুও তিনি রুশ সর্বহারার একনায়কত্বকে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। তিনি পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'সর্বপোরি উদ্ভব ঘটল রুশ শ্রমিকদের। যাদের লক্ষ্য হ'ল সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।' লাজপত রায় সদ্যজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অবিরাম অপপ্রচারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন সংবাদ যাতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে তার চেষ্টা করেছিল। লাজপত রায় ব্রিটিশ সরকারের এই প্রয়াসের নিন্দা করেন। তিনি ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে রুশ শ্রমিকের দৃষ্টান্ত প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। সেজন্য তিনি বলেছিলেনঃ 'আমরা শ্রমিকদের সংগঠিত করব, শ্রেণী সচেতন ক'রে তুলব এবং জনগণের ধরণ-ধারণ ও স্বার্থে তাদের শিক্ষিত করব।' সভাপতির ভাষণে লাজপত রায় ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার কথা বলেন নি।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রূপে দেওয়ান চমনলাল ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে একটি ইসতেহার প্রকাশ করেন। এই ইসতেহারে শ্রেণী চেতনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অথবা কোন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের আহবান ছিল না। অবশ্য এই ইসতেহারে বলা হয়েছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যাতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে আহবান জানান হয়েছিল। শ্রমিক ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

১৯২১-এ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলের ঝরিয়ায়। এই দ্বিতীয় অধিবেশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করেছিল। কারণ, জাতীয় ক্ষেত্রে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ভারতের জন্য স্বরাজ লাভের দাবি ধ্বনিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অধিবেশন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য সমবেদনা জানিয়ে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে সোভিয়েত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানানো হয়েছিল। এই সঙ্গে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। অধিবেশনের মঞ্চ থেকে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলা হয়েছিল।

বিশ্বের অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ঝরিয়ায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করে। 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্টারন্যাশনালের' ব্রিটিশ শাখা ঝরিয়া অধিবেশনে শুভেচ্ছামূলক বাণী পাঠায়। এই বাণীতে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। ঝরিয়া অধিবেশনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি ধ্বনিত করেছিল।

১৯২০—২১ সালে শ্রমিক আন্দোলনে যে গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী বছরগুলিতে তা হ্রাস পেতে থাকে। সংগ্রামের এই নিম্ন গতি ১৯২৭ পর্যন্ত বজায় ছিল। তারপর আবার শ্রমিক আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ১৯২২-এর অক্টোবরে সুরাটের সুতাকল শ্রমিকেরা মাসিক গড় মজুরির শতকরা ৫২ ভাগ বাৎসরিক বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট করে। প্রায় তিনহাজার শ্রমিক ওই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ১৯২৩-এ আমোদাবাদের মিল মালিকরা মজুরির শতকরা কুড়ি

ভাগ কেটে নেবার সিদ্ধান্ত করলে ৫৬টি মিলের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। দু'মাস এই ধর্মঘট চলে। ১৯২৪-এর জানুয়ারীতে বোম্বাইয়ের সমস্ত সুতাকলের ১,৬০০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। কারণ শ্রমিকেরা আশংকা করেছিল যে বোনাস বন্ধ করবার সাথে সাথে মালিকপক্ষ মূল বেতন কমানোর ষড়যন্ত্র করছে। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কিছু হাঙ্গামা ঘটলে পুলিশ ধর্মঘটীদের উপর গুলিবর্ষণ করে।

বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষ অনমণীয় মনোভাব দেখালে ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমে কয়েকটি মিলে ধর্মঘট শুরু হয় এবং তারপর ধর্মঘট সমস্ত মিলে বিস্তারলাভ করে। মোট ১,৬০০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রমিকেরা বীরত্বের সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পর ভারত সরকার ডিসেম্বরে বস্ত্রশিল্পের উপর থেকে অন্তঃ শুল্ক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে এই শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে মিল মালিকেরা মজুরি হ্রাসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। ফলে শ্রমিকেরা জয়লাভ ক'রে কাজে যোগ দেয়। বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় পুঁজিপতিদের অনমণীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে যুগপৎ সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছিল। ধর্মঘটী বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত বিশ্বের অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হয়।

উত্তর-পশ্চিম রেলপথ বিভাগের শ্রমিকেরা ১৯২৫-এর মার্চে রাওয়ালপিণ্ডি রেল কারখানায় ধর্মঘট শুরু করলে সমগ্র রেলপথে ধর্মঘট প্রসার লাভ করে। রেল ইউনিয়নের একজন কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট শুরু হলে ধর্মঘটীরা আরও অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবি যুক্ত করে। এই দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে মোট ২২,০০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। রেল কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার জন্য চরম দমননীতির আশ্রয় নেয়। ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। কর্তৃপক্ষ ৮,০০০ ধর্মঘটীকে বরখাস্ত করে। এই ধর্মঘটে সেই সময়কার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল।

১৯২৪-২৫ সালে বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকেরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘট করলেও তখনও পর্যন্ত তারা সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। ১৯২৫-এর পর থেকে বোম্বাই-এর সুতাকল শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়। সুতাকল শ্রমিকেরা গিরণি কামগর ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়। এই ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হয়েছিল ৪০,০০০। এই সময় থেকে রেল, বন্দর, নাবিক, ডাক বিভাগ ইত্যাদিতে সুসংগঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। বাংলার চটকল শ্রমিক, কয়লাখনি শ্রমিক, জামালপুরের ইস্পাত শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যদিও এই ইউনিয়নগুলি তখনও পর্যন্ত সুশৃংখল ও সবল ছিল না।

১৯২৩-এর মার্চে লাহোরে এ. আই টি ইউ সি-র তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা। এই প্রস্তাবে শ্রমিক শ্রেণী যাতে ভবিষ্যতে কোনরকমভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সেজন্য অনুরোধ করা হয়। এই অধিবেশন সরকারের কাছে শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। ১৯২৪-এর মার্চে কলকাতায় এ. আই. টি. ইউ. সি-র চতুর্থ অধিবেশনে পুনরায় সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। এই অধিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল লেনিনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা। এই অধিবেশন ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই এবং শ্রমিক আন্দোলনের উপরে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

১৯২৬-এর জানুয়ারিতে মাদ্রাজ সহরে এ. আই. টি. ইউ. সি-র ষষ্ঠ অধিবেশনে ভি. ভি. গিরি সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে মস্কোর 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস'-এর পক্ষ থেকে বাণী প্রেরণ করে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি জানানো হয়।

এ. আই. টি. ইউ. সি-র অধিবেশনগুলির প্রকৃতি অনুধাবণ করলে দেখা যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে সেই রকমটি আর দেখা যায় নি। ১৯২৬ পর্যন্ত এ. আই. টি. ইউ. সি-র নেতৃত্বে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে উঠে আসা কোন কর্মী তখনও পর্যন্ত এ. আই. টি. ইউ সি-র নেতৃত্বে আসীন হন নি। সেই সময় এ. আই. টি. ইউ. সি-র সংগঠন উচ্চমানের ছিল না। সেজন্য দেখা যায় কিছু কিছু সংগ্রামমুখী কর্মী এ. আই. টি. ইউ. সি-র অধিবেশনগুলিতে নেতৃত্বের কাজের মন্থরতাকে সমালোচনা করেন। এ. আই. টি. ইউ. সি-র নেতৃত্বে ছিলেন সংস্কারপন্থী সংগঠকেরা। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠনে সংস্কারবাদী প্রভাব দেখা গিয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলন যে গতিতে এগিয়েছিল সংস্কারপন্থী নেতারা সে তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন।

গ. শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা: ১৯২৭-৩৬

১৯২৭ থেকে ১৯৩৬-এর বছরগুলি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে তীব্র করেছিল।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব এই সময় থেকে বৃদ্ধি পায়। বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট সারা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে অগ্রগামী করেছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতের অর্থনীতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। তার ফলে শ্রমিকের জীবনযাত্রায় আঘাত আসে। শ্রমিকের মজুরি হ্রাস, শ্রমিককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার মত ঘটনাগুলি ব্রিটিশ পুঁজি ও ভারতীয় পুঁজি পরিচালিত শিল্পসংস্থায় নিত্যনৈমিত্তিকভাবে ঘটতে শুরু করল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী কঠোর সংগ্রাম করে নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনকে আয়ত্তে আনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬-এ 'দি ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট' চালু করল। ১৯২৬-এর ট্রেড ইউনিয়নের আইনের পিছনে ছিল ব্রিটিশ সরকারের গভীর অভিসন্ধি। এই আইনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ কড়াকড়ির ব্যবস্থা করা হল। কারণ শ্রমিকদের মধ্যে যদি রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দেয় এবং একবার যদি শ্রেণী-সচেতন নেতৃত্বের অধীনে তাদের সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে ওঠে তাহলে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ভিত কেঁপে উঠবে। সেজন্য নতুন ট্রেড ইউনিয়ন আইনে শ্রমিক আন্দোলন যাতে নিরাপদ পথে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করা হল। তেমনি দমনমূলক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য 'ট্রেড ডিসপিউট্‌স অ্যাক্ট' এবং 'পাবলিক সেফ্‌টি অ্যাক্ট' পাশ করানো হল। শুধুমাত্র শ্রমিক-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন আইন এবং আন্দোলন-বিরোধী জনশৃংখলা আইন পাশ করিয়েই ব্রিটিশ সরকার ক্ষান্ত রইল না। শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী অংশ অর্থাৎ তরুণ কমিউনিষ্ট নেতা ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শ্রমিক নেতাদের ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হল। ব্রিটিশ সরকার আশা করেছিল শ্রমিক-বিরোধী দমনমূলক আইন পাশ করিয়ে এবং সংগ্রামমুখী শ্রমিক নেতাদের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়িয়ে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে অংকুরেই বিনাশ করতে পারবে।

এই সময় থেকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধ্বনি শোনা গেল। ভারতীয়কে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজ সদস্যদের নিয়ে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য সাইমন কমিশন গঠন করলে ভারতের সমস্ত দল এই কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশন বোম্বাইতে অবতরণ করলে 'সাইমন ফিরে যাও'

ধ্বনি তুলে হাজার হাজার মানুষ কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ করেছিল। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধভাবে সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দান। ভারতের রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ যোগ দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তীব্র অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত শ্রমিক শ্রেণীকে আন্দোলনের পথে পরিচালিত করে সেই আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেশের মধ্যে একটি নতুন সংগ্রামী গতিবেগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতেও এই সময় শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলেছিল। এ. আই. টি ইউ. সি-র সাধারণ সম্পাদক এন এম যোশী রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিকদের যোগদানের বিরোধী ছিলেন। তিনি শ্রমিকদের সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অপেক্ষা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৯-এর অধিবেশনে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির উন্নতি সাধনের জন্য দেশে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছিল। ১৯২০-এর নাগপুর অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন মারফত শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণের প্রতি সহানুভূতি জানায়। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে সামিল হবার জন্য জাতীয় কংগ্রেস আহবান জানায় নি।

চিত্তরঞ্জন দাশ এ আই টি ইউ সি-র পরপর দুটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণের ওপর তেমন জোর দেন নি। সংস্কারপন্থী নেতা দেওয়ান চমনলাল এবং জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায় 'শ্রমিকের নিজস্ব রাজনীতি অবশ্যই থাকবে' এ কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক দল। লাজপত রায় ভারতে ব্রিটিশ ধাঁচের শ্রমিক দল গড়ার কথা বলেছিলেন।

তিরিশের দশক থেকে কমিউনিস্ট ও সংগ্রামমুখী বামপন্থী নেতাদের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনে শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা আসতে শুরু করে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভেতরে শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারপন্থী ও সংগ্রামমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গীর গুরুতর পার্থক্য প্রকট হতে থাকে। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এই দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

বিশের দশকের শেষের দিকের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে রজনীপাম দত্ত বলেছেন: '১৯১৮-এ প্রচণ্ড শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে এই রকম প্রবল আন্দোলন আর দেখা যায় নি। বোম্বাই এই অগ্রগতির কেন্দ্র। এই সর্বপ্রথম কলকারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষাকারী ও শ্রেণী সংগ্রামের মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এক নতুন শ্রমিক নেতৃত্ব মাথা তুলে দাঁড়াল। শ্রমিকদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। এতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী নেতারা শংকিত হলেন। ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে বোম্বাই পৌরসভার বহু শ্রমিক কর্মচ্যুত হলেন।'

সারা ভারতে ১৯২৭ থেকে যে ধর্মঘট আন্দোলন শুরু হল তা ১৯২৯-এ তীব্র আকার ধারণ করতে দেখা গেল। অতীতের ধর্মঘট আন্দোলনগুলির সঙ্গে ১৯২৭-২৯ সালের এর ধর্মঘটগুলির কোন তুলনাই চলে না। শিল্পভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯২৭-এ মোট ধর্মঘটের শতকরা ৪৬ ভাগের বেশি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বস্ত্রশিল্পে এবং সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময় যত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে একমাত্র রেল শ্রমিক ধর্মঘটই ছিল শতকরা ৬০ ভাগের বেশী। ১৯২৮-২৯ সালের শ্রমিক ধর্মঘটগুলি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলেন যে একমাত্র ১৯২৮-এই মোট তিন কোটির বেশি শ্রম দিবস নষ্ট হয়। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত মোট যত শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছিল ১৯২৮-এর ধর্মঘটের ফলে তার চেয়ে বেশী শ্রম দিবস নষ্ট হয়। সরকার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী এই বছর মোট ধর্মঘটের ১১০টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় বস্ত্রশিল্পে, ১৯টি চটকলে, ১১টি ইনজিনিয়ারিং কারখানায়, ৯টি রেলপথ ও রেল কারখানায় এবং ১টি কয়লাখনি শিল্পে। প্রদেশভিত্তিক হিসাবে দেখা যায় ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল বোম্বাই-এ এবং তারপর যথাক্রমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে।

১৯২৭-এ সারা ভারতে যে শ্রমিক ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপকভাবে পালিত হয়েছিল তাতে খড়গপুরের বেঙ্গল-নাগপুর রেল শ্রমিকরা পরপর দু'বার দীর্ঘ-স্থায়ী ধর্মঘট করে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। বি. এন. রেলের ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ভি. ভি. গিরি এবং এই ইউনিয়নটি সারা

ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রেল কর্মচারী ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বি এন. রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের ২৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের সময় প্রচণ্ড পুলিশী অত্যাচার সত্ত্বেও শ্রমিকদের মনোভাব অটুট ছিল। ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার পর ১,৭০০ শ্রমিকের উপর ছাঁটাইয়ের নোটিশ জারি করা হলে খড়গপুরে বি এন রেলওয়ের শ্রমিক কর্মচারীরা পুনরায় ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। ১৯২৭-এ পরপর দু'বার সরকার পরিচালিত সংস্থায় ধর্মঘট পালন করা শ্রমিক আন্দোলনে এক অতুলনীয় ঘটনা।

রেল শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটের মধ্যে ১৯২৮-এর লিলুয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়ান এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল শ্রমিক ধর্মঘট সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লিলুয়ায় রেল শ্রমিক ধর্মঘটে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টি'র কমিউনিস্ট কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মঘটী শ্রমিকের ওপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল শ্রমিক ধর্মঘটে ব্যাপক শ্রমিক জাগরণ ও বিক্ষোভে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এবং মুকুন্দলাল সরকারকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের প্ররোচনা সত্ত্বেও ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৩০-এ জি আই. পি. রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটে ২২,০০০-এর বেশী শ্রমিক অংশগ্রহণ করে।

১৯২৮ এবং ১৯২৯-এ পর পর দুটি সাধারণ ধর্মঘট পালন ক'রে বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করে। মিল মালিকদের 'র‍্যাশনালাইজেশন' নীতি গ্রহণের ফলে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক ছাঁটাই আসন্ন হয়ে পড়লে ১৯২৮-এর এপ্রিলে বস্ত্রশিল্পে ৬ মাস ব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট চলে। বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার করে এবং তারই ফলে বস্ত্রকল শ্রমিকদের সবচেয়ে জঙ্গী সংগঠন গিরনি কামগড় ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। ধর্মঘটের ফলে 'র‍্যাশনালাইজেশন' পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত ছিল। বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা ১৯২৯-এর এপ্রিলে দ্বিতীয়বার সাধারণ ধর্মঘট শুরু করে। মালিক পক্ষের প্রতিহিংসামূলক দমন নীতি ও বরখাস্তের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। গিরনি কামগড় ইউনিয়ন বরখাস্ত কর্মীর পুনর্বহাল দাবি করে। কিন্তু মালিকপক্ষ অনমনীয় মনোভাব দেখালে ঐ মিলে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। মালিকপক্ষ ৬,০০০ শ্রমিককে পুনর্বহাল করতে অস্বীকৃত হলে গিরনি কামগড় ইউনিয়নের আহবানে বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয় এবং প্রায় ১,০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।

১৯২৯-এর জুলাই-এ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট। ১৫,000 শ্রমিকের ৬ মাস ব্যাপী ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত বিদেশী মালিক ও পুলিশের দমন নীতির ফলে পরিসমাপ্ত হয়। এই ধর্মঘটের প্রধান কারণ ছিল কাজের সময় সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টা বৃদ্ধি। বিনা মজুরিতে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা কাজ বৃদ্ধির প্রতিবাদে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়। ধর্মঘটের প্রথম দিনেই শ্রমিকদের ওপর গুলি চলেছিল। তবুও শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যায়। ইতিপূর্বে এত দীর্ঘকাল চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে নি। চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে আগত এবং বাংলার স্থানীয় শ্রমিকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চটকল শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

১৯২৮-এর এপ্রিল থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ মাস জামসেদপুরের টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের এক দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট হয়েছিল। ১৯২৪-এর টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ধর্মঘটের মীমাংসা শ্রমিকদের অসন্তোষকে আদৌ কমাতে পারে নি। মালিকের পুনর্গঠন নীতির বিরুদ্ধে এবং লেবার এসোসিয়েশনের সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে ১৯২৮-এ টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। অবশেষে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে টাটা মালিকদের আলোচনা হয় এবং ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে মালিক পক্ষের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র একটি মীমাংসায় আসেন। এই মীমাংসা অনুযায়ী শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে।

১৯২৭—২৯-এর বছরগুলিতে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র ধর্মঘট আন্দোলন এক নতুন চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। সারা ভারত ব্যাপী ধর্মঘটগুলির পুরোভাগে ছিলেন কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী কর্মীরা। ভারতব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগ্রামী মনোভাব ও কর্মতৎপরতা পরাধীন ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয়ের নজির সৃষ্টি করে।

সারা ভারতে তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার খুবই তৎপর হয়ে উঠল। ১৯২৯-এ 'পাবলিক সেফ্‌টি অর্ডিন্যান্স' জারি করা হল। এই বছর মার্চে সারা ভারতে বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিক আন্দোলনের বাছা বাছা নেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট শহরে পাঠানো হল। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সমেত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট

ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হল। এই মামলা ইতিহাসের এক দীর্ঘস্থায়ী ও জমকালো সরকারী মামলা। সারা ভারতে সংস্কারপন্থী শ্রমিক নেতারা যখন কোনঠাসা হয়ে পড়ছিলেন ঠিক সেই সময়েই সংগ্রামী শ্রমিক নেতাদের শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হল।

বিশের দশকের শেষের দিক থেকে ভারতের রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, সংস্কারপন্থী ঝোঁকগুলির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিতর্ক চলছিল। এই পরিবেশে ১৯২৯-এর নভেম্বরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দশম অধিবেশনে সুস্পষ্ট দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হল। সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের এক অংশ এ. আই. টি ইউ সি-র অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এসে ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে একটি পৃথক সভায় মিলিত হয়ে 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এন এম যোশী, দেওয়ান চমনলাল, ভি. ভি. গিরি প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত এই ফেডারেশন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সংস্কারবাদী ঝোঁকের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থী ও সংস্কারপন্থী দু'টি বিপরীতধর্মী ঝোঁকের সংঘাতের ফলে ১৯২৯-এ এ. আই. টি ইউ সি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার মধ্য দিয়েই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যার সমাধান হল না। ১৯৩১-এর জুলাইয়ে এ. আই. টি. ইউ. সি.-র একাদশ অধিবেশনে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নেই পুনরায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভক্ত হয়। নেতৃত্বের যে অংশ শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরাই অবশেষে এ. আই. টি. ইউ. সি. থেকে বেরিয়ে এসে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতের কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতারাই প্রধানত 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' গঠনে উদ্যোগী হন।

বিশের দশকের শেষ দিক থেকে বিশ্বে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা দেখা দেয়। তার ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটল এবং তারাও দলে দলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে দেখা দিলে এদেশের মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করল। বিশ্ব অর্থনৈতিক

সংকটের বছরগুলিতে ফ্যাসিবাদ একটি ভয়াবহ সভ্যতা-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী বিপদ হিসেবে সারা বিশ্বের সামনে আতংকের সৃষ্টি করল।

অর্থনৈতিক সংকটের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের মান, মজুরি, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দ্রুত হ্রাস পেলে সারা ভারতে শ্রম-মালিক বিরোধ আরো তীব্র হয়। ১৯২৯-এ ১৪১টি শ্রমবিরোধ দেখা গিয়েছিল। ১৯৩১-এ ১৬৬টি শ্রম বিরোধ দেখা দিল। এই বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র হতে থাকে। যার ফলে প্রতি বছরই ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট ছিল বাংলার চটকল শ্রমিক ধর্মঘট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও আজমীরের রেল শ্রমিক ধর্মঘট, এবং বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত শ্রমিক ধর্মঘটগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকরা অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

ভারতে অর্থনৈতিক সংকটজনিত পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট পরিচালনা করে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র সর্বভারতীয় সংগঠন এ আই. টি. ইউ সি-তে দুবার ভাঙন দেখা দিলে শ্রমিক আন্দোলনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। সারা ভারতের রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলির অনেকেই এই ভাঙনের ফলে এ. আই. টি. ইউ. সি. থেকে বেরিয়ে যায়। তার ফলে ভারতের রেল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। তেমনি বাংলার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট ও বোম্বাই-নাগপুর এবং অন্য অঞ্চলের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সংগঠিত হলেও, নেতৃত্বের অনৈক্য ধর্মঘটের সাফল্যকে অনিশ্চিত করেছিল। অর্থনৈতিক সংকটের সময় ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল।

১৯৩১-এ এ আই. টি. ইউ. সি-র সাধারণ সম্পাদক মুকুন্দলাল সরকার এই সংগঠন থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আবার ফিরে আসার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু এই ঐক্য প্রচেষ্টা মূলত এ আই টি ইউ. সি. এবং 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের' মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ. আই টি ইউ. সি থেকে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বেরিয়ে গিয়ে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' গঠন করায় এ. আই. টি ইউ সি এবং সংস্কারপন্থী 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের' ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিশেষ কোন আদর্শগত বাধা রইল না।

১৯৩১-এ 'হুইটলি কমিশনের' প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জানা গেল যে ভারতের

শ্রমিক শ্রেণীকে নির্মম ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে সামান্য পরিমাণ রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। শ্রমিক শ্রেণীর মূল সমস্যার সমাধান অথবা ক্রমাগত ছাঁটাই ও বেকারিত্বের অনিশ্চয়তা রোধের কোন সুপারিশই 'হুইটলি কমিশনের' প্রতিবেদনে দেখা গেল না। মূল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সামান্য কিছু সংস্কারমূলক সুপারিশ করেই 'হুইটলি কমিশন' তার কাজ শেষ করল। ভারতের সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 'হুইটলি কমিশনের' সুপারিশের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর চরম দুরবস্থার উন্নতিসাধনের উজ্জ্বল আশা দেখতে পেলেন। অপরদিকে বামেপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 'হুইটলি কমিশনের' সুপারিশে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তাঁরা সংস্কারমূলক শ্রমিক আন্দোলনের পরিবর্তে শ্রেণী চেতনার দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের দুর্দশা লাঘব করায় বিশ্বাসী ছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে আরো কিছু ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারীতে রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের কয়েকটি ইউনিয়ন মিলিত হয়ে 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব লেবার' নামে একটি নতুন সংগঠন তৈরী করে। এই বছরের এপ্রিলে 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' ও সদ্যজাত 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব লেবার' পরস্পরে যুক্ত হয়ে 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' গঠন করে। ভি ভি. গিরি, গুরুস্বামী, যমুনাদাস মেহতা প্রমুখ সংস্কারপন্থী নেতাদের উদ্যোগে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে।

দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠনের রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্টরা শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গীকে বজায় রেখে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য সাধনে অগ্রণী হলেন। এই সময় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সাজা প্রাপ্ত কমিউনিস্ট বন্দীরাও আদালতের নির্দেশে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আকাংখা এ. আই. টি. ইউ সি-র নেতৃবৃন্দ অনুভব করতে লাগলেন। ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দেখা দিল নেতৃবৃন্দের পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গীতে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' গঠন করেছিলেন। অপরদিকে সংস্কারপন্থী নেতারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র কিছু সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের জন্য আদায় করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংস্কারপন্থী নেতাদের আই এল. ও-তে ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার

ইচ্ছা এবং ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে সংস্কারবাদী আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার অভিপ্রায়। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ভারতের সংস্কারপন্থী শ্রমিক নেতাদের এই দু'টি অভিপ্রায়ের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৩৫-এর জানুয়ারীতে নাগপুরে এ আই টি ইউ সি-র অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি নীতিভিত্তিক সুপারিশ করা হয়। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের পথে নীতিগত বিরোধগুলির মীমাংসা না হলে সাংগঠনিক ঐক্য আনা যায় না। নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত ঐক্যের সুপারিশের মূল নীতিগুলি ছিল: (১) শ্রেণী সংগ্রামের নীতি স্বীকার করা, (২) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া, (৩) এ. আই. টি. ইউ. সি-কে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনরূপে স্বীকার করা, (৪) প্রতিবছর আই. এল. ও-তে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এবং (৫) একটি শিল্পে একটিমাত্র ইউনিয়ন গঠনের নীতি স্বীকার করা।

এ আই. টি. ইউ. সি-র নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ভারতের ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৩৫-এর এপ্রিলে কলকাতায় এ. আই. টি. ইউ. সি-র চতুর্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী শ্রমিক নেতারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করেন। তার ফলে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' প্রতিনিধিরা এ আই. টি. ইউ. সি-র কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেন এবং দু'পক্ষের সর্বসম্মত ভিত্তিতে তাঁরা এ আই টি. ইউ সি-র সঙ্গে একীভূত হতে সম্মত হন। এইভাবে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। এ. আই. টি. ইউ. সি-র কলকাতা অধিবেশনে 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের' সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে দৃঢ়তর করা হয়। এইভাবে এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্বে ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ও ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রয়াস চলতে থাকে।

ট্রেড ইউনিয়ন মিলনের ফলে এ. আই. টি. ইউ. সি-র শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তার ফলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

ঘ প্রাক-যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব : ১৯৩৭ ৪৫

ফ্যাসিবাদী শক্তি অভ্যুত্থানের ফলে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ফ্যাসি-বিরোধী পপুলার ফ্রন্ট এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশ পপুলার ফ্রন্ট গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতন অংশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনে প্রয়াসী হয়। ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান এবং প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে ভারতের রাজনীতিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের অধীনে ১৯৩৭-এ প্রদেশগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এই নির্চাচনে অংশগ্রহণকরে এবং ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে মন্ত্রীসভা গঠন করে। সীমিত ভোটাধিকার সত্ত্বেও ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল দেশের বামপন্থী শক্তিসমূহের কংগ্রেসকে সক্রিয় সমর্থন। বোম্বাই-এর কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের ফলে বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধু প্রদেশগুলি বাদে বাকি ব্রিটিশ ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গঠনের পর সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সঙ্গে দেশ জুড়ে বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা যেমন বেড়ে গেল ঠিক তেমনি বাড়ল ধর্মঘট ও শ্রমদিবস নষ্ট হবার সংখ্যা। কারণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-বিরোধের সংখ্যাও যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পেল। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি শহর ও শিল্পাঞ্চল শ্রমিকদের সভা ও কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৭-এ অনুষ্ঠিত ধর্মঘটগুলির মধ্যে বাংলায় চটকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারীতে বাংলায় চটকল শ্রমিকরা ৭৪ দিন স্থায়ী ধর্মঘট চালিয়েছিল। এই ধর্মঘটে ২৫,000 জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছিল। বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভা চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের ন্যায্যতা অস্বীকার ক'রে এই ধর্মঘটকে দমন পীড়ন চালিয়ে ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে

আসে। বাংলার ছাত্রসমাজ ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য রিলিফ ফান্ড গঠন করে। সুভাষচন্দ্র বসু ছাত্রদের এই প্রয়াসকে সমর্থন করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী নিয়োগের নিন্দা করে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হকের সঙ্গে শ্রমিক নেতাদের আলোচনা হয় এবং দাবি দাওয়া সম্পর্কে কিছু প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। এই ধর্মঘট পরিচালনায় কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট নেতারা বিশেষভাবে অগ্রণী হন।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পরিচালিত প্রদেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক ধর্মঘট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩৭-এ বোম্বাইতে ৮৮টি ধর্মঘট হয় এবং ১,০৯৮৫৮ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতার দিক থেকে মাদ্রাজ তৃতীয় স্থান গ্রহণ করেছিল। এই প্রদেশের ধর্মঘটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬১টি। ১৯৩৭-এ যুক্তপ্রদেশে ১৫টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঘটগুলিতে মোট ৬৩,৩৫০ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে কানপুরের বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ধর্মঘট দমনের জন্য শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনার ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। এই সময় বিহারে ১৪টি এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সে ৫টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই এবং পণ্ডিচেরীতে প্রবল শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল।

১৯৩৮-এ সারা ভারতে মোট ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়লেও ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা কমতে দেখা গিয়েছিল। এই বছরে বাংলার চটকলে আবার ধর্মঘট হয়। ফজলুল হক মন্ত্রীসভা চটকল শ্রমিকদের জন্য সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলে তার বিরুদ্ধে বাংলার চটকল শ্রমিকেরা ধর্মঘটে সামিল হয়। কুলটি ও হীরাপুরে লোহ ও ইস্পাত কোম্পানির শ্রমিকেরা দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করে। এই বছর কানপুরের বস্ত্রকলগুলিতে দ্বিতীয় বার সাধারণ ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটের সমর্থনে কানপুরের অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরা এগিয়ে আসে। আলোচ্য বছরে বোম্বাই-এর প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক 'ইন্ড্রাস্টিয়াল ডিসপিউট বিলের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মঘটে সামিল হয়। এই বিলে অন্যান্য শ্রমবিরোধী ধারাগুলির মধ্যে তথাকথিত বেআইনী ধর্মঘটে

যোগদানের জন্য শ্রমিকদের কারাদণ্ড দেবার একটি ধারা সংযোজিত হয়েছিল।

প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের ধর্মঘটগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলির বাইরেও সারা ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং শ্রমিক ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। যে সব অঞ্চলে ইতিপূর্বে কোন ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না সেখানে শ্রমিক ধর্মঘট প্রসারিত হয়। বিভিন্ন শিল্পগুলি ছাড়াও বিড়ি, ছাপাখানা ও পরিবহনে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং ধর্মঘট হয়। এই সময়ে ভারতের ছোটখাট অসংগঠিত শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। এই সময়কার ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী অগ্রগামী চেতনার পরিচয় দেয়। কারণ বেতনবৃদ্ধি, ছাঁটাই ও দমন পীড়ন বন্ধের দাবিতে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। বিশের দশকে শ্রমিক ধর্মঘট-গুলিতে যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে আত্মরক্ষামূলক কারণে মূলত শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল। তিরিশের দশকের শেষের দিকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী মালিক পক্ষের উপরে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

তিরিশের দশকের শেষের দিকের ধর্মঘটগুলি পরিচালনার জন্য শ্রমিক শ্রেণী থেকে শক্তিশালী নেতৃত্বের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে এঁরাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে শ্রমিকরা ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তার ফলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে কানপুরের বস্ত্রকল শ্রমিক এবং বাংলার চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৮-এ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই অধিবেশন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই অধিবেশন একটি সাব-কমিটি গঠন করে। ঐক্য প্রস্তাব ছাড়াও এই অধিবেশনে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে এবং কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য 'সারা ভারত দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সময় এ আই. টি. ইউ. সি-র নেতৃত্বে প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গিয়েছিল। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমর্থকরা এই সংগঠনের নেতৃত্বে থেকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কারণ ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনকেই তখন প্রাধান্য দিয়েছিল। ১৯৩৮-এর এপ্রিলে সারা ভারত ট্রেড

ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই দু'টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংযুক্তির জন্য কতকগুলি শর্ত নির্ধারিত করে। ১৯৪০-এ এই দু'টি সংগঠনের সামগ্রিক মিলন সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রাক্-যুদ্ধ সময়ের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটলেও প্রচণ্ড দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রকৃত মজুরী হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হবার এক মাসের মাথায় অর্থাৎ ১৯৩৯-এর ২রা অক্টোবরে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এই দিন বোম্বাইয়ের ৯০,০০০ শ্রমিক যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। তখনও পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের কোন দেশে শ্রমিক শ্রেণী যুদ্ধ-বিরোধী ধর্মঘটে যোগ দেয় নি। যুদ্ধকে প্রতিবাদ করে যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘটে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী প্রথম যোগ দেয়। এ ঘটনা যেমন ঐতিহাসিক তেমনই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর উচ্চমানের রাজনৈতিক চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। যুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক ধর্মঘট করা সত্ত্বেও ভারতের শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল আরো পরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণের ন্যূনতম মান বজায় রাখতে আন্দোলন করতে হয়। ভারতের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব ভারতের কলকাতা, জামসেদপুর, ধানবাদ, ঝরিয়া, আসামের ডিগবয়, পশ্চিম ভারতের বোম্বাই, কানপুর এবং দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা এই সময় ধর্মঘটে সামিল হয়। ১৯৩৯-এর তুলনায় দেখা যায় ১৯৪০ ও ১৯৪১-এ ধর্মঘটের সংখ্যা নীচে নেমে এসেছিল। কিন্তু ১৯৪০-এ মোট ধর্মঘটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও ঐ বছর নষ্ট হওয়া শ্রমদিবসের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্য মূল্য অস্বাভিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরি বৃদ্ধি ও ন্যূনতম জীবনধারণের মান রক্ষার সঙ্গে কোন সমতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তার ফলে সারা ভারতে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ১৯৪০-এর মার্চে বোম্বাই-এর পৌনে দু লক্ষ বস্ত্রকল শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট ক'রে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করে। বোম্বাই-এর গিরনি কানগড় ইউনিয়ন (লালঝাণ্ডা) সংগ্রাম কমিটি গঠন ক'রে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষা আইনে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে

এবং শ্রমিকদের উপর লাঠিচার্জ এবং গুলিবর্ষণ করে। ধর্মঘটের সমর্থনে এ আই টি ইউ সি. সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানালে ১০ই মার্চ বোম্বাই-এর তিন লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।

১৯৪০-এ কলকাতা কর্পোরেশনের ২০,০০০ শ্রমিক-কর্মচারী মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত হাওড়া, কলকাতা, হুগলী ও ও চব্বিশ পরগণার চটকলগুলিতে শ্রমিকরা মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদির দাবিতে ধর্মঘট করে। এই সময় শ্রমিক আন্দোলনে যুদ্ধজনিত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করা হয়েছিল। ১৯৪১-এ জুতো কারখানার শ্রমিক, ভারতীয় ইলেকট্রিক ও ষ্টীল ওয়ার্কসের শ্রমিক বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। ১৯৪২-এ কলকাতার ২,০০০ ট্রাম শ্রমিক শতকরা ২৫ ভাগ মহার্ঘ ভাতা ও বরখাস্ত সহকর্মী পুনর্নিয়োগের দাবিতে ধর্মঘট করে। একই সময়ে কলকাতার বন্দর শ্রমিকরা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন প্রস্তাব গৃহিত হলে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। আমেদাবাদে শ্রমিকরা গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে।

১৯৪১ -৪৩-এ দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা মহার্ঘ ভাতা, বোনাস ও বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের দাবিতে ধর্মঘট করে। ব্যাঙ্গালোরের শ্রমিকরা ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। আলোচ্য বছরগুলিতে নাগপুর ও কানপুরের বহু সহস্র শ্রমিক বেতন বৃদ্ধি ও মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। ১৯৪১-এর জি. আই পি রেল শ্রমিকরা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে রেল কারখানায় ধর্মঘট করে। ১৯৪২—৪৩ সালে বোম্বাই-এর প্যারেল রেল কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে বোম্বাই শহরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে ভি ভি গিরি আনীত একটি প্রস্তাবে বলা হল 'যে যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে না, সেই যুদ্ধ ভারতের কোন উপকার সাধন করবে না, ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর তো নয়ই'। এম এন. রায়ের সমর্থকরা যুদ্ধের প্রতি সর্বান্তকরণ সমর্থনের পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক বিতর্কের পর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয় এবং ভি ভি. গিরির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে এম. এন. রায়ের

সমর্থকরা এ. আই. টি ইউ সি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁরা 'ইণ্ডিয়ান লেবার ফেডারেশন' নামে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারীতে কানপুরে এ আই টি. ইউ. সি-র উনবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জহরলাল নেহরু এই অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে বঙ্কিম মুখার্জী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রয়াসে এ. আই. টি. ইউ. সি-র সহযোগিতা করার একটি প্রস্তাব পেশ করেন। অধিকাংশ প্রতিনিধি সমর্থন করলেও তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন না পাওয়ায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি। সরকার শ্রমিকদের সহযোগিতা পাবার জন্য ত্রিপক্ষীয় সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী নয়াদিল্লীতে প্রথম ইণ্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। সেজন্য এ. আই. টি. ইউ. সি-র আহবানে ১৯৪২-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর 'দমন নীতি-বিরোধী দিবস' পালিত হয়।

দীর্ঘ আট বছর বেআইনী থাকার পর কমউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। এ. আই. টি. ইউ সি-র বিংশ অধিবেশনে এস. এ ডাঙ্গে এবং এন এম. যোশী যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এবং এই যুদ্ধের শেষ অবস্থায় এ. আই. টি ইউ সি-র নেতৃত্বে বিভিন্ন মতবাদসম্পন্ন দল ও ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায় সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে এ. আই. টি ইউ সি সব সময়ে পুরোভাগে ছিল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন-রূপে এ. আই. টি. ইউ. সি যখন সারা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হল সেই সময় ব্রিটিশ সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষিত 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারকে' শ্রম-মালিক-বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য অগ্রাধিকার দিতে শুরু করল। এ আই টি. ইউ. সি-র ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৪-এ ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত আই. এল. ও সম্মেলনে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের' কর্ম-কর্তাদের ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করল।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ভারত সরকার এ আই. টি. ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাংগঠনিক অগ্রগতিকে অস্বীকার করে এম. এন. রায়ের 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের' প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ শুরু করেছিল। যুদ্ধের সময়ে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার' নিয়মিত সরকারী অর্থসাহায্য গ্রহণ করায় শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। ভারত সরকারকে

সেবা করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ ফেডারেশনের সভাপতি যমুনাদাস মেহেতাকে সরকার ব্রহ্মদেশে এজেন্ট জেনারেল নিযুক্ত করল। এই সব ঘটনার পর 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের' স্বরূপ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেল অতি দ্রুত 'ইন্ডিযান ফেডারেশন অব লেবারের' প্রভাব হ্রাস পেল। সেই সঙ্গে লেবার ফেডারেশনের অস্তিত্ব শুধুমাত্র সাইন-বোর্ডেই সীমাবদ্ধ রইল। এ. আই. টি. ইউ. সি এবং 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের' প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার এ. আই. টি. ইউ. সি-কে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত দিলেন। অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত এ. আই. টি. ইউ. সি শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন রূপে ভারত সরকারের স্বীকৃতি আদায় করল।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ

১. বামপন্থী আন্দোলনের পটভূমি

বামপন্থী আন্দোলন ও রাজনীতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কোন সহজ ও সরলপথে বামপন্থী আন্দোলন শুরু হয় নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থবাহী ও শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরস্পরবিরোধী দু'টি স্বার্থের সংঘাতের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিকাশলাভ করে। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক প্রাধান্য ও শোষণ বজায় রাখার স্বার্থের সঙ্গে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ভারতীয় স্বার্থের সংঘাত স্বাধীনতা আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করে। শুরু থেকেই বামপন্থী রাজনীতি স্বাধীন পথে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের দাবি ধ্বনিত ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে এবং তার ফলে সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার দৃষ্টিভংগী ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবি শ্রমজীবী মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জাতীয় পটভূমি

বামপন্থী আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করায় জাতীয় পরিস্থিতির সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তীব্র শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনাগুলি ভারতে বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। সেই অনুপাতে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির হার অনেক নীচে থাকে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পণ্যদ্রব্য সরবরাহ ক'রে ব্রিটিশ পুঁজি ও নবোদিত ভারতীয় পুঁজি পরিচালিত কলকারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপে ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক বোঝা শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষকে বহন করতে হয়। সেজন্য ভারতের শ্রমিকরা বর্দ্ধিত হারে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য

সুযোগ সুবিধা দাবি ক'রে প্রতিবাদ ও ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করে।

১৯১৮-তে শিল্পশ্রমিকেয় ধর্মঘট তরঙ্গ শুরু হয় এবং তা ১৯১৯-২০-এর বছর দু'টিতে সারা দেশে নজিরবিহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে এই ধর্মঘট-গুলিতে কোন মতাদর্শের প্রভাব দেখা যায় নি। কিন্তু ১৯১৮ থেকে শুরু করে বিশের দশকের ধর্মঘট তরঙ্গগুলি যুদ্ধপূর্ব ধর্মঘটের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ধর্মঘটগুলি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক দাবি এবং কাজের অবস্থার উন্নতির চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। ১৯১৮-২০-সালের ধর্মঘট তরঙ্গগুলি শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-সংহতির প্রতিফলন শুরু করে। যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত শিল্পোৎপাদন স্তিমিত হয়ে গেলেও শ্রমিকেও মহার্ঘ ভাতা ও বোনাসের আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়েই ভারতের সুতাকলে প্রথম সাধারণ ধর্মঘট হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলি সংগ্রামশীল পন্থা গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান ঐক্য ও উন্নততর চেতনা ১৯২০-তে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠনে সহায়ক হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কৃষিজ পণ্যের মূল্য তার চেয়ে ছিল অনেক নীচে। কৃষকেরা কৃষিজ পণ্য বিক্রি করে যে দাম পেত তার দ্বিগুণ দামে শিল্পপণ্য কিনত; এর ফলে কৃষিতে সংকট শুরু হয়ে যায় এবং কৃষকের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অসন্তোষ বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলন উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ভারতের রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব সূচিত হয়। উদারপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং জাতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাসের রাজনীতির বিকল্প পথ ও পদ্ধতি হিসাবে গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। তিনি অহিংস পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ ও গণ-আন্দোলনের উপর সমধিক গুরুত্ব দেন। এতদিন ভারতের রাজনীতি প্রধানত শহরকেন্দ্রিক ছিল; গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের গণ-সমাবেশ ও গণ-আন্দোলনের রাজনীতি সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হয়। তিনি কৃষককে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করেন। কিন্তু তাঁর আন্দোলন আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ভারতের কৃষককে যতটা রাজনৈতিকভাবে সমবেত করেছিল ঠিক ততটা শ্রমিককে সমবেত করায় পরিচালিত হয় নি। ভারতের কৃষকেরা নিজেদের রাজনৈতিক দাবিগুলিকে কেন্দ্র ক'রে অসহযোগ আন্দোলনে সমবেত হয়। সেজন্য দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার পরও কৃষকের আন্দোলনমুখী মনোভাব স্তিমিত হয়ে যায় নি। কৃষকেরা খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করতে সব সময়ে প্রস্তুত ছিল। মালাবারের মোপলা কৃষকেরা অসহযোগ আন্দোলনের আগে থেকেই জমিদার-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন মোপলা কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করে।

অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা শ্রেণীগতভাবে সংঘবদ্ধ হয় এবং কৃষক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়। অসহযোগ আন্দোলন কৃষকের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করে। সেই চেতনাকে বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলন শ্রেণী চেতনায় রূপান্তরিত করায় প্রয়াসী হয়। কৃষক আন্দোলন ভারতের বিস্তৃর্ণ গ্রামাঞ্চলে বামপন্থী রাজনীতি প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

চৌরিচৌরায় কৃষকদের পুলিশ হত্যার ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। কৃষক আন্দোলন সংগ্রামী হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। আন্দোলন চলাকালীন মাঝপথে গণ-আন্দোলনকে স্থগিত রাখা হলে সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। ভারতের তরুণ ও যুব সমাজের একাংশ অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ স্থগিত রাখায় গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির উপর আস্থা হারাতে শুরু করেন। ১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরেই সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের অসংখ্য সাধারণ মানুষ ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে সামিল হ'য়ে তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়। আকস্মিকভাবে মাঝপথে গণ-আন্দোলন স্থগিত রেখে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবশীল অংশ ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করায় উদ্যোগী হ'লে বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক-কর্মীরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রকৃত পথের অনুসন্ধান করতে থাকেন।

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করায় জাতীয় বিপ্লবীদের

অবদান সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার প্রয়াসের অসারতা বুঝতে পারেন। বিশের দশকের শেষের দিকে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর' দল, 'গদর পার্টি', 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' এবং ভারতের অন্যান্য জাতীয় বিপ্লবীদের গোষ্ঠীগুলি সন্ত্রাস সৃষ্টির পথ ত্যাগ করে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থবাহী বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলনে আকৃষ্ট হন।

এই পরিস্থিতিতে জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে বামপন্থী, জাতীয় বিপ্লবী ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়—কোন পথে স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীনতার রূপ কি হবে। এই সব প্রশ্ন রাজনৈতিক কর্মীদের মনকে আলোড়িত করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে প্রকৃত পথের অনুসন্ধান। ভাবাবেগ ত্যাগ ক'রে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির অন্বেষণ শুরু হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলন ও রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তুত হয়। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের কর্মীরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে অকৃষ্ট হন। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি শহরগুলিতে মার্কসবাদের পুঁথি পুস্তক বেআইনীভাবে সংগ্রহ ও অধ্যয়নের ঝোঁক বাড়তে থাকে।

আন্তর্জাতিক পটভূমি

১৯১৭ সালে রুশ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারত সমেত সমগ্র এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটায়। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফলভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ঘোষণা করে, জাতীয় ও বর্ণগত সমানাধিকার এবং নিপীড়িত জাতিগুলির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে, আধা-সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ উচ্ছেদ ক'রে এবং অসাম্য-শোষণের অবসান ঘটিয়ে নতুন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ভারতে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গভীর প্রভাব পড়তে দেখা যায়। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং প্রভাবশীল বুদ্ধিজীবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ভিক্টোরীয় উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনকে শ্রেষ্ঠ মতাদর্শ বলে মনে করতেন। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পাশ্চাত্য উদারনৈতিক মতাদর্শের একচেটিয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে আমূল সমাজ পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শকে প্রচার করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ ক্রমশঃ

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেবলমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসূচীগুলি প্রাধান্য পায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। বিশ্বের প্রথম শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার সূচনা করে। বামপন্থী প্রভাবিত শ্রমিক-কৃষক সংগঠন এবং ছাত্র-যুব আন্দোলন জনপ্রিয় হতে থাকে। ভারতের মত বহু জাতিসত্তা, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশে জারশাসিত রাশিয়ার জাতি প্রশ্ন ও জাতি সমস্যার সমাজতান্ত্রিক সমাধান এদেশের অগ্রগামী বুদ্ধিজীবীদের সমাজতন্ত্র তথা বামপন্থী মতাদর্শে আগ্রহী করে তোলে।

১৯০৫ সালে জার শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয় যেমন ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দেলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ঠিক তেমনি ১৯১৭-এর অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রভাবিত ক'রে বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা করে। লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের কথা ঘোষিত হয়। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য এই কংগ্রেস আহবান জানায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নিপীড়িত এশিয়ার দেশগুলিতে সংগ্রামরত মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আগ্রহ প্রকাশ করে। তার ফলে ভারতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সূচনা করে। তার ফলে শিল্পে সমৃদ্ধ ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শের সংকট স্থায়ী আকার ধারণ করে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, কাজের সুবিধাজনক শর্ত এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের দাবিতে সমগ্র ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। লালা লাজপত রায়ের মত জাতীয় নেতারা গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনে

প্রভাবিত হয়ে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের তীব্র শ্রমিক আন্দোলন ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ক'রে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের একাংশ ইউরোপে গিয়ে বিদেশী শক্তির সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস চালান। তাঁদের এই প্রয়াস সফল হয় নি। কিন্তু তাঁদের অনেকে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। প্রবাসে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বরকতুল্লা, আবদুর রব প্রমুখের কার্যকলাপ ভারতে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবীর উদ্যোগে এবং ভারত-ত্যাগী মুজাহিরদের সহযোগিতায় তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। আন্তর্জাতিক পটভূমি ভারতের বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ঘটায়।

২. ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

বিশের দশককে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের দশক বলা যায়। ১৯১৭ সালে রুশদেশের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ অচিরে ভারতে এসে পড়ে। ১৯২০ থেকে ১৯২১-এর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির উদ্ভবের মধ্য দিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা হয়। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ ভারতে প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বিশের দশকের গোড়ার দিকে ভারতে প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি গঠিত হয়। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের ঔপনিবেশিক নিবন্ধ (colonial thesis) গৃহীত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের তিন বছরের পর থেকেই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ঔপনিবেশিক দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। ১৯২০ সালে মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের যুগ্ম সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। 'নবযুগে' শ্রমিক-কৃষকের কথা বেশি স্থান পেত।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রভাবে ১৯২১ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি গড়ে উঠতে থাকে। মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় 'গণবাণী'

নামে একটি সংবাদপত্রের প্রকাশ শুরু হয়। মুজফ্ফর আহমদ প্রতিষ্ঠিত কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। ১৯২২ সালে আবদুর রজ্জাক খাঁ এবং অব্যবহিত পরে আবদুল হালিম প্রমুখেরা কলকাতার পার্টিতে যোগ দেন। বোম্বাই-এর তরুন ছাত্র শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে 'গান্ধী বনাম লেনিন' (১৯২১) নামে ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী ডাঙ্গে এই পুস্তিকায় গান্ধী ও লেনিনের রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিগুলি তুলনা করে গান্ধীজীর কর্মসূচী ও কর্ম-কৌশলের সমালোচনা করেন। ১৯২২ সালে ডাঙ্গের উদ্যোগে ভারতের প্রথম মার্কসবাদী ইংরেজী সাপ্তাহিক 'সোশ্যালিস্ট' প্রকাশিত হয়। বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট গ্রুপে এস. এ. ডাঙ্গে, এস. ভি. ঘাটে, এন. যোগলেকার, আর এস নিম্বকর প্রমুখেরা যোগ দেন।

গোলাম হোসেনের নেতৃত্বে লাহোরে একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। তাসখন্দ থেকে কাবুল প্রত্যাগত মহম্মদ আলির সঙ্গে গোলাম হোসেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। গোলাম হোসেন সম্পাদিত উর্দু মাসিকপত্র 'ইনক্লাব' ছিল লাহোর দলেব মুখপত্র। ১৯২২ সালে মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠন করে 'লেবার কিষাণ গেজেট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মার্কসবাদী সংবাদপত্রগুলি যৌথ প্রচার ও সংগঠনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মানবেন্দ্র-নাথ রায়ের উদ্যোগে বিদেশে প্রকাশিত ও গোপনে ভারতে প্রচারিত 'ভ্যানগাড অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্স' (১৯২২-২৪) ও 'ম্যাসেস অব ইন্ডিয়া' (১৯২৫-২৭) পত্রিকাগুলি কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও সংগঠন গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিদেশেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে। ১৯২০ সালে নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির আহবানে সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী তরুণ মুসলমানেরা প্রবল হিজরৎ আন্দোলন শুরু করেন। হিজরৎ শব্দের অর্থ হল অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের দেশ ও বন্ধুদের ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়া। হাজার হাজার মুসলমান হিজরৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আফগানিস্থানে চলে যান। হিজরৎকারীদের ভিতর কিছু সংখ্যক যুবক ১৯২০ সালে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে উজবেকিস্তান এলাকায় পেঁছান। শেষ পর্যন্ত তাঁদের একাংশ তাসখন্দে গিয়ে সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। পরে তাঁরা মস্কোতে যান। তাঁরা মস্কোর সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ১৯২০-তে মস্কো পৌঁছন। তিনি কমিন্টার্ণের কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সেখানে প্রাচ্য ব্যুরোর অন্যতম নেতা হিসেবে ১৯২০-২৭ পর্যন্ত কাজ কাজ করেন। কমিন্টার্ণের কার্যশেষে মানবেন্দ্রনাথ তাসখন্দে যান। তিনি ও ভারতীয় হিজরৎকারীরা কমিউনিস্ট দল গঠনের উদ্যোগ নেন এবং তাসখন্দে ১৯২০ সালে ১৭ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে মানবেন্দনাথের সঙ্গে অবনী মুখার্জীর ভূমিকা স্মরণ করতে হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জী যৌথভাবে বিশের দশকে অনেকগুলি পুস্তিকা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে গোপনে সেগুলি ভারতে পাঠান। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভবে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি এবং কমিউনিস্ট পথ থেকে বিচ্যুতির অভিযোগে ১৯২৯ সালে মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত হন।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সেখানকার কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে সে সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিতর্ক হয় (Lenin-Roy debates)। লেনিন ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামকে বৈপ্লবিক বলে আখ্যা দেন। তিনি কমিন্টার্ণকে ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হতে উপদেশ দেন। ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি গান্ধীজীকে সেই পরি-প্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক বলে আখ্যা দেন (এ কমারোভ, 'লেনিন ও ভারতবর্ষ' পৃ. ৮৫)।

ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টরা কি. ধরণের রণকৌশল গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন ভারতের বামপন্থী আন্দোলনকে সঠিক পথ-নির্দেশ দিয়েছিল। কমিন্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) পেশ করা খসড়া উপনিবেশিক নিবন্ধে (থিসিস) লেনিন নিপীড়িত দেশগুলিতে বুর্জোয়া নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন করার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করলেন। তবে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের দ্বৈত চরিত্রের কথা মনে রেখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

লেনিনের বক্তব্যের বিরোধীতা করে মানবেন্দ্রনাথ রায় এই কংগ্রেসে 'সংযোগকারী নিবন্ধ' পেশ করে বললেন, ব্রিটিশ শাসনে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছে এবং পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব বুর্জোয়া নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন করা উচিত নয়। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাঁর গোঁড়ামিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বিশের দশকে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট দলগুলির পক্ষে সঠিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়নের ঐতিহাসিক যাথার্থ্য ও সত্যতা পরবর্তীকালের বামপন্থী আন্দোলনে প্রমাণিত হয়।

হিজরৎকারীরা মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার পর অশেষ কষ্ট ভোগ করে, ব্রিটিশ সীমান্ত গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ভূখণ্ডে পৌঁছে যান। কিন্তু সেখানে ভারতীয় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে পেশোয়ার জেলে নিয়ে যায়। ১৯২২-২৩ সালে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এই মামলাই ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট বিরোধী মামলা। পেশোয়ার মামলা রুজু করার পরই দেশে বিদেশে ভারতীয় কমিউনিস্টদের কার্য-কলাপ এবং ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ চিরতরে বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ সালে মুজফ্ফর আহমদ, এস এ ডাঙ্গে, সৌকত উসমানী প্রমুখদের গ্রেপ্তার করে এবং তাঁদের ভারতে বলশেভিকবাদ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। এই মামলা কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) নামে খ্যাত। ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ পরিচালনা করা, শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করা, কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করা ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয়েছিল বন্দীদের বিরুদ্ধে। বন্দীদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা ভারতে বলশেভিকদের এজেন্টরূপে কাজ করছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন উদ্ভবের পটভূমি যখন সবেমাত্র প্রস্তুত হতে চলেছে ঠিক সেই সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (১৯২০) প্রতিষ্ঠা হয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলেও ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকার এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবি ধ্বনিত করে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইতিহাসে দেখা যায় সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের

বিরুদ্ধে শ্রেণী সচেতন বামপন্থী দলগুলি সংগঠনে প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মতাদর্শের তীব্র লড়াই চালিয়েছে।

১৯২০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি গড়ে ওঠে। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা এবং কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার সরকারি বিবরণ ভারতের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের ব্যাপক প্রচার করে। বিভিন্ন প্রদেশের কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে কমিউনিস্টরা সচেষ্ট হলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা হিসাবে খ্যাত মৌলানা হসরৎ মোহানীর নেতৃত্বে সংহতি-সম্মেলনের জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ফলত, ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সভাপতিত্বে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সর্বপ্রথম সম্মেলন আহূত হয়। মুজফ্ফর আহমদ, এস. বি. ঘাটে, কে এন. যোগলেকার, আর এস নিম্বকর প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কানপুর সম্মেলনে উপস্থিত হলেন। এই সম্মেলন বোম্বাই-এ কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠাসহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে প্রয়াসী হয়। অতঃপর এস বি ঘাটে ও জানকী প্রসাদ বাগেরহাট্টাকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে ভারতের সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপ-গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ফিলিপ স্প্র্যাট, ফ্রান্সিস ব্র্যাডলে ও জর্জ এলিসন ভারতে এসে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের সাহায্য করেন।

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবে ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পিজ্যান্টস পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্বের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে বিক্ষুব্ধ বাংলা দেশে কিছু জাতীয়তাবাদী কর্মী ১৯২৫ সালে 'লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠন করেন। এই দল 'লাঙল' নামে একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ করে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর মুজফ্ফর আহমদ 'লাঙলে'র পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পরের দিনই 'লাঙল' নামের পরিবর্তন করে 'গণবাণী' নাম রাখা হয়। 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র' উদ্যোগে ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে একটি কৃষক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে লেবার স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তন করে 'পিজ্যান্টস

এ্যান্ড ওয়ার্কার্স' পার্টি অব বেঙ্গল' নাম রাখা হয়। পরে এই নামটি বদলে ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি হয়। ১৯২০-এর দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত না হলেও তার নামে খোলাখুলি কাজকর্ম করার অসুবিধা ছিল। সেজন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যে সব কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সে সব কাজের বেশির ভাগই ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টির মঞ্চ থেকে রূপায়িত হত।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি গঠনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলন প্রসারের প্রচেষ্ঠা চলে। ১৯২৭-এর শুরুতে বোম্বাই-এ ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি গঠিত হয়। এস এস মিরাজকর তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে সোহন সিং জোশের উদ্যোগে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কিরতী কিষাণ পার্টি'। ঐ বছরে মীরাট সম্মেলনে যুক্ত প্রদেশে ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি গঠিত হয়। পি সি যোশী হলেন তার সম্পাদক। ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টির সারা ভারত সম্মেলন ডাকা হয়। এই সময়ে কমিউনিস্টরা বিভিন্ন প্রদেশের দলগুলিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি গঠনে উদ্যোগী হন।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেস ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টির সম্মেলনে বাণী পাঠায়। এই বাণীতে বলা হয় যে ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান নয়। এই বাণীতে শ্রমিক ও কৃষককে দুটি আলাদা শ্রেণী দেখিয়ে ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজ্যান্ট পার্টি গঠনে সমালোচনা করা হয়। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মূল ভিত্তি হল একটি শ্রেণী এবং তা হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। নবগঠিত সারা ভারত ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে, জমিদারী প্রথার অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ক'রে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত (১৯২৮) ওয়ার্কার্স' এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ৩০,০০০ শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মিছিল কলকাতায় অধিবেশন রত জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চের কাছে গিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমিকদের সামনে ভাষণ দেন। সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ও

বিক্ষোভ মিছিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিউনিস্টরা যোগ দেন।

সারা ভারতে কমিউনিস্টদের প্রভাব যখন বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে; কমিউনিস্টরা ১৯২৯-এ মার্চ মাসের মধ্যভাগে বোম্বাই-এ মিলিত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে ১৯২৯-এ ২০শে মার্চ ব্রিটিশ সরকার ভারতের শ্রমিক, কমিউনিস্ট ও জাতীয় আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এই বন্দী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী যোদ্ধারা। ভারতের তরুণ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৪ জন সদস্য, বহু শ্রমিক নেতা, ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টির নেতা, সাংবাদিক এবং তিনজন ব্রিটিশ নাগরিককে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে মুজফ্ফর আহমদ, এস. বি. ঘাটে, এস. এ. ডাঙ্গে, পি. সি. যোশী, ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী, বি. এফ. ব্রাডলে, ফিলিপ স্প্র্যাট এবং এইচ. এল. হ্যাচিনসন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিশাল মামলা সাড়ে চার বছর চলে এবং এই মামলা চালাতে ব্রিটিশ সরকারের ব্যয় হয় প্রায় ১,৬০,০০০ পাউন্ড।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মতাদর্শকে অংকুরে বিনাশ করার জন্যই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন। আলবার্ট আইনষ্টাইন প্রমুখ বিশ্বের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিন্দা করেন। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কেউই তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করা অথবা কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করার অভিযোগ অস্বীকার করেন নি। উপরন্তু তাঁরা প্রকাশ্য আদালতে বিবৃতি দিয়ে রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে মার্কসবাদকে প্রচার করে ভারতে একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। কমিউনিস্টরা যে ভাবে দিনের পর পর দিন আদালতের কক্ষ থেকে সরকারি ব্যয়ে তাঁদের মতাদর্শকে প্রচার করেছিলেন তার নজির ইতিহাসে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। এই মামলা নিঃসন্দেহে ভারতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার, কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন ও বামপন্থী আন্দোলন প্রসারে খুবই সহায়ক হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগেসের মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহেরু যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক হয়ে আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য 'মীরাট ডিফেন্স কমিটি' গঠন করেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব (১৯১৭),

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আহবান (১৯২০), প্রবাসী ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবীদের প্রয়াস এবং হিজরৎকারীদের দেশত্যাগের ফলে প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা করে। ফলত, ১৯২০-২৩ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি গড়ে ওঠে। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র ও কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে বামপন্থী আদর্শের ব্যাপক প্রচার হয়। ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি গঠন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন বামপন্থী আন্দোলনকে প্রাথমিক স্তরে সংঘবদ্ধ করায় প্রয়াসী হয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপক প্রচার এবং প্রকাশ্য আদালতে বন্দীদের কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের পর্বকে সম্পূর্ণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাসখন্দে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসকে বামপন্থী মতাদর্শ ও কর্মসূচীতে প্রভাবিত করার প্রয়াস চলতে থাকে। বামপন্থী আন্দোলন উদ্ভবের প্রথম যুগে ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯২১ সালে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা একটি ইশতেহার প্রেরণ করেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জীর নামে এই ইশতেহারটি মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এই ইশতেহারকে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম দলিল বলা যায়। ভারতে বামপন্থী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট উদ্ভব সূচিত ক'রে এই ইশতেহার শ্রমিক-আন্দোলন ও কৃষকের সংগ্রামের তাৎপর্যকে তুলে ধরে এবং ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তি ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে। এই ইশতেহারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতা মৌলানা হাসরৎ মোহানী জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে সর্বপ্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯২২ সালে গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্টরা প্রতিনিধিদের বিবেচনার জন্য একটি কর্মসূচী প্রেরণ করেন। ১৯২২ সালে কমিউনিস্টদের প্রেরিত কর্মসূচীকে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম লিখিত কর্মসূচী বলা যায়। এই কর্মসূচীতে বলা হয়েছে : ১ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার ও বৈদেশিক তত্ত্বাবধানমুক্ত পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ; ২ সার্বজনীন ভোটাধিকারের

ভিত্তিতে জাতীয় আইনসভা গঠন; ৩. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন। এই কর্মসূচীকে কার্যকর করার জন্য ১৩-দফা দাবি যুক্ত করে 'অ্যাকশন প্রোগ্রাম' ঘোষণা করা হয়। সেগুলির মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করা এবং সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেবার অধিকারের কথা বলা হয়। জাতীয় কংগ্রেসকে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য তহবিল গঠনের আহবান জানানো হয়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসকে শ্রমিক-কৃষকের অর্থনৈতিক আন্দোলনের পাশে সমবেত হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিশের দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কমিউনিস্টদের ইশতেহার ও কর্মসূচী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ও বামপন্থী কর্মসূচী উপস্থাপিত করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলির গড়ার কাজে যারা নেমেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য।

৩. ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ

তিরিশের দশককে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশের দশক বলা যায়। বিশের দশকের শেষ ও তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নই কমিউনিস্ট কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং এতে বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। শ্রমিক আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পিজাণ্টাস পার্টির প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই দল বিভিন্ন প্রস্তাবে ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আহবান জানায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকের ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তোলার চেষ্টা করে। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে কমিউনিস্টরা বাংলা, পাঞ্জাব ও বোম্বাই-এর শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের পথে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) গৃহীত সংকীর্ণতাবাদী প্রস্তাব কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। ১৯30 সালে কমিণ্টার্ণ মুখপত্রে প্রকাশিত 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির খসড়া কর্মপন্থা থেকে' দেখা যায় যে তৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতির পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা ও সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের সেই সময়ের পটভূমিকায় ঐ আহবান সংকীর্ণতাবাদেরই নামান্তর।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের খসড়া কর্মপন্থায় হঠকারিতা ও সংকীর্ণতাবাদ ঘোষিত হওয়ার দরুণ ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সাময়িকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়। পরস্পর সম্পর্কবিহীন বিচ্ছিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেদের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। এই সময়কার কমিউনিস্ট আন্দোলোনের অবস্থা প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহমদ বললেন, 'সারা দেশে পার্টির বিচ্ছিন্নতা চরম আকারে দেখা দিল।' তার ফলে কমিউনিস্টরা সাময়িকভাবে জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে দূরে সরে যান।

তিরিশের দশকের প্রথম দিকে কমিউনিস্টরা দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতের বামপন্থী আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের তদানিন্তন পরিস্থিতি ও দুর্বলতা বিবৃত করে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন বন্দী জেল থেকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কাছে রিপোর্ট পাঠান। অন্যান্য সূত্র থেকেও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পায়। ফলে কমিন্টার্ণ ও বিশ্বের কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় কমিউনিস্টদের ত্রুটি সংশোধনে উদ্যোগ নেয়। প্রথমে ১৯৩২ সালে কমিন্টার্ণের মুখপত্রে চীন, জার্মানী ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি যুক্ত স্বাক্ষরে 'ভারতের কমিউনিস্টদের প্রতি খোলা চিঠি' প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী সংকীর্ণতার সমালোচনা ক'রে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগ নেবার সুপারিশ করা হয়। পরের বছর (১৯৩৩) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্টদের নামে আর একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করে। এই চিঠিতে ভারতের কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা করে সারা ভারতে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন বন্দী আদালতের রায়ে ১৯৩৩ সালে মুক্ত হন। সদমুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হন। এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৩ সালে শেষের দিকে কলকাতায় পার্টির একটি গোপন সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে পার্টির নতুন রাজনৈতিক প্রস্তাব ও নতুন গঠনতন্ত্র রচিত হয়। এই সঙ্গে পার্টির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গে পরিণত হয়। (মুজফ্ফর আহমদ: 'ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ', পৃ ৩১)

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর থেকেই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে জঙ্গীভাব ফিরে আসে। ১৯৩৪ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ঐক্য ফিরে আসে। ঐ বছরে বোম্বাইয়ে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট পরিচালনা করে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে স্তিমিত ভাব দেখা দেয়। ১৯৩৪ থেকে শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার আকার ধারণ করলে ব্রিটিশ সরকার আতংকগ্রস্ত হয়ে প'ড়ে ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলেও শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে নি।

তিরিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে যুক্তফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গী রূপায়ণে কমিউনিস্টরা উত্তরোত্তর বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল এবং জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদ আরও উগ্র ও নগ্ন মূর্তিতে ফ্যাসিবাদে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহবান জানায়। সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে জর্জি দিমিত্রভ ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। সপ্তম কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট নয়, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি অর্জন ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা প্রয়োজন।

দিমিত্রভের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের তত্ত্বটিকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্র্যাডলে 'ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট' (The Anti-Imperialist Peoples Front in India) নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি দত্ত-ব্র্যাডলে তত্ত্ব (১৯৩৬) নামে সমধিক পরিচিত। এই প্রবন্ধে বলা হয়ঃ 'পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেস সোসালিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।'

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট গঠনের আহবানে সাড়া দিয়ে জাতীয়বাদী কর্মী ও জাতীয় বিপ্লবীরা ব্যাপকভাবে বামপন্থী

আন্দোলনে সমবেত হন। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে কেরালার বামপন্থী কংগ্রেসীরা ঐ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করেন। ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, এ. কে. গোপালন প্রমুখ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতারা কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই সময় কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। খণ্ডিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আবার পুনর্মিলিত হয়। কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে সারা সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শ ও আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

তিরিশের দশক থেকে জাতীয় বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদে মোহমুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। আন্দামান সেলুলার জেলের জাতীয় বিপ্লবীরা 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন' গঠন করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করেন। এই সময় সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং আব্দুল হালিম আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতায় ডঃ নারাণ রায় সেলুলার জেলে জাতীয় বিপ্লবীদের 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন' গঠন করে যৌথভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ অধ্যয়নের প্রয়াস চালান। 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর', 'রিভোল্টিং গ্রুপ', 'চট্টগ্রাম গোষ্ঠী', 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' গোষ্ঠী এবং 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের' বেশ কয়েকজন জাতীয় বিপ্লবী 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে' যোগ দেন। 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের' বেশির ভাগ সদস্যই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। জাতীয় বিপ্লবীদের বেশির ভাগ সন্ত্রাসবাদী পথ পরিত্যাগ করে বামপন্থী মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেন। ভগত সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় বিপ্লবীদের 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যরা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। তরুণ ভগত সিং আদালতের কক্ষে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীকে সমর্থন করে জাতীয় বিপ্লবীদের বামপন্থী চিন্তাধারাকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেন।

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গান্ধীজী লবণ-সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করে শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন। তিনি ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য

আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ আন্দোলনের আহবান জানান। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী অংশ গান্ধীজীর এই আহবানে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। ১৯৩৩-এর মে মাসে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী ও নেতারা কংগ্রেসের মধ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তার ফলে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। বোম্বাই শহরে সারা ভারত থেকে আগত প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১৯৩৪-এর অক্টোবরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সম্পূর্ণানন্দ সভাপতি নির্বাচিত হন। দিল্লী থেকে রামমনোহর লোহিয়া ও আনসারি, বিহার থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ, উত্তর প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণানন্দ ও মোহনলাল গৌতম, বোম্বাই থেকে মিনু মাসানী, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ও এস এ ব্রেলভি, মহারাষ্ট্র থেকে অচ্যুত পটবর্ধন, কেরালা থেকে পি. কে পিল্লাই. এ কে গোপালন, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখেরা বোম্বাই সম্মেলনে যোগ দেন।

কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি নাম গ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মীরাট সম্মেলনে (১৯৩৬) বলা হয় যে, 'সমাজতন্ত্রী' শব্দের আগে 'কংগ্রেস' শব্দটি গ্রহণের অর্থ হল জাতীয় আন্দোলনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করার লক্ষ্যকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল আশু কর্তব্যরূপে চিহ্নিত করে। কারণ সমাজতন্ত্রী আন্দোলন বৈদেশিক ও দেশীয় শোষণ থেকে ভারতীয়দের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে একথা ঘোষণা করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সমবেত করাকে অন্যতম আশু কর্তব্যরূপে ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্বের কর্মসূচী ও কার্যাবলীতে যে সব তরুণ কংগ্রেস কর্মী হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের 'সমাজতন্ত্র কেন' (Why Socialism) বইটি তাঁদের আশার আলো দেখাল।

১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বাৎসরিক সম্মেলনে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল জাতীয় কংগ্রেসকে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করার কথা ঘোষণা করে। এই সম্মেলনে দলকে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন পরিচালনাব দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে ভারতে শ্রমিক ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে দলকে পরিচালনার কথা বলা হয়। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দের একাংশ মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র গ্রহণ ক'রে গান্ধীবাদী মতাদর্শের সমালোচনা করেন। সমাজতান্ত্রিক

মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখানো সত্ত্বেও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের বেশীর ভাগ নেতারা গান্ধীজীর অনুগামী রক্ষণশীল নেতৃত্বকে সমর্থন করেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উচ্চ নেতৃত্বের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দলের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট মতাদর্শের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ, ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ এবং গান্ধীবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আচার্য নরেন্দ্র দেব মার্কসীয় মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন, মিনু মাসানী এবং অশোক মেহতা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং অচ্যুত পটবর্ধন এবং রামমনোহর লোহিয়া গান্ধীবাদী অহিংস প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের প্রবক্তা ছিলেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের আদিপর্বের উচ্চ নেতৃবৃন্দের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মধু লিমায়ে বলেছেন, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা থেকেই এই দলের বহুরূপতা প্রকাশ পায়। কারণ দলের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃষ্টি-ভঙ্গীর অবস্থান দেখা গিয়েছিল। মধু লিমায়ের মতে, 'The CSP···initially had no clearly-defined ideology'. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রবাদকে দলের মতাদর্শ বলে ঘোষণা করলেও তাঁরা প্রত্যেকে গান্ধীজীর সম্মোহিনী ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নেতৃত্বের প্রতি খুবই আস্থাবান ছিলেন। তাঁরা জওহরলাল নেহরুকে জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী অংশের নেতা বলে মনে করতেন। অর্থ-নৈতিক সংকটের দরুণ সারা ভারতে কৃষক অসন্তোষের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেলে, ভূমি বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের গুরুত্বে বিশ্বাসী বামপন্থী-ভাবাপন্ন রাজনৈতিক দল ও কর্মীরা শ্রেণীভিত্তিক পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে তোলায় অগ্রণী হলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে বামপন্থী দলগুলি ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষকদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মিরাট অধিবেশনে (১৯৩৬) সারা ভারত কৃষক সভার সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে লখনৌ শহরে স্বামী সহজানন্দের সভাপতিত্বে সারা ভারত কৃষক সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে।

তিরিশের দশকের প্রথম দিক থেকে জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী শক্তির সুস্পষ্ট উদ্ভব ঘটে। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রী দল গঠন বামপন্থী শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। বিশের দশকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল। ১৯২৫-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। অপর দিকে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভারতে সমাজতন্ত্রী দল গঠনের প্রয়াস চলে। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠন সেই প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করে।

বিশের দশক থেকে আরম্ভ করে তিরিশের দশক পর্যন্ত ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন খুব শীঘ্র বেশ কিছু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর মোহমুক্তি ঘটায়। তাঁরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক পরিচালিত শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যকে যুক্ত করে ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলন অথবা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও বহু ব্যক্তি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করে ভারতে বামপন্থী রাজনীতির উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশের এবং তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রায় সবাই জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন।

তিরিশের দশকে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে প্রাধান্য পায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হয় নি। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে নি। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ নেতারা তিরিশের দশকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সমর্থক বলে পরিচিতি লাভ করলেও, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল

থেকে বহিষ্কৃত হবার পর মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে আসেন এবং তিনি ও তাঁর অনুগামীরা বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে না থেকে তৃতীয় শক্তিরূপে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করেন। কেউ কেউ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রভাবের কথা বলে থাকেন।

৪ জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী : জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র

অসহযোগ আন্দোলন অকস্মাৎ স্থগিত রাখা হলে সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে হতাশার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম মাঝপথে স্থগিত রাখায় তাঁদের অনেকের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ও ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। ১৯২০-এর দশকে বিদেশ থেকে আসা নতুন চিন্তাধারা কংগ্রেস কর্মীসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রভাবিত করে। আয়ারল্যান্ড ও ইজিপ্টের জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা, তুরস্কের সামাজিক পরিবর্তনের সংবাদ এবং সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংবাদ তরুণ কংগ্রেস কর্মীদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

বিশের দশকে জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও শিল্প শ্রমিকের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর নতুন মতাদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ ভারতে একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকাশলাভ করে। নতুন মতাদর্শের প্রভাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী অংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায়। এই সময় কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবিত করায় প্রয়াসী হন। তাসখন্দে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) একটি ইশতেহার এবং গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) একটি বামপন্থী কর্মসূচী প্রেরণ করে। এই ইশতেহার ও কর্মসূচীতে জাতীয় কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে এবং কৃষিক্ষেত্রে আমূল ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব স্বীকারের আবেদন জানানো হয়। বিশের দশকে জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। কংগ্রেসের বামপন্থীর শক্তি ও চিন্তাধারার নেতৃত্ব করেন জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২৬ সালে জওহরলাল নেহের‍ু ইউরোপে যান এবং সেখান বহ‍ু সোশ্যালিস্ট এবং কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৯২৭ সালে তিনি ব্রাসেলসে 'কংগ্রেস অব দি লীগ অব অপ্রেসড পিপলস'-এ (Congress of the League of Oppressed Peoples) যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং ব্রাসেলসের সংগঠনের কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭-এর নভেম্বরে তিনি র‍ুশ বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্য মস্কোয় যান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতিতে তিনি ম‍ুগ্ধ হন; বিশেষ করে তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি 'সোভিয়েত রাশিয়া' (Soviet Russia) নামে একটি ইংরাজী প‍ুস্তক প্রকাশ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের ফলে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব এবং নিপীড়িত মান‍ুষের জন্য সেই দেশের সহান‍ুভূতি সম্পর্কে তিনি স‍ুনিশ্চিত হন।

'ডোমিনিয়ন স্টেট্যাটাস' বনাম প‍ূর্ণ স্বাধীনতার রাজনৈতিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসে সংগ্রামম‍ুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও শক্তিগ‍ুলির সমাবেশ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প‍ূর্ণ স্বাধীনতার রাজনৈতিক লক্ষ্য জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী শক্তিগ‍ুলিকে শক্তিশালী করে। জওহরলাল নেহের‍ু এবং স‍ুভাষ-চন্দ্র বস‍ু সংগ্রামম‍ুখী তর‍ুণ কংগ্রেস কর্মীদের নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তিকে সংঘবদ্ধ করেন। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সারা ভারত ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজান্টস পার্টি গঠিত হবার পর কংগ্রেসে বামপন্থী প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে মাত্র ২৪ বছর বয়সে স‍ুভাষচন্দ্র বস‍ু ভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। প্রথম থেকেই স‍ুভাষচন্দ্র সংগ্রামম‍ুখী রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখায় তিনি বিক্ষ‍ুব্ধ হন। তিনি প‍ূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে জাতীয় আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করেন। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচার য‍ুক্ত করে তিনি বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করেন। ব্রিটিশের জেল থেকে ম‍ুক্ত হবার পর তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনকে জোরদার করায় সচেষ্ট হন।

১৯২৭ সালে অন‍ুষ্ঠিত মাদ্রাজ কংগ্রেসে তথা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে

বামপন্থী দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রতিফলন দেখা গেল। জওহরলাল নেহরু তখন তাঁর দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণ সেরে ভারতে ফিরেছেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে জওহরলাল কর্তৃক উত্থাপিত এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের দ্বারা সমর্থিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে গান্ধীজী 'না ভেবেচিন্তে, তাড়াহুড়ো করে নেওয়া' বলে এই প্রস্তাবকে সমালোচনা করেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেস সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম'-এর (International League Against Imperialism) সদস্যভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কর্মীদের নেতা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর থেকে বামপন্থী শক্তির প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখের দ্বারা গঠিত 'ইনডিপেন্ডেন্স অব ইণ্ডিয়া লীগকে' (Independence of India League কেন্দ্র করে তরুণ বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের সমাবেশ ঘটতে থাকে। কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্ব পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকেই' জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করায় সচেষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) বামপন্থী শক্তির চাপে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জয় হয়।

ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরে জহওরলাল সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজতন্ত্রবাদের মতাদর্শ প্রচার করেন। তার ফলে জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী চিন্তাধারা শক্তিশালী হয়। জওহরলাল সদ্যপ্রতিষ্ঠিত যুব লীগ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি 'সারা ভারত কিষাণ সভা' ও 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকের সংগঠনগুলিকে সংযুক্ত করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি শ্রমিক ও কৃষকের সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসকে দিয়ে কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়ে জওহরলাল তাঁর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী রূপায়িত করেন। এই অর্থনৈতিক কর্মসূচী বৈপ্লবিক

না হলেও এর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার ছাপ দেখা যায়। ১৯৩১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল কতকগুলি অর্থনৈতিক কর্মসূচীর তালিকাকে অনুমোদন করিয়ে নেন। 'জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি পাবার অধিকার, উত্তরাধিকার করের প্রবর্তন, কৃষি আয়ের উপর আয়কর ধার্য, কৃষকের খাজনা হ্রাস, মূল শিল্পগুলিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার' মত কতকগুলি অর্থনৈতিক কর্মসূচী করাচী অধিবেশনে গৃহীত হয়। ১৯৩৬ সালে গৃহীত কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে এই অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতাদর্শকে সমালোচনা ক'রে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। বিশের দশকে তিনি ছাত্রসভায় গান্ধীজীর সবরমতী ও অরবিন্দ ঘোষের পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারাকে সমালোচনা করেন। তিনি গান্ধীজীর অহিংসনীতি এবং চরকার অর্থনৈতিক মতবাদকে কখনও গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি গান্ধীজীর অহিংস রাষ্ট্রদর্শনের কঠোর সমালোচক ছিলেন। জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দলের জাতীয় বিপ্লবীদের অনেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৩১ সালে তিনি ভারতের জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি শ্রমিক ও কৃষককে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত করার কথা ভেবেছিলেন।

জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। কংগ্রেসের প্রখ্যাত রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সংস্রব পরিহার করে চলতেন। অবশ্য গান্ধীজী বিশের দশকের প্রথম দিকে আমেদাবাদে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কখনও প্রয়াসী হন নি। তাঁরা ভারতের ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে বিভিন্ন সময়ে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯২৮ সালে জামসেদপুরে টাটাদের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরা দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যস্থতায় ধর্মঘটের বিরোধগুলির নিষ্পত্তি হয় এবং ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহেরু সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত 'রয়্যাল কমিশন অন লেবারে' যোগদান সম্পর্কে সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট

ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ করে 'রয়্যাল কমিশনের' সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯৩১ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কলকাতার কাছে বাউড়িয়ার জুট মিলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ সরকার ও মালিকপক্ষ নির্মম অত্যাচার চালালে জওহরলাল নেহেরু ঐ অঞ্চলে চলে আসেন এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। সারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি বাউড়িয়ার ধর্মঘটী শ্রমিকের পাশে সমবেত হতে অনুরোধ করেন। ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ৩০,০০০ শ্রমিক মিছিল করে সভামঞ্চের কাছে যান। শ্রমিকদের এই সভায় জওহরলাল সভাপতিত্ব করেন এবং বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আর. এস. নিম্বকর প্রমুখরা ভাষণ দেন। সভায় শ্রমিকরা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

তিরিশের দশক থেকে জাতীয় কংগ্রেসে রক্ষণশীল চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের বিকল্প হিসাবে বামপন্থী শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেতে থাকে। এই সময় বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তীব্র সংকট, জার্মানীতে ফ্যাসি-নাৎসীবাদের উদ্ভব, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের মত ঘটনাগুলি ভারতে বামপন্থী শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশে খুবই সহায়ক হয়। ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তির উদ্ভব জওহরলাল নেহেরুকে খুবই উদ্বিগ্ন করে। ১৯৩৩ থেকে তিনি ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিপদ থেকে ভারতকে মুক্ত করার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। তাঁর প্রভাবে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশল সম্পর্কে সতর্ক হন। তাঁরা মনে করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে শীঘ্রই একটা বোঝাপড়ায় আসবে এবং তার ফলে রক্ষণশীল শক্তি হয়ত জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৯৩৪-এ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী অংশকে শক্তিশালী করে। ১৯৩৩-৩৬ সালের মধ্যে জওহরলাল নেহেরুর বামপন্থী ও সংগ্রামমুখী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। ১৯৩৩-এ তিনি 'হুইদার ইণ্ডিয়া' ? (Wither India ?) নামে একটি ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে প্রবলভাবে সমর্থন করেন। সমাজ-

তান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতীয়দের দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সংকট সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি প্রকাশ্যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে বর্ণনা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এশিয়ার ঔপনিবেশিকবিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করে নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার কথা বলেন।

১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসে জওহরলাল নেহেরু সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। কংগ্রেস ইতালি এবং জাপানের আক্রমণমুখী নীতির নিন্দা ক'রে আবিসিনিয়া, চীন এবং প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের সংগ্রামী মানুষদের সমর্থন করে। জওহরলাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনজন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতাকে সদস্য মনোনয়ন করেন। ১৯৩৬-এর ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে 'সারা ভারত কিষাণ সভার' ন্যূনতম দাবিসংবলিত ইশতেহারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনকে মনে রেখে রক্ষণশীল নেতৃত্ব ঐ বছরে জওহরলালকে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত করেন। জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃত্বের ভাবমূর্তি ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বিপুল সাফল্য অর্জনে খুবই সহায়ক হয়। পর পর দুবছর জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থেকে জওহরলাল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করায় অনেকাংশে সফল হন। এই সময় সারা ভারতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব আন্দোলন ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আন্দোলন জোরদার হয়।

তিরিশের দশকের শেষের দিকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা জাতীয় কংগ্রেসে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী শক্তি গঠনে প্রয়াসী হন। বামপন্থীরা কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্ব ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলে বামপন্থী শক্তিগুলি উৎসাহিত বোধ করে। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাসনা প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী শক্তির সমর্থনে সুভাষচন্দ্র রক্ষণশীল প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত

করে কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন

পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করেন। সুভাষচন্দ্রের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করার জন্য ত্রিপুরী কংগ্রেসে গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে কংগ্রেস সভাপতিকে গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব বামপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও উপস্থিত অধিকাংশ প্রতিনিধিদের সমর্থনে গৃহীত হয় এবং তার ফলে সুভাষচন্দ্র চরম অসুবিধার মধ্যে পড়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেন।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতিপদে ইস্তফা দিলে রক্ষণশীল বলে পরিচিত গান্ধীবাদী নেতা ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ফরোরার্ড ব্লকের উদ্যোগে ভারতের বামপন্থী শক্তিগুলিকে সমবেত করায় প্রয়াসী হন। ১৯৩৯-এর জুন মাসে তিনি কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দল, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের সমর্থনে বাম সংহতি কমিটি (Left Consolidation Committee) গঠন করেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল এবং কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। তাঁরা বিকল্প সংগঠন হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের অগণতান্ত্রিক নির্দেশের বিরুদ্ধে সারা ভারতে সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ দিবস পালনের আবেদন করেন। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগে সুভাষ-চন্দ্রের বিরুদ্ধে তিন বছরের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসে বামপন্থী শক্তিহিসাবে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য রক্ষণশীল নেতৃত্ব তৎপরতার সঙ্গে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

শ্রমিক-কৃষকের সংগঠন ও আন্দোলন এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের সামন্ত-বিরোধী আন্দোলনের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বিকল্প শক্তি দানা বাঁধতে থাকে। এই বামপন্থী শক্তি ১৯৩৭-এর নির্বাচনে গঠিত মন্ত্রি-সভার রক্ষণশীল কার্যকলাপ এবং হাইকম্যাণ্ডের রক্ষণশীল নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমর্থক ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির কর্মতৎপরতায় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাসচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত

হলে বামপন্থী শক্তিগুলি আরো সংহত হয়। ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর থেকে কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তিগুলি পুনরায় দুর্বল হয়ে পড়ে।

কংগ্রেসের রক্ষণশীল ও বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বামপন্থী অংশ সর্বভারতীয় রক্ষণশীল নেতৃত্বের প্রভাব ও সাংগঠনিক শক্তিকে কখনও দুর্বল করতে পারে নি। বামপন্থী শক্তির প্রভাব সারা ভারতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় নি। বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের মত শিল্পোন্নত প্রদেশগুলিতে বামপন্থীদের প্রভাব এবং মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর—কোচিনে বামপন্থীদের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। তিরিশের দশকের শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী শক্তি ঝাঁঝালো গোষ্ঠীর মত সক্রিয় ছিল। জাতীয় আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করা ও প্রাধান্য বজায় রাখার মত শক্তি বামপন্থীরা তখনও অর্জন করে নি।

জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি সমূহের নেতারূপে জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। জওহরলাল সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সমর্থক ছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে প্রচার করেন। তিরিশের দশকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটলে জওহরলাল সাম্যবাদকে সমর্থন করে ফ্যাসিবাদকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সুভাষচন্দ্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা ভাববাদী সমাজতন্ত্রে অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পারেন নি। তিনি ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় চেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে 'Daily Worker' দৈনিকের প্রতিনিধি রজনীপাম দত্তের প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন যে, 'সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের সমন্বয়' বিষয়টিকে উল্লেখ করে তিনি সন্তুষ্ট হন নি, কারণ তিনি যখন সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন সেই সময় 'Fascism had not started on its imperialist expedition'. সুভাষচন্দ্র সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রবক্তা ছিলেন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পণ্টডাম মহাফেজখানায় (Postdam Archives) রক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দলিলগুলি থেকে জানা যায় সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য

তিনি জার্মানীর সাহায্য চেয়েছিলেন।) আপোষহীন প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির জন্য হিটলারের অনুচরবর্গ সব সময়ে সুভাষচন্দ্রকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করত। শত্রুর শত্রু তৃতীয় পক্ষের বন্ধু এই দৃষ্টিভংগীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

(সুভাষচন্দ্রের মত আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতে জাপানের ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্বকে কখনো মেনে নিত না। ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে জাপানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন; অবশেষে তাঁরাই দেশ থেকে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করতে আত্মগোপন ক'রে মুক্তি যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে হয়ত জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করতে হ'ত।)

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব

১. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও ভারতের পরিস্থিতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পুঁজিবাদী বিশ্বে শিল্প উৎপাদনে সংকট দেখা দেয়। ১৯২০ থেকে বিশ্বে কৃষি সংকটও শুরু হয়েছিল। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আপেক্ষিক ও আংশিক সুস্থিতি এলেও তা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তারপর ১৯২৯-এ আসে পুঁজিবাদের ইতিহাসে মারাত্মক ও কঠিনতম বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট। এই সংকট বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অতি দীর্ঘস্থায়ী এক মন্দাবস্থা এনেছিল। ১৯২৯ ৩৪-এর বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চরম সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। এতদিন ধরে পুঁজিবাদী বিশ্বে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল স্বর্ণ বিনিময় মূল্যের (gold standard) মানদণ্ডে। ১৯২৯—৩৪-সালের বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বর্ণ বিনিময় মূল্যের মানদণ্ড প্রচণ্ডভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত এই মানদণ্ডের অবসান ঘটে।

১৯২৯ - ৩৪-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থা ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় উদ্যোগ ও মূলধনে গড়ে ওঠা তুলা-জাত শিল্প (cotton textile industry) বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুলা-জাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মুনাফা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নি। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার বছরগুলিতে ভারতের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংরক্ষিত শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভারতীয় শিল্প মালিকদের চাপে বাধ্য হয়েই ঔপনিবেশিক সরকার এই দেশে বিশেষ কয়েকটি শিল্প ক্ষেত্রে সংরক্ষিত শুল্ক ব্যবস্থা চালু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংযোগ আরো দৃঢ়তর হয়। তার ফলে ভারতের কয়েকটি শিল্পে উন্নতি দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতের যে কয়েকটি শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, ১৯২৯ - ৩৪ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থা সে শিল্পগুলিকে প্রবলভাবে আঘাত করল। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয় পুঁজিপতি

ও শিল্পমালিকদের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্ব পংজিবাদী ব্যবস্থার স্ববিরোধ ঘনীভূত হয়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কিছুটা পরিমাণে সাময়িকভাবে দুর্বল হয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সাময়িকভাবে হ্রাস পেলে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার এ দেশে সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ, ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি সাময়িক-ভাবে কমে গেলে ভারতীয় শিল্পপণ্যের চাহিদা বাড়ে। এই সময় বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের হার কিছুটা পরিমাণে সংকুচিত হয়েছিল। ব্রিটিশ বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কমে গেলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির গাঁটছড়ায় বাঁধা, ভারতে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক মূলধন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস পেলে এই সব সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের অনেকে কর্মচ্যুত হয় এবং তাদের পুনর্নিয়োগের সম্ভাবনা নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়।

১৯২৯-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। শিল্প পণ্যের তুলনায় কৃষিপণ্যের বাজার দর অস্বাভাবিকভাবে নেমে যায়। গমের দর শতকরা ৫০ ভাগ এবং পাটের দর শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৬৫ হ্রাস পায়। অপরদিকে সংকট মোকাবিলায় ঔপনিবেশিক শাসন ভূমি খাজনা বাড়িয়েছিল। ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক দুর্গতি চরমে উঠেছিল। গরীব ও প্রান্তিক কৃষক ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রকৃত কৃষকের জমি ভূস্বামী, মহাজন এবং ধনী কৃষকের মালিকানায় চলে গিয়েছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজার দর নেমে গেলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল কয়েক শত কোটি টাকা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ভারতের শহর ও আধা-শহরাঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ছোট ছোট কলকারখানাগুলি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই সব সংস্থায় নিযুক্ত বহুলোকের কর্মচ্যুতি ঘটে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের প্রকৃত আয় কমে যায়। কারণ শিল্পপণ্যের বাজার দর প্রকৃত আয়ের তুলনায় যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতে ব্যবসারত ব্রিটিশ ব্যাংকগুলি মহাজনের মারফত ভারতীয়ের সঞ্চিত সোনা এবং রূপা কিনতে শুরু করে। বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজারে সোনা ও রূপার যথেষ্ট চাহিদা ও মূল্য থাকায় ব্রিটিশ ব্যাংক-গুলির মারফত ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ভারত থেকে নির্বিচারে অমূল্য ধাতুগুলি

সংগ্রহ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের একমাত্র লক্ষ্য হল বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থা থেকে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে রক্ষা করা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় ভারতের কৃষি অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ছোট কলকারখানার মালিক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে ১৯২৯-এর পর থেকে ভাবতীয় পুঁজিবাদের বনিয়াদ সুদৃঢ় হতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় শিল্প ও পুঁজি বিকাশেব পথ সুগম করেছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থায় ব্রিটিশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসুবিধাগুলির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল ভারতের বড় বড় পুঁজিপতিরা; সেজন্য ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতে আধুনিক বড় বড় শিল্পপতির উদ্ভব দেখা যায়। এই সময়ে বিড়লা, ডালমিয়া, জৈন, সিংহানিয়া, থাপ্পার প্রমুখ শিল্পগোষ্ঠীগুলি ভাবতীয় অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২. সাইমন কমিশন ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্তিমিত অবস্থা বজায় ছিল। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের পর পরিবর্তনবিরোধীরা (no-changers) গান্ধীজীর নির্দেশমত গঠনমূলক কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করেন। গঠনমূলক কর্মসূচীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্য যাই থাকুক না কেন গণ-আন্দোলন বিকাশে এই কর্মসূচী সহায়ক ছিল না; অপরদিকে কংগ্রেসের পরিবর্তনকামীরা (pro-changers) আইনসভার মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির নীতি চালিয়ে যেতে থাকেন। পরিবর্তনকামীদের বা স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক পদ্ধতির কার্যকারিতা ১৯২৫-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর ম্লান হয়ে যায়। ১৯২৬-এ গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে আইন-অমান্য শব্দটিকে প্রস্তাব থেকে বাদ দেওয়া হল। এই সময়কে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণহীনতার সময় বলা যায়, কারণ অসহযোগ আন্দোলন ও স্বরাজ্য দলের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতা একেবারে হ্রাস পেলে ভারতীয় রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের প্রাণচাঞ্চল্য হ্রাস পায়।

ভারতীয় রাজনীতির সাময়িক স্থিতাবস্থায় নতুন গণ-জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। ১৯২৭-এর নভেম্বরে বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতের শাসন-সংস্কার পর্যালোচনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। ১৯১৯-এর ভারত

সরকার আইনে প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯২৯-এ বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের দ্বারা ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল টোরি দলের সরকার দু' বছর আগেই ভারতের জন্য কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। ১৯২৯-এ ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; সেই দিকে দৃষ্টি রেখে রক্ষণশীল সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করল।

উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী স্যার জন সাইমনকে সভাপতি করে সাতজন ব্রিটিশ সদস্য সম্বলিত একটি কমিশন গঠিত হল, কমিশনে উদারনৈতিক সভাপতি ছাড়া দু'জন শ্রমিক দলের এবং বাকি চারজন রক্ষণশীল দলের সদস্য ছিলেন। দেখা যায় যে রক্ষণশীল দল থেকে শ্রমিক দল পর্যন্ত সব দলের সহযোগিতায় জন সাইমনের সভাপতিত্বে কমিশন গঠিত হল। কমিশন ভারতের জন্য আরও কিছু শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করা যায় কিনা বা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রসারের পক্ষে ভারতীয়রা কতটা উপযুক্ত হয়ে উঠেছে তা ক্ষতিয়ে দেখে সুপারিশ করবে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে ভারতের শাসন-সংস্কার ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে সাতজন ব্রিটিশ সদস্য সম্বলিত কমিশন গঠনের ঘোষণায় ভারতে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এক বিবৃতিতে সাইমন কমিশনকে বর্জনের আহ্বান জানান। ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির দাবি উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সদস্য সম্বলিত সাইমন কমিশন গঠন করে ভারতের জনমতকে নিদারুণভাবে অপমান করল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ভারতীয়দের রাজনৈতিক যোগ্যতা বিচারের অধিকার আছে কি না এ সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন; তিনি আত্মমর্যাদাপূর্ণ সকল ভারতবাসীকে সাইমন কমিশনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্রব বা সহযোগিতা বর্জনের আহ্বান জানান।

মহম্মদ আলি জিন্না সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে সাইমন কমিশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি সাইমন কমিশন গঠনকে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির উপর অপমানকর আচরণ বলে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে বলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, লিবারেল ফেডারেশন, ভারতের বণিক ফেডারেশন, ভারতের মিল মালিক সংঘ

এবং হিন্দু মহাসভা সাইমন কমিশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছে। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশ করে সাইমন কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা না করার জন্য ভারতবাসীর দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়। সাইমন কমিশন-বিরোধী ইশতেহারে ভারতের সব কয়টি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছিলেন। ভারতের লিবারেল ফেডারেশন এলাহাবাদে একটি সম্মেলন আহবান করে; সম্মেলনে তেজবাহাদুর সপ্রু সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ ভারতীয়দের বাদ দিয়ে কমিশন গঠনের অর্থ হল 'a deliberate insult to the people of India'.

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে এম. এ. আনসারির সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয় যে: 'সর্বস্তরে এবং সর্ব উপায়ে কমিশনকে বয়কট করাই হ'ল ভারতের সামনে উন্মুক্ত একমাত্র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পথ'; কংগ্রেস সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ আয়োজনের জন্য ভারতবাসীকে আহবান জানায়। সাইমন কমিশনের সদস্যরা ভারতে পদার্পণ করলেই প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়; শুধু তাই নয়, কমিশনের সদস্যরা ভারতের যে শহরে যাবেন সেখানকার মানুষদের কমিশনবিরোধী জমায়েত ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহবান জানানো হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের সাইমন কমিশনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জনের অনুরোধ জানানো হয় এবং আইনসভাগুলির সদস্যদের সাইমন কমিশনের জন্য ব্যয় মঞ্জুরী প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সর্বোপরি ১৯২৭-এ কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে সাইমন কমিশনের সদস্যদের সর্বপ্রকার বয়কট করার জন্য ভারতবাসীকে আহবান জানানো হয়।

সাইমন কমিশন গঠনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে পুনরায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে বয়কট করার আহবান জানালে সারা ভারতে নতুন গণ-উদ্দীপণার সৃষ্টি হয়। ১৯২৮-সালের ফেব্রুয়ারিতে সাইমন কমিশনের সদস্যরা বোম্বাই শহরে পদার্পণ করলে ভারতের জনগণ সারা দেশে অভূতপূর্ব হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে কমিশনের সদস্যদের

সম্বর্ধনা জানায়। কালো পতাকা সমেত 'go back Simon' ধ্বনি দিতে দিতে বহু লক্ষ মানুষ বোম্বাই শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়।

মাদ্রাজে বিক্ষোভ মিছিল বিশাল আকার ধারণ করায় পুলিশ তাদের উপর বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণ করে; গুলি বর্ষণের ফলে তিনজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ আহত হয়। ১৯২৮-এর অক্টোবরে সাইমন কমিশনের সদস্যরা লাহোরে আসেন। সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লাজপত রায় এবং মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কালো পতাকা সমেত একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল লাহোর রেল স্টেশনে পৌঁছায়। আইন অমান্যকারী বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে; লাজপত রায়ের মাথায় প্রচণ্ড-ভাবে লাঠির আঘাত লাগা সত্ত্বেও তিনি মিছিলের উদ্দেশ্যে বলেনঃ 'আজকের অপরাহ্নে আমাদের যেভাবে আঘাত করা হ'ল তার প্রত্যেকটি আঘাত ব্রিটিশ সরকারের শবাধারে পেরেক মারতে সাহায্য করবে।' লাঠির আঘাতে লাজপত রায়ের শরীর ভেঙে যায় এবং ১৯২৮-এ ১৭ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইমন কমিশন বিরোধী গণ-বিক্ষোভ লক্ষ্ণৌ শহরে দেখা দেয়, বিক্ষোভ-কারীদের উপর পুলিশ উৎপীড়ন চালায়। এই সময় জওহরলাল নেহরু পুলিশের দ্বারা নিগৃহিত হন। পুলিশের অত্যাচার থেকে লক্ষ্ণৌ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রেহাই পান নি। কমিশনের সদস্যরা পাটনায় পৌঁছলে পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল কমিশন-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে সারা শহর পরিভ্রমণ করে। কলকাতায় কমিশনের সদস্যরা পৌঁছলে সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় বিক্ষোভ মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করে।

সাইমন কমিশন-বিরোধী গণবিক্ষোভ ভারতের রাজনীতিতে প্রাণসঞ্চার করে। প্রবল উদ্দীপনা এবং গণজাগরণ কংগ্রেসের মধ্যে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তন-বিরোধীদের দলাদলির অবসান ঘটায়। কংগ্রেসের বাইরে অবস্থিত বহু নির্দলীয় মানুষ সাইমন কমিশন-বিরোধী গণবিক্ষোভের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের গণ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে গেলে সাইমন কমিশন-বিরোধী গণবিক্ষোভ ও গণ-সমাবেশ পুনরায় জাতীয় আন্দোলনে রাজনৈতিক জোয়ারের সৃষ্টি করে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, গান্ধীজী এবং তাঁর সহযোগী বড় বড় নেতারা সাইমন কমিশন-বিরোধী গণবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যে বিশাল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচীতে কেন রূপ দিতে পারলেন না? মনে হয় তাঁরা ভারতীয় জনগণের চেয়ে সেই

সময়ে সর্বদলীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের উপর বেশি আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

সাইমন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণার সময় ইংলণ্ডের লর্ড সভায় ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড দম্ভের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতীয় নেতারা সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংবিধান কখনো রচনা করতে পারবেন না। সাইমন কমিশন-বিরোধী রাজনীতি শুধুমাত্র নেতিবাচক বয়কট আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। লর্ড বার্কেনহেডের দম্ভোক্তির উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চে দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হয়। নতুন সংবিধানে আইনসভাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধিত্ব দানের প্রশ্নে কতকগুলি জটিলতা দেখা দেয়। সেজন্য সর্বদলীয় সম্মেলন পুনরায় মে মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়, এখানেও সমস্যার সমাধান হয় নি। ভারতের জন্য নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি ছোট কমিটি গঠন করে দেন। এই কমিটি নেহেরু-কমিটি নামে বিখ্যাত। বহু বৈঠকের পর ১৯২৮-এর আগষ্ট মাসে নেহেরু কমিটি মুখবন্ধ বাদে অন্য সমস্ত বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি রিপোর্ট পেশ করে। নেহেরু কমিটির রিপোর্টে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নেহেরু কমিটির রিপোর্ট ১৯২৮-এর আগষ্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সর্ব-দলীয় সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই রিপোর্ট পুনরায় ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশনে পেশ করা হলে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং শিখ নেতারা আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কয়েকটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করেন। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি প্রকাশ্য মতভেদে পরিণত হলে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা এবং শিখ সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ কলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশন থেকে চলে আসেন।

নেহেরু কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে সদস্যদেব ঐক্যমত প্রতিফলিত হয় নি। কমিটির কয়েকজন সদস্য ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পরিবর্তে ভারতের জন্য পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানালে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাতে একমত হন নি। কারণ নেহেরু কমিটির অধিকাংশ সদস্য ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে নতুন সংবিধানের ভিত্তি বলে স্বীকার করেছিলেন। অবশ্য পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাকে যাঁরা ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে মনে করেন তাঁদের সেই মত প্রচারের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছিল।

মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যে রিপোর্ট পেশ করা হল তাতে দায়িত্বশীল সরকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার চেয়ে ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত আইনসভার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য স্বীকৃত হল। নেহেরু রিপোর্টে বলা হল যে, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টর মতো ভারতে দুই কক্ষযুক্ত পার্লামেন্ট গঠিত হবে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ভারতীয় পার্লামেন্টের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা থাকবে; পার্লামেন্টের রাজ্যসভায় দুশো-জন সদস্য থাকবেন। এই সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের লোকসভার সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচশো; তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত হবেন। বাংলা দেশের মুসলমান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অ-মুসলমান ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায় পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুবিধা পাবে না। অবশ্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। পাঞ্জাব ও বাংলা দেশকে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম বলে ধরা হবে কারণ এই প্রদেশ দুটিতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; প্রদেশ দুটি'র কোনটিতেই সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে না, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে।

লর্ড বার্কেনহেডের দম্ভোক্তির উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল নেহেরু কমিটি রিপোর্ট। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের মত বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের দেশের সবার স্বার্থ বজায় রেখে সংবিধানের মত একটি মৌলিক দলিলের খসড়া রচনার কাজটি সহজসাধ্য নয়। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। এই চ্যালেঞ্জের যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হয়েছিল। সাইমন কমিশন গঠনের ঘোষণার সময় এবং সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনে যে গণ-উদ্দীপণা দেখা দিয়েছিল নেহেরু কমিটি রিপোর্ট সেই রকম উদ্দীপণার সৃষ্টি করতে পারে নি। সুভাষচন্দ্র বসু জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ কয়েকজন চেয়েছিলেন পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। নেহেরু কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জন করাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছিল।

নেহেরু কমিটির রিপোর্টকে কেন্দ্র করে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই কনভেনশনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা উগ্র মূর্তি ধারণ করেছিল। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শিখেরাও দাবি করতে লাগলেন যে ভাষা ও ধর্মের দিক দিয়ে

পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের সুবিধা পাবার অধিকারী। কনভেনশনে মুসলিম লীগের তরফে মহম্মদ আলি জিন্না কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং পাঞ্জাব ও বাংলার প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবী করলেন। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, শিখ সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করল কলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশনে।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য : পূর্ণ স্বাধীনতা

১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামের সুনির্দ্দিস্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষিত হয় নি। আইনসভার সম্প্রসারণ, প্রচলিত আইনের মধ্যে শাসন সংস্কার, সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ইত্যাদি রাজনৈতিক দাবিগুলি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ধ্বনিত হত। প্রথম যুগের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে আমলা-তান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করার দাবি জানান; তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে ঔপনিবেশিক স্বশাসিত সরকারকে (colonial self-government) জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে স্থির করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ঐ সময় থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাবে জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজপুরুষ হেনরি কটন ১৯০৪-এর কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে 'গ্রেট ব্রিটেনের ছত্রছায়ায় দৃঢ়-ভাবে আবদ্ধ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর কথা বলেন। তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন অর্জনের দাবি জানান। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ ১৮৮৫-তে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসন লাভকে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেন। ১৯০৫-এর কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গোপালকৃষ্ণ গোখেল ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বশাসনের আদর্শকে ব্যক্ত করেন।

একথা সর্বজন বিদিত যে, ১৯০৬-এর কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সর্বপ্রথম স্বরাজ শব্দটি ব্যবহার করেন। নৌরজীর সভাপতির ভাষণের মূল কথা ছিল স্বরাজ; তিনি

গ্রেট বৃটেন এবং তার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে ধরণের স্বশাসিত সরকার আছে তাকেই স্বরাজ বলেছিলেন। অর্থাৎ, ভারতের জন্য তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বশাসিত সরকার চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতীয়রা ঔপনিবেশিক স্বশাসিত সরকার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাঁর মতে রাশিয়ার কৃষকেরা স্বৈরাচারী জার সম্রাটের কাছ থেকে পার্লামেন্ট গঠনের অধিকার যখন পেতে পারে তখন ভারতীয়রা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ঔপনিবেশিক স্বশাসিত সরকার পরিচালনার অধিকার পেতে পারে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেস মঞ্চের বাইরে থেকে আরও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের দাবি ধ্বনিত হয়। ১৯০৬-এ বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন: 'Absolute naional aut. nomy is the goal'. ১৯০৬-এ জাতীয় বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' ভারতের জন্য স্বাধীনতার দাবি করে। ১৯০৭-এ 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। ১৯০৬-এ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ 'absolute control over national affairs'-এর লক্ষ্যকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেন।

জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বশাসিত সরকার চেয়েছিলেন। তাদের এই দাবি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও জাতীয় বিপ্লবীরা কংগ্রেস মঞ্চের বাইরে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণবিহীন রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন। অবশ্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের দাবি কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য রূপে তখনও পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নি।

চরমপন্থীদের প্রভাবে ১৯০৬-এর কংগ্রেস অধিবেশনে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার উপর রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হলে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করেন। তাই দেখা যায় ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৭-এর সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থীদের মতাদর্শ ও কর্মসূচী প্রত্যাখ্যানে সক্রিয়ভাবে অগ্রণী হলেন। কংগ্রেস মঞ্চের বাইরে চরমপন্থীদের ধ্বনিত রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গোপালকৃষ্ণ গোখেল বলেছিলেন 'উন্মাদ ব্যক্তিরাই কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে।' কারণ নরমপন্থীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কোন বিকল্প হতে পারে না এবং জাতীয়

আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত হবে।

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রবল মতভেদ ও বাদানুবাদের মধ্যে ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে যায়। অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটলে সুরাট কংগ্রেসের প্রাঙ্গনে নরমপন্থীরা সম্মেলন আহবান করলেন, এখানে ন'শো জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। প্রথম প্রস্তাবে বলা হলঃ 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্ব-শাসিত সদস্যরা যে ধরণের স্ব-শাসন উপভোগ করছে তা অর্জন করাই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য।' নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৮-এর এপ্রিলে এলাহাবাদে সম্মেলন ডাকেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচিত হয়। কংগ্রেস আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হলঃ 'জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হল ভারতের জনগণের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা স্বশাসিত দেশগুলির মত স্বশাসন ব্যবস্থা অর্জন করা।' অর্থাৎ, জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা স্বশাসিত দেশগুলির মতো রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করা। এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলা হলঃ 'নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় ক্রমাগত সংস্কার সাধন ক'রে লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হবে।' ১৯০৮-এর মাদ্রাজের কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বলিত সংবিধানটি অনুমোদিত হয়। হিউম এবং ওয়েডেরবার্ণ এক তারবার্তায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন কংগ্রেস সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে যে লক্ষ্য ঘোষিত হল সেটাই ছিল ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতাদের আসল উদ্দেশ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাত ও প্রভাবে ভারতের দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের প্রভাব এবং জাতীয় ক্ষেত্রে খিলাফৎ আন্দোলন, পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ড ও রাওলাট আইনের প্রতিক্রিয়া অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত করে। ১৯২০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীজী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী অনুমোদন করাতে সমর্থ হন। ঐ বছরের ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী পুনরায় অনুমোদিত হয়। কংগ্রেসে উদ্ভূত নতুন চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে গান্ধীজী নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস সংবিধানে নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্যের সংযোজন করেন। নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস সংবিধানে এক নম্বর অনুচ্ছেদে নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষিত

হল ঃ 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'ল সর্ব প্রকারের আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় জনগণের জন্য স্বরাজ অর্জন করা।'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসন অর্জনের লক্ষ্যকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য বলা যায় না। স্বরাজ অর্জনকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হল, কিন্তু গান্ধীজী কোথাও স্বরাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন নি। অর্থাৎ, কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যাতে স্বরাজকে ব্যাখ্যা করতে পারেন সে পথ খোলা রাখা হল। কংগ্রেস সংবিধানের নতুন লক্ষ্য সম্মলিত প্রস্তাব সমর্থন করে লাজপত রায় বলেছিলেন যে, ইচ্ছাকৃত ভাবেই সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে স্বরাজ শব্দের কোন ব্যাখ্যা করা হয় নি, শব্দটিকে অস্পষ্ট রাখা হয়।

১৯২৭-এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী ভাবাপন্ন নেতাদের প্রভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে 'hastily conceived and thoughtlessly passed' বলে অভিহিত করেন। ১৯২৮-এর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস অর্জনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপ ঘোষিত হয়। গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুসারে ব্রিটিশ সরকারকে এক বছর সময় দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না দিলে জাতীয় কংগ্রেস এক বছর পরে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করবে। বলা বাহুল্য ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হয়।

১৯২৯-এব ডিসেম্বর মাসে লাহোবে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি আরো জোরালো হয়ে ওঠে। কারণ এক বছরের মধ্যে ভারত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভ করে নি। লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু সভাপতিত্ব করেন। প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ঃ 'গত বছরে কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহিত প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, কংগ্রেস সংবিধানের ১ নম্বর অনুচ্ছেদের স্বরাজ শব্দটির অর্থ হবে পূর্ণ স্বাধীনতা।'

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত লবণ সত্যাগ্রহ

ও আইন অমান্য আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯২৯-এ লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজ শব্দটিকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে ব্যাখ্যা করে কংগ্রেস সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লাহোর কংগ্রেসে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হয়। পূর্ণ স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস অর্জনের লক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। সেজন্য লর্ড বার্কেনহেডের দম্ভোক্তির জবাবে রচিত হওয়া মতিলাল নেহরু কমিটির মুখবন্ধকে বাতিল করতে হয়। কারণ মতিলাল নেহেরু রিপোর্টের মুখবন্ধে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জনকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী তারিখটিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করার আহবান জানানো হয়। এই দিবসে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথবাণী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ১৯০৮-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসিত সরকার অর্জনের লক্ষ্যকে রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করা হয়েছিল; কুড়ি বছর পরে ১৯২৯-এ পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্জনের লক্ষ্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করা হল।

৪. লবণ-সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব সূচিত হয়েছিল। চৌরিচৌরার ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়, এবং সেই সঙ্গে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে গণ-আন্দোলণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যায়। সেজন্য তিরিশের দশক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

১৯২৯-এ লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল; লাহোর কংগ্রেস শুধু যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে তাই নয়, এই কংগ্রেস খাজনা বন্ধ করা সমেত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রস্তাব গ্রহণ করে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিখিল ভারত

কংগ্রেস কমিটিকে প্রয়োজনবোধে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ অভিযানের কর্মসূচী গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সম্ভবত সারা ভারতে জাতীয়-বিপ্লবীদের সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে গান্ধীজী ভারতবাসীর সামনে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব রেখে সন্ত্রাসমূলক ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ থেকে দেশ-বাসীর মনোযোগ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করাতে চেয়ে-ছিলেন।

লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রস্তাবে 'দেশে পাল্টা বিকল্প সরকার গঠন করা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সেই লক্ষ্যকে স্থির রেখে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রসমাজকে সংঘবদ্ধ করাই কংগ্রেসের কর্তব্য' এ কথা বলা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সে সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি লিখেছেন: 'সেই প্রস্তাব পরাজিত হ'ল। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপযোগী কোন পরিকল্পনা রচিত হ'ল না, পরের বছরের জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'ল না।'

প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারি দিবসটি স্বাধীনতা দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; এই দিনে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার শপথ বাক্য পাঠ করার অনুরোধ জানান হয়। এই শপথ বাক্যে 'ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মনোবলকে খর্ব করে' ইংরেজ শাসন ভারতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে একথা বলা হল। সেজন্য 'ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্নশীল হওয়ার' কথা ঘোষিত হল। এই শপথবাক্যে বলা হয়েছে: 'ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সাধ্যমত সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন করে, কর না দিয়ে এবং আইন অমান্য করায় জন্য নিজেদের সব রকম উপায়ে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।' অতএব ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা দিবসের শপথ বাক্যে আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

২৬শে জানুয়ারি দিনটি প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পূর্বে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রেখে ১৯৩০-এর জানুয়ারি মাসে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১১-দফা প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবে টাকার বিনিময় হার এক শিলিং চার পেনি ধার্য করা,

সম্পূর্ণভাবে মাদকদ্রব্য বর্জন, ভূমিরাজস্ব ও সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস, বিদেশী বস্ত্রের উপর সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্তন, সুনির্দিষ্ট অপরাধমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দান ইত্যাদি দাবি জানান হয়েছিল। ১১-দফা প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করা হলেও গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সেজন্য গান্ধীজী তাঁর ১১-দফা প্রস্তাবে 'Independence' শব্দের পরিবর্তে 'substance of Independence' শব্দ দুটি ব্যবহার করেন।

১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য গান্ধীজীকে সর্বময় কর্তৃত্ব দান করে। লাহোর কংগ্রেসের আবেদন অনুযায়ী কংগ্রেসে আইনসভার সদস্যগণ একযোগে সদস্যপদে ইস্তফা দেন। মুসলিম লীগের সমর্থক মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া না দিলেও ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান জনগণ প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়।

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। এই সময় ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। ১৯২২-এ চৌরিচৌরার ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য গান্ধীজী সেই সব মানুষকে আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হবার আহবান জানালেন 'যাঁরা অহিংসাকে ধর্ম বিশ্বাসের মতো অটুট ও পবিত্র' বলে মনে করেন। তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'এ-বারে আইন অমান্য শুরু হ'য়ে গেলে তা কখনোই বন্ধ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারী জেলের বাইরে থাকেন অথবা জীবিত থাকেন।'

গান্ধীজী গুজরাতের সমুদ্রোপকূলে লবণ আইন ভঙ্গ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন; আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি নিজে সমুদ্র তীরে লবণ আইন ভঙ্গ করার পর ভারতের জনগণকে দেশের সর্বত্র আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা

করার জন্য আহবান জানালেন। আইনভঙ্গের জন্য লবণকে বেছে নেওয়ার পেছনে তাঁর অনেক ভাবনা চিন্তা ছিল; ভারতের আপামর জনসাধারণ লবণ ব্যবহার করে থাকে। স্মরণাতীত কাল থেকে জনগণের লবণ তৈরী করার অধিকার ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার পর ব্রিটিশ সরকার নিজেই ভারতে একচেটিয়া লবণ তৈরী করার অধিকার নিয়ে ভারতের দরিদ্র মানুষকে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করার অধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করে, লবণের দাম বাড়িয়ে, দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রায় আঘাত দেওয়া হয়েছিল।

লবণ আইন ভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে গান্ধীজী বড়লাটকে পত্র লিখে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। তিনি লিখলেন: 'আমি মনে করি গরীব মানুষের দিক থেকে (লবণ) কর অত্যন্ত অন্যায়। স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম, সেজন্য তাদের দিক থেকে লবণ করকে আমি অত্যন্ত অন্যায় ব'লে মনে করি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হবে।' গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে বড়লাট জানালেন আইনভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর কিছুই করার নেই; কারণ আইন ভঙ্গের অর্থ হল দেশের শান্তি ও শৃংখলাকে ভঙ্গ করা।

সবরমতী আশ্রমের ৭৮ জন অনুগামীকে নিয়ে গান্ধীজী ১৯৩০-এর মার্চ মাসে গুজরাতের দণ্ডী গ্রামের সমুদ্রপোকুলে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যাত্রা সুরু করলেন। সারা ভারতের এবং বিদেশের সংবাদপত্রগুলি গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গ অভিযানের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতিদিন প্রকাশ করে অভূতপূর্ব গণজাগরণে সহায়তা করেছিল। গ্রামের পর গ্রাম তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন; সর্বত্র তিনি জনগণকে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিতে এবং খাজনা বন্ধ অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহবান জানালেন। সবরমতী আশ্রম থেকে দণ্ডী পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে তিনি সাধারণ মানুষের দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্ধিত ও অভিনন্দিত হলেন। ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে গান্ধীজী দণ্ডীর সমুদ্রতীর থেকে লবণ তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লবণ আইন ভঙ্গ শুরু করলেন; সেই সঙ্গে সারা ভারতে লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল। যেখানে সমুদ্র নেই সে-সব জায়গায় ব্রিটিশের অন্য আইন ভঙ্গ করা শুরু হল। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পাঠ করে 'সিডিশন আইন' ভঙ্গ করলেন।

লবণ আইন ও অন্যান্য আইন ভঙ্গ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী

বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বয়কট অভিযান শুরু হয়ে গেল; এই সঙ্গে ব্যাপক হারে মাদক দ্রব্য এবং উত্তেজক ওষুধ বর্জনের আন্দোলন শুরু হল। ভারতে সর্বত্র বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচানার জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হল। গান্ধীজী ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ভারতীয় মহিলাদের কাছে আবেদন জানান, গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতের মহিলারা বিদেশী পণ্যের দোকানে ও সরকারী সংস্থায় ধরণা দেওয়া শুরু করেন; ক্রমে ক্রমে অধিক সংখ্যায় মহিলারা এ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন। শুধুমাত্র দিল্লী শহরেই ষোলশো মহিলা কারাবরণ করেছিলেন। কলকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য শহরের মহিলারা গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দেন। ভারতীয় মহিলারা রক্ষণশীল ও সংস্কারাচ্ছন্ন এমন অপবাদ দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের দেওয়া হয়। তিরিশের দশকের আইন অমান্য আন্দোলনে দেখা গেল ভারতীয় মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন।

এপ্রিলের শেষের দিকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের চণ্ডমূর্তি দেখা গেল; প্রথমেই প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতের সংবাদপত্রগুলির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হল। প্রতিবাদস্বরূপ অনেকগুলি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এরপর আরও কয়েকটি অর্ডিন্যান্স জারি করে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপকে প্রবলভাবে সংকুচিত করা হল। সারা ভারতে কংগ্রেস সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা হল, কংগ্রেসের সম্পত্তি এবং তহবিল বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হল, ফলে কংগ্রেসের পক্ষে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল। সরকারী নিপীড়ন ও দমনমূলক আইন জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোবলকে আরো বাড়িয়ে দিল; সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল এবং কংগ্রেসের প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল।

এপ্রিল ও মে মাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকরা সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে লবণ আইন অমান্য করলেন। ১৯৩০-এর মে মাসে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল। তিনি গ্রেপ্তার হলে প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা আব্বাস তায়েবজী সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দিলেন; তিনি গ্রেপ্তার হবার পর সরোজিনী

নাইডুর নেতৃত্বে ধরসনায় সরকারী লবণ গুদামে সত্যাগ্রহ ও লবণ আইন অমান্য শুরু হয়। ধরসনায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনশো কুড়ি জন সত্যাগ্রহী গুরুতরভাবে আহত হলেন; তার ফলে দুজনের মৃত্যু হয়।

গান্ধীজীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলে সারা ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বোম্বাইয়ের ভেন্দি বাজার ও ওয়াডালা অঞ্চলে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। মাদ্রাজে পুলিশ নির্মমভাবে প্রতিবাদকারী স্বেচ্ছাসেবকদের উপর লাঠি চালায়। সারা ভারতকে একটি জেলখানায় পরিণত করা হল। সরকারী হিসাব মতে ষাট হাজার সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেন; কিন্তু বেসরকারী হিসাবে দেখা যায় সারা দেশে নব্বুই হাজার সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনের আবেদনে সাড়া দিয়ে মধ্যপ্রদেশের মানুষেরা সংরক্ষিত জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে ব্রিটিশের আইন ভঙ্গ করে। মেদিনীপুর জেলায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা ভারতে হরতাল ও ধর্মঘটের হিড়িক পড়ে যায়। বোম্বাইয়ের শোলাপুর শহরের পঞ্চাশ হাজার বস্ত্রশিল্প শ্রমিক কয়েকদিন ধরে শহরটিকে দখল করে রইল; শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করে শোলাপুরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হল।

সব জেলগুলি ভরে গেলে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারল যে, এভাবে পাইকারি গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের গতিরোধ করা যাবে না; সুতরাং মনোবল ভাঙ্গার জন্য শারীরিক নির্যাতন শুরু হল। এই সঙ্গে শুরু হল নির্বিচারে লাঠিচালনা, প্রহার, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও পুলিশের অত্যাচার। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গুলি বর্ষণের চব্বিশটি ঘটনায় একশো তিনজন নিহত ও চারশো কুড়িজন আহত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের সংবাদ যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে সেজন্য কড়া সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কয়েক মাসের জন্য মেদিনীপুর জেলায় কোন সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারণ এখানে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। উত্তর প্রদেশের কৃষকেরা খাজনা বন্ধ অভিযান শুরু করে দিলে তাদের উপর ব্রিটিশের নিপীড়ণ তীব্রতর হয়ে উঠল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান প্রধান পার্বত্য অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলনের আবেদন অভূতপূর্ব উৎসাহের সৃষ্টি করে। পেশোয়ারের নেতা খান আবদুল গফর খান খোদা-ই-খিদমতগার বা ভগবানের সেবক নামে

একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের সদস্যদের পোশাকের জন্য তাঁরা 'রেডশার্ট' বা লালকুর্তা আখ্যা পান। ১৯৩০-এ খোদা-ই-খিদমতগারের সদস্য ছিল আশি হাজার। এই সংগঠন গরীব কৃষক এবং শিল্পশ্রমিকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

পেশোয়ারের আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু করার নির্দিষ্ট দিনের আগেই স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। জনতা পুলিশের হাত থেকে তাঁদের মুক্ত করার চেষ্টা করলে সীমান্তের উপজাতিরা এঁদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। পুলিশের সঙ্গে সীমান্ত উপজাতির গুলিবিনিময় হয়। এই সংঘর্ষ ক্রমশ গণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করল। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার পেশোয়ারের বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সেনাবাহিনী পাঠালে তাদের পথরোধ করে সীমান্ত উপজাতির মানুষেরা ব্যারিকেড গড়ে তুলল। এই রকম উত্তেজনাময় অবস্থায় ইংরেজ সেনানায়কেরা রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেল পদাতিক বাহিনীকে গুলি চালনার হুকুম দেয়; গাড়োয়ালের রাইফেল বাহিনী এই হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে। গুলিবর্ষণে অস্বীকৃত পদাতিক বাহিনীকে ইংরেজ সৈন্যরা ঘিরে ফেলে। পরে গাড়োয়াল পদাতিক সৈন্যদের সামরিক বিচার হয় এবং সামরিক আদালতের বিচারে গাড়োয়াল পদাতিক রাইফেল বাহিনীর সতেরজন সিপাহীর কঠোর সাজা হয়, একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আরেক-জনের পনের বছরের সশ্রম কারাবাস এবং বাকি পনের জনের তিন বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়।

গাড়োয়াল পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা তাঁদের স্বদেশবাসীদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। গান্ধীজী গাড়োয়ালী সিপাহীদের প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী সাংবাদিককে বলেন: 'কোন সৈন্য যদি গুলি করার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে তাহলে সে তার শপথই ভঙ্গ করবে এবং ফৌজদারী অবাধ্যতার অপরাধে অপরাধী হবে। আমি সৈন্য ও অফিসারদের অবাধ্য হতে বলতে পারিনা।'

১৯২৯-৩৪-এ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে তীব্র সংকট সৃষ্টি করে, কৃষিপণ্যের দ্রব্যমূল্য হ্রাস করে, কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের আবেদন কৃষকদের কাছে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। জমিদার ও সরকারকে খাজনা ও কর বন্ধের আন্দোলনে কৃষকেরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে

যোগ দিয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় উত্তর প্রদেশ, মেদিনীপুর, এলাহবাদ, পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জ, বিহার ও ভারতের অন্যান্য স্থানে খাজনা ও কর বন্ধ আন্দোলনে কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হল শোষিত ও নিপীড়িত ভারতের কৃষকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ভূস্বামী-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করা। সেজন্য সারা ভারতের আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলন তিরিশের দশকে সারা ভারতে কিষাণ সভাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কৃষক আন্দোলন যুক্ত হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন যখন মাঝপথে পৌঁছেচে সেই সময় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। আইন অমান্য আন্দোলন যে একটা ব্যাপক আকার ধারণ করে সারা ভারতে গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে ব্রিটিশ সরকার প্রথমদিকে তা বুঝতে পারে নি; সেজন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনকে স্তিমিত করায় প্রয়াসী হল। লণ্ডনে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে উপস্থিত করানোর চেণ্টা চলল। ১৯৩০-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩১-এর জানুয়ারী পর্যন্ত লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেয় নি। দেশীয় রাজ্য, মুসলিম লীগ, অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারতীয় জনগণের উদ্দেশে একটি আবেদন জানিয়ে তাঁদের আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য অনুরোধ করলেন; কারণ এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটলেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের সংবিধান রচনার প্রশ্নটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। অতঃপর কংগ্রেসকে যোগদানের সুযোগ দেবার জন্য গোল টেবিল বৈঠক মুলতুবী রাখা হয়।

১৯৩১-এর জানুয়ারিতে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কারামুক্ত হয়ে বৈঠকে মিলিত হলেন। গান্ধীজী জানালেন, তিনি 'সম্পূর্ণ খোলা মন' নিয়ে কারাকক্ষ ত্যাগ করেছেন। এরপর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার পরবর্তী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যাতে কংগ্রেস যোগ দেয় সে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা শুরু করল। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দীপনায় ভাটা পড়তে

দেখা গেল। জাতীয় কংগ্রেস বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য গান্ধীজীকে দায়িত্বভার দিলে ১৯৩১-এর মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রেখে জাতীয় কংগ্রেসকে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে কংগ্রেস আন্দোলনের একটি দাবিও স্বীকৃত হয় নি; এমন কি লবণ কর পর্যন্ত তুলে নেওয়া হল না, অথচ আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হল। যে গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করার শপথ কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল এবার সেই বৈঠকেই যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। গোলটেবিলের আলোচনার ভিত্তি হবে 'ভারতীয় দায়িত্বে' এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গঠন এবং এই শাসনতন্ত্রে 'ভারতবর্ষের স্বার্থে' বিবিধ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা' প্রবর্তন, আইন অমান্য আন্দোলোনের সময় ঘোষিত অর্ডিন্যান্সগুলির প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান। কিন্তু হিংসা বা হিংসায় প্ররোচনা দানের অভিযোগে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের এবং আদেশ অমান্যকারী গাড়োয়াল সৈন্যদের মুক্তি দেওয়া হবে না। বিদেশী পণ্য বর্জনের স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু ঐ বর্জন শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে না। গান্ধী-আরউইন চুক্তি আরও বড় আকারে বারদৌলি অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটাল। গণ-আন্দোলনের গতিবেগ যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেচে সেই সময় অকস্মাৎ চুক্তি করে সেই আন্দোলনকে বন্ধ করে দেওয়া হল। গান্ধীজীর রাজনৈতিক পদ্ধতি অনুসারেই তাঁর সঙ্গে বড়লাট আরউইনের চুক্তি হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা, অসহযোগ আন্দোলন এবং লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন; সেই পদ্ধতি হল যুগপৎ গণ-আন্দোলন এবং আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া।

১৯৩১-এর মার্চে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করাচী শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হল এবং এই অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। জহরলাল নেহরু কংগ্রেস অধিবেশনে চুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেশ করেন। অবশ্য তিনি লিখেছেন এই চুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেশ করা তাঁর পক্ষে 'যথেষ্ট মানসিক দ্বন্দ্ব ও শারীরিক বেদনার ব্যাপার ছিল'। তাঁর মতে 'একবছর ধরে আমাদের দেশবাসীরা এমন বীরের মত লড়াই চালাল কি শুধু এর জন্য? আমাদের সমস্ত নির্ভীক উক্তি আর কার্যকলাপ কি এখানেই উপনীত হবে'? এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমালোচক ছিলেন।

কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে চুক্তির সমালোচকেরা গান্ধীজীর বিরোধিতা করেন নি। কংগ্রেসের বাইরে ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন ঐ চুক্তির তীব্র সমালোচনা করল; যুব সংগঠন ও সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হল।

১৯৩০-৩২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে দ্বৈতনীতি অনুসরণ করেছিল। একই সময়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং জনগণের বিরুদ্ধে অত্যাচার, উৎপীড়ন চালানোর নীতিকে সাম্রাজ্যবাদের দ্বৈতনীতি বলা হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের দ্বৈতনীতি সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হল। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হল এবং আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য গান্ধীজীকে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিলের বৈঠকে পাঠানো হল। গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন; মদনমোহন মালব্য এবং সরোজিনী নাইডু ব্যক্তিগতভাবে এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়; বৈঠকে গান্ধীজী সংবিধান রচনার খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে ভারতের জন্য ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভের লক্ষ্যের উপর সবিশেষ জোর দেন। গান্ধীজী ছাড়া ভারত থেকে আগত অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাঁদের সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলির সপক্ষে ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকষি শুরু করেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটির উপর অত্যন্ত জোর দেন; অর্থাৎ, ভারতীয় সংবিধানে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ দাবি করায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বভারতীয় অবস্থান আছে, অন্যান্য দলগুলি একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করেছে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়।

আলাপ-আলোচনার সঙ্গে উৎপীড়ন চালানোর দ্বৈত নীতি পুনরায় প্রয়োগ করা হল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে ভারতে ফিরে আসার আট দিনের মধ্যেই গান্ধীজী কারারুদ্ধ হলেন, একই সঙ্গে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেসের নেতারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, গোলটেবিল বৈঠকের আবহাওয়ার পর এরকম আকস্মিক পরিবর্তন সত্যই কল্পনাতীত। ১৯৩২-৩৩ সালের উৎপীড়ন ও নির্যাতন

১৯৩০-৩১ সালের তুলনায় অনেক নির্মম হয়েছিল। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের অন্যান্য গণ সংগঠনগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল, কংগ্রেসের অফিস, বাড়ি, সম্পত্তি এবং তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হল, এই সঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল। ১৯৩৩-এর মার্চের শেষভাগ পর্যন্ত পনেরো মাসে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাড়িয়েছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার। মদনমোহন মালব্যের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পাইকারি নিপীড়ন, প্রহার, গুলিবর্ষণ, পিটুনি, পুলিশের নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে পাইকারি জরিমানা ও গ্রামবাসীদের জমিজায়গা বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার উৎপীড়নের রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল।

১৯৩২-এর আগস্টে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) ঘোষণা করলেন। মুসলমান, শিখ এবং ইউরোপীয় ভোটারদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথা ঘোষিত হল। এই সঙ্গে নিপীড়িত মানুষ বা তপশিলীভুক্ত জাতপাতকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকার করে তাঁদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হল। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হিন্দু ও হরিজনদের আলাদা করার এই চেষ্টাকে গান্ধীজী চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং পুণার কাছে যারবেদা জেলে সেপ্টেম্বর মাসে আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন। অনশন আন্দোলনের পাঁচদিন পরে পুণা শহরে একটি সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। পুণা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পুণার চুক্তি নামে বিখ্যাত। পুণা চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বেশ কিছু অংশ সংশোধনে স্বীকৃত হয়।

পুণা চুক্তির পর গান্ধীজী আইন অমান্য গণ-আন্দোলন থেকে হরিজন আন্দোলনে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ১৯৩৩-এর মে মাসে তিনি পুনরায় অনশন করলেন, এবারের অনশন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ভারতবাসীর মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য তিনি অনশন শুরু করলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হরিজনদের উন্নতির জন্য অধিকতর সতর্কতা ও চেতনালাভের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন।' ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিল। তাঁর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ছ'সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন।

১৯৩৩-এর জুলাই মাসে কংগ্রেস নেতৃত্ব আইন অমান্য-এর গণ-আন্দোলন সম্পূর্ণ স্থগিত করে তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন। এই সঙ্গে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি দলীয় সংগঠনগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ জারি করেন। ব্যক্তিগত আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সরকারী নিপীড়ন আরো বৃদ্ধি পেল। আগস্ট মাসে গান্ধীজী পুনরায় গ্রেপ্তার হন। নৈতিক কারণে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হরিজন উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন।

১৯৩৩-এর মার্চে কংগ্রেস অধিবেশন কলকাতায় হওয়ার কথা, মদনমোহন মালব্য অধিবেশনের সভাপতি। কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগেই এক হাজার কংগ্রেস প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ সভা ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করল, প্রবল উত্তেজনা এবং পুলিশী নির্যাতন সত্ত্বেও জনতা বেষ্টিত হয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি সভার মঞ্চে উপস্থিত হলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। এই সভা পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য এবং আইন অমান্য ও বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে।

১৯৩৪-এর শুরু থেকে আইন অমান্য আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে যায়। ঐ বছরে মে মাসে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি বিনাসর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করল। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে ক্যেন শর্ত, কোন সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। গান্ধীজী নিজেই কংগ্রেস কর্মীদের আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। এই সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। অবশ্য প্রয়োজনবোধে আন্দোলনের উদ্যোগ নেবার জন্য গান্ধীজীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৫ আইন অমান্য আন্দোলনের মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন দ্বিতীয় পর্বের গণ-আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ। এই আন্দোলন ১৯৩৪-এ শেষ হয়ে যায়। ১৯২০-২১-এ অসহযোগ আন্দোলন বা প্রথম পর্বের গণ-আন্দোলনের তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনের গণভিত্তি আরও ব্যাপক ছিল। ১৯৩০-৩৪-সালের বছরগুলিতে ভারতীয় জনগনের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বছরগুলিতে কৃষকশ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে ভারতীয় কৃষকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯৩০-এর দশকের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কৃষকেরা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটার পর ১৯৩৬-এ সারা ভারত কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি। দেখা যায় যে আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ব্যাপকভাবে কৃষকদের খাজনা বন্ধের অভিযান এবং শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট করায় কোন উৎসাহ দেওয়া হয় নি। অবশ্য উত্তরপ্রদেশ, মেদিনীপুর এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে কৃষককে খাজনা বন্ধের আন্দোলন করার জন্য আহবান জানানো হয়েছিল। আইন অমান্যর কর্মসূচীতে লবণ আইন ভঙ্গ, বিদেশী পণ্য বর্জন, মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে যেমন সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনি খাজনা বন্ধের আন্দোলনকে অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

গান্ধীজীর পরামর্শে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হলে সারা ভারতে বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিঠলভাই প্যাটেল ভিয়েনা থেকে আন্দোলন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। বসু-প্যাটেল ইশতেহারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে তেরো বছরের গণ-সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের ওপর চরম অবিচার করা হয়েছে এ কথা বলা হয়। বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের পরিবর্তে 'a more radical policy and leadership' দাবি করা হয়।

গান্ধীজীর নির্দেশে এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হলে সারা ভারতে গান্ধীজীর অনুগামীরা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছিলেন। যেখানে গণ-আন্দোলন এবং গণ-আইন অমান্য কার্যকর হল না সেখানে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের রাজনৈতিক সার্থকতা কতটা থাকতে পারে সে সম্পর্কে বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের মনে সংশয় জেগেছিল। ১৯৩২-এ কারারুদ্ধ হয়ে গান্ধীজী দেখলেন যে প্রথম বারে জেলের মধ্যে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবারে সেগুলিকে প্রত্যাহার করা হল। জেলের মধ্য থেকে অস্পৃশ্যতাবিরোধী অভিযান চালানোর কোন সুযোগ গান্ধীজীকে দেওয়া হল না। তার প্রতিবাদে গান্ধীজী

অনশন শুরু করলেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: 'মহাত্মার এই মনোভঙ্গীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের পক্ষে সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টকর হ'য়ে পড়বে কারণ তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে যে নীতি তুলে ধরেছেন তা হ'ল সত্যাগ্রহী রাজবন্দীকে স্বেচ্ছায় কারাগারের শৃংখলা মেনে চলতে হবে।' সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহারের দাবিতে গান্ধীজীর অনশনকে সমালোচনা করেন। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজবন্দীরা সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদার দাবিতে জেলের মধ্যে অনশন এবং অন্যান্য আন্দোলন চালিয়ে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা যায় গান্ধীজী সেই আন্দোলনের পথিকৃৎ।

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীজী বিবৃতির মারফত বললেন, কংগ্রেস সংগঠন গণ-আন্দোলন পরিচালনায় অত্যধিক গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে। তাঁর নির্দেশে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি এম. এস অ্যানে সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনের শাখাগুলিকে ভেঙে দিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সংকটজনক সময়ে রাজনৈতিক সংগঠনকে ভেঙে দিয়ে গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছা-সেবকদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়া হল, তার ফলে সারা দেশে সংশয় ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেল। বোম্বাই-এর কংগ্রেস নেতা কে এফ নরিম্যান গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে বললেন: 'জনপ্রিয় ভোটের ভিত্তিতে যে জাতীয় সভাগুলি গঠিত হয়েছে সেগুলি কেউ ভাঙতে পারেন না।' কংগ্রেস সংগঠনগুলি জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল; সেগুলিকে সারা ভারতের কংগ্রেস প্রতিনিধিরাই বিশেষভাবে আহূত সভায় ভাঙতে পারেন। গান্ধীজীর নির্দেশে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি কর্তৃক রাজনৈতিক সংগঠনকে ভেঙে দেওয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি'।

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীজী কেন অস্পৃশ্যতাবিরোধী অভিযানের মত সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়টিকে বেছে নিলেন সেটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ১৯২২-এ চৌরিচৌরা ঘটনার পর দেশে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে এই আশংকায় বারদৌলিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। ১৯৩২-এ আইন অমান্যের সময় ভারতের কোন জায়গায় সত্যাগ্রহীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন নি, বরং ব্রিটিশ পুলিশের চরম উৎপীড়ন ও প্ররোচনা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহীরা অহিংসভাবে সর্বত্র আইন অমান্য করেছিলেন। বলা যায় স্ত্রী, পুরুষ, যুবক ও ছাত্র নির্বিশেষে সকল স্তরের সত্যাগ্রহীরা

গান্ধীজীর নির্দেশ মেনেছিলেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে ঘোষিত হরিজনদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবে তীব্র গণ-আন্দোলন করার পরিবর্তে গান্ধীজী যখন অনশন শুরু করলেন তখন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পরিবর্তে হরিজন কল্যাণ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প যখন গান্ধীজী ঘোষণা করলেন সেই সময় সত্যাগ্রহীদের মনে প্রবল সংশয় জেগেছিল।

কেন গান্ধীজী আইন অমান্য গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে তাঁর রণকৌশল পরিবর্তন করলেন? ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাসে অনশন এবং হরিজন কল্যাণে তাঁর আত্মনিয়োগের ঘোষণা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত-ভাবেই সেই সময়ে উদ্ভূত রাজনৈতিক প্রশ্নের মোকাবিলা করেছিল। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজী যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় এই বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কংগ্রেসের মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় সংগঠনের পক্ষে এই সময়ে পুনরায় আন্দোলন করা ছাড়া আব কোন গত্যন্তর ছিল না। ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ভেঙে যাবার পরই ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়ন-মূলক চণ্ডনীতি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। গান্ধীজী সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখতে চেয়েছিলেন।

হরিজনদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজী হরিজন কল্যাণ ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনি ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। এই সঙ্গে তিনি ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রেখেছিলেন।

পরবর্তী ঘটনাগুলিতে দেখা যায় যে হরিজন কল্যাণ সম্পর্কে গান্ধীজীর আগ্রহ শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারমূলক ছিল না। ১৯৩৩-এর মে মাসে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি কংগ্রেস সভাপতি মারফত গণ-আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রাখার শর্ত হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলনের

প্রত্যাহারের জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করল। এই সময়ে গান্ধীজী গণ-আইন অমান্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি একবছর রাজনৈতিক প্রশ্নে নীরবতা পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে হরিজন কল্যাণ আন্দোলনের রণকৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন থেকে ব্রিটিশের সঙ্গে শাসন-সংস্কার বিষয়ে আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখলেন। সেজন্য দেখা যায় ১৯৩০-৩৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো হয়েছিল।

১৯২২-এ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা হলে মতিলাল নেহরুর মত নরমপন্থী নেতা গান্ধীজীকে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৪-এ গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রক্ষণশীল নেতারা স্বাগত জানান। ১৯২২-এর পর কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাজ্যবাদী বা পরিবর্তন-কামী এবং পরিবর্তনবিরোধীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৩৪-এ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কংগ্রেসের সমগ্র রক্ষনশীল নেতৃবৃন্দ আইন সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। সেই অনুযায়ী বল্লভ-ভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়। অর্থাৎ ১৯২২-এ কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্বের একাংশ আইন সভায় যোগদানেরবিরোধী ছিলেন। ১৯৩৪-এ রক্ষণশীল নেতৃত্বের সবাই আইনসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেনঃ 'যে কোন জাতি গর্ব অনুভব করতে পারে এমন প্রভূত সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সত্ত্বেও মহান আইন অমান্যের অভিযান অসম্মানজনকভাবে (ignoble) শেষ হ'ল।' লবন সত্যাগ্রহ অভিযানের প্রাক্কালে গান্ধীজী বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও সত্যাগ্রহী জীবিত থাকবেন ততক্ষণ আইন অমান্য চলবে। কিন্তু দেখা গেল সত্যাগ্রহী সৈনিকেরা আন্দোলন চালাতে প্রস্তুত, কিন্তু সেনানায়ক যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন মাঝপথে প্রত্যাহৃত হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই আন্দোলনের অপরিসীম অবাদানের কথা উল্লেখ করতে হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের গৌরবোজ্জল অবদান সম্পর্কে রজনীপাম দত্ত লিখেছেনঃ

'১৯৩০-৩৪-এর বিরাট আন্দোলনের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটায় আমরা

যেন এক মুহূর্তের জন্য এর ঐতিহাসিক কীর্তি, গভীর শিক্ষা ও অপরিসীম স্থায়ী ফললাভের কথা বিস্মৃত না হই। যে আন্দোলনের পেছনে ছিল জনগণের অপরিসীম সমর্থন, উদ্দীপণা ও দুঃখবরণ, যে আন্দোলন সাফল্যের কাছাকাছি পেঁছেছিল তার এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার কারণগুলি ভাববার, বোঝবার বিষয়, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বারবার পর্যালোচনা করার বিষয়।...যা হোক জাতীয় আন্দোলনের ঐ ক'বছরের ইতিহাস গর্বের বস্তু। ঐ ক'বছর নির্যাতনের সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জনগণকে বশ্যতা মানাবার ও তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন চূর্ণ করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছিল। এত আঘাত সত্ত্বেও দু'বছরের মধ্যই জাতীয় আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে আবার এগুতে থাকে। সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। ঐ ক'বছরের অগ্নিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এক নতুন ও বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য, আত্মবিশ্বাস, গর্ব ও দৃঢ় সংকল্প....'।

নবম অধ্যায়

জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস

১ সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমি

স্বাধীনতা আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস সংগ্রামের পাশাপাশি জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল। [জাতীয় বিপ্লবীরা আবেদন নিবেদনের রাজনীতি অথবা গণ-সমাবেশ ও গণ-আন্দোলনের রাজনীতি অথবা শান্তিপূর্ণ অহিংস গণ-আন্দোলনের রাজনীতিতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় বিপ্লবীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রক্তাক্ষরে লেখা আছে।] জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা আলোচনা না করলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

[জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাংলাদেশে ১৯০৪ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে তিরিশ বছরে সীমাবদ্ধ ছিল।] বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ কোন সহজ ও সরলরেখায় ঘটে নি। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। [ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত পাঞ্জাব, উত্তর ভারত ও মহারাষ্ট্রে অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। জাতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেনঃ 'The independence of India has been achieved as much by constitutional agitation and non-violent non-cooperation as by militant nationalism'। সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াসকে তিনি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।]

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিতান্ত বিপদসংকুল পথে যে অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছিল তাকে অসার ও অন্ধ ঘৃণার প্রয়াস অথবা আকস্মিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী তরুণ ও

যুবকেরা দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের গোপন প্রতিবেদনে জাতীয় বিপ্লবীদের হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদেশী গবেষকরা সশস্ত্র সংগ্রামকে তরুণদের মানসিক ভারসাম্যের অভাব বলে চিত্রিত করেছেন। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে এই ধরণের মূল্যায়ন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

বলা হয় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন আন্দোলনটি সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল? ১৯০৫-এর স্বদেশী বয়কট আন্দোলন, ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩৩-এর আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কোনটাই সম্পূর্ণ সফলতার সঙ্গে শেষ হয় নি। তিরিশ বছর ধরে পরিচালিত বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অজস্র বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এ আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ হয় নি। নির্মম উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রাণশক্তি অর্জন করেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে জাতীয় বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতাকে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে মেনে নেয়। ১৯১৪ সালে রাসবিহারী বসু ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বৃটিশ বিরোধী অসন্তোষ জাগিয়ে সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানোয় প্রয়াসী হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হলেও ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবীদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে।

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। ভারতে জাতীয় চেতনা জাগরণের মূলে আছে ফরাসী বিপ্লব, মার্কিন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডির যুব ইত্যাদির আন্দোলন ইতালির সুস্পষ্ট প্রভাব। উনিশ শতকে বাংলা দেশে রেনেশাঁসের চেতনা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব জাগায়। কালক্রমে এই প্রতিবাদের মনোভাবই ব্রিটিশ শাসন বিরোধী বৈপ্লবিক মনোভাবের সৃষ্টি করে। স্বভাবতই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ ও যুবকেরা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সেজন্য ১৯০৪ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের সক্রিয় নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ ও যুবকেরা।

[পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসার ঘটে। উদারনীতিবাদের প্রভাবে শিক্ষিত মানুষেরা ভারতের সুশৃংখল রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্রিটিশ শাসকের সাহায্য ও সহানুভূতি চেয়েছিলেন। ১৮৬৭-এর 'হিন্দু মেলা' আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার মতবাদ প্রচার করে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে শিক্ষিত ভারতবাসীরা বুঝতে শুরু করলেন যে ব্রিটিশ শাসক ভারতীয়দের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবাধে বিকাশলাভ করতে দেবে না। লর্ড লিটনের Vernacular Press Act এবং Arms Act ভারতে অবাধ রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিকাশে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করে।] তার ফলে ভারতে সর্বত্র গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সমিতির উল্লেখ করেছেন। এই গুপ্ত সমিতিতে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা যোগ দিতেন। লর্ড লিটনের শাসনকাল থেকে ব্রিটিশ শাসকের ভয়ংকর উগ্র সাম্রাজ্যবাদী চেহারা প্রকাশ পায়। শিক্ষিত বাঙালী বুঝতে শুরু করলেন ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় গুপ্ত সমিতি গঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। উনিশ শতকের সত্তর দশকের মধ্যভাগে বিপিনচন্দ্র পাল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শ্রীহট্ট থেকে কলকাতায় এসে দেখলেন যে কলকাতার ছাত্রসমাজ সেই সময় দলে দলে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিচ্ছেন ('Calcutta's student community was at that time honeycombed with secret organisations')।

কলকাতায় গড়ে ওঠা গুপ্ত সমিতিগুলির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোন পরিকল্পনা ছিল না, তরুণ ও যুবকদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রচার এবং দৈহিক প্রশিক্ষণ দানই ছিল গুপ্ত সমিতিগুলির লক্ষ্য। [ম্যাৎসিনির যুব ইতালি আন্দোলন, প্রাশিয়ার জার-বিরোধী গুপ্ত সমিতি গঠন এবং মার্কিন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে গুপ্ত সমিতির সদস্যরা রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি এবং তাঁর 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কাহিনী বাংলাদেশে তরুণ ও যুবকদের গুপ্ত সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম সভায় (১৮৯৩) বক্তৃতা গুপ্ত সমিতিগুলিকে বৈপ্লবিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল।] সদ্য লন্ডন প্রত্যাগত অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯৩ সালে পশ্চিম ভারতের 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় আবেদন নিবেদন সর্বস্ব রাজনীতি এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

নেতৃত্ব, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধমালা প্রকাশ করলেন। বাংলা দেশের গুপ্ত সমিতিগুলি তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করে নি।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ওয়াহবী আন্দোলন দমনের পর মহারাষ্ট্রে প্রথম বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সূচনা হয়। ১৮৯৭ সালে পুণার অত্যাচারী প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডকে দামোদর চাপেকার রিভালবারের গুলিতে হত্যা করে, তাঁর ভ্রাতা বালকৃষ্ণ চাপেকার র‍্যাণ্ড হত্যাকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। বিচারে দামোদর চাপেকার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পান এবং তাঁর ফাঁসি হয়। মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে। ১৮৮৩ সালে তিনি গুপ্ত সমিতি গঠন করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি তাঁর পরিকল্পনা জানতে পারে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

দামোদর চাপেকারের ফাঁসি হলেও মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে 'গণেশ পূজা' এবং 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মারাঠী তরুণ ও যুবকদের মধ্যে প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক মনোভাব জাগিয়েছিলেন। তিনি খানখোজে প্রতিষ্ঠিত 'বাল সমাজ' ও 'আর্য বান্ধব ভাণ্ডার' গুপ্ত সমিতি দু'টির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। নাসিকে গণেশ সাভারকার এবং তাঁর ছোট ভাই বিনায়ক দামোদর সাভারকার 'মিত্র মেলা' নামে একটি গুপ্তসমিতি গঠন করেন। বরোদার মহারাজা কলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ গুজরাতের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্রে প্রায় একই সময়ে গুপ্ত সমিতির উদ্ভব ঘটে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়।

বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ ঘোষ তাঁর অনুগামীদের বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে দীক্ষিত করেন। তাঁর আহবানে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বরোদায় যান। অরবিন্দ ঘোষ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের জন্য যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকে ১৯০২ সালে বরোদা থেকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রেরিত দূতেরা কলকাতায় এসে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বাঙালীর অনাগ্রহ দেখে হতাশ বোধ করেন।

আগেই বলা হয়েছে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল; কিন্তু এই সমিতিগুলির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কোন

পরিকল্পনা ছিল না। শ্রীমতী সরলা ঘোষালের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক মতাদর্শের অনুশীলন ও শরীর শিক্ষণের জন্য একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। ১৯০২ সালে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের উদ্যোগে তরুণ ও যুবকদের নৈতিক শিক্ষা ও শারীরিক উন্নতির জন্য 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয়। প্রথমনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বের' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর সংগঠনের নাম রাখলেন 'অনুশীলন 'সমিতি'। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদারনৈতিক রাজনীতি ও আবেদন নিবেদনের কর্মপদ্ধতিতে কখনো আকৃষ্ট হন নি। বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার পূর্ব শর্ত হিসাবে তিনি তরুণ ও যুবকদের নৈতিক চরিত্র ও শরীর গঠনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। 'অনুশীলন সমিতির' তিনি ছিলেন সভাপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ সহ-সভাপতি, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ, এবং সতীশচন্দ্র বসু সম্পাদক। অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় আসার অব্যবহিত পরেই 'অনুশীলন সমিতির' সহ-সভাপতি হন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০২ সালে গাইকোয়াড়ের আহবানে ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গেলে তিনি অরবিন্দ ঘোষকে বাংলাদেশ এবং বিশেষ করে কলকাতার গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত করেন। তিনি অরবিন্দ ঘোষকে বাংলা দেশের পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন গুপ্ত সমিতিগুলিকে একত্রিত করার জন্য কলকাতায় এসে উদ্যোগ নিতে বলেন। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে স্থায়িভাবে কলকাতায় চলে আসেন। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের গুপ্ত সমিতিগুলির প্রস্তুতি পর্বের যুগ বলা যায়। তখনও পর্যন্ত গুপ্ত সমিতিগুলি প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে নি।

২. জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রথম পর্ব

লর্ড কার্জনের দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি এবং বিশেষত ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের মত আক্রমণমুখী অপকীর্তিটি বাংলাদেশের সমস্ত স্তরের মানুষকে গভীরভাবে আহত করেছিল। ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে জেগে ওঠা নতুন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাকে সমূলে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যেই লর্ড কার্জন আক্রমণ-মুখী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবিভাগ ভারতে উপনিবেশবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পর থেকেই ভারতের জাতীয়-বিপ্লবী পরিচালিত

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সংগঠনটি অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতি থেকে বিতাড়িত হলে বাংলার বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্রিকার জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বারীন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁরা তখনও পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর বারীন ঘোষ ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ মিত্রের মতপার্থক্য ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। বারীন ঘোষ প্রমথনাথ মিত্রের লাঠি-ছোরা খেলা পদ্ধতির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ক্রমশ 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বারীন ঘোষের সহযোগীরা স্বতন্ত্রভাবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করায় উদ্যোগী হন।

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বাংলার বৈপ্লবিক রাজনীতিতে বোমা এবং বন্দুকের প্রবর্তন করেছিলেন বারীন ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীরা। ভারতের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ত্বরান্বিত করে। প্রমথনাথ মিত্র বিংশ শতকের প্রথম দশকে বৈপ্লবিক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। নৈহাটী রেলষ্টেশনে ফুলারের রেল কামরাকে বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন বারীন ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীরা। বাংলার বৈপ্লবিক রাজনীতিতে তাঁদের প্রথম এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে বাংলার ছোটলাটের রেলগাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন বারীন ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা। এবারেও তাঁরা সফল হন নি।

১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞের পর সভা ভেঙ্গে গেলে বাংলার বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিগুলিতে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

সুরাট থেকে ফিরে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর সহযোগীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চালাতে বলেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন তরুণদের বৈপ্লবিক কর্মে

দীক্ষিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বারীন ঘোষ এবং তাঁর সহযোগী-দের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। ১৯০৮-এ মজাফ্‌ফরপুরে বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডকে নিহত করতে গিয়ে ভুলক্রমে এক ব্রিটিশ দম্পতি নিহত হন। প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন। মতিলাল রায়ের বিবরণীতে জানা যায় যে, মজাফ্‌ফরপুরে রওনা দেবার প্রাক্কালে অরবিন্দ ঘোষ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন।

প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার হবার আগেই রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। বন্দী থাকাকালীন অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে পুলিশ ক্ষুদিরামের কাছ থেকে গুপ্ত কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে পুলিশ মানিকতলার বাগানবাড়ি ও অন্যান্য স্থানে হানা দিয়ে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ ও তাঁদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। পুলিশ হাজতে থাকাকালীন বারীন ঘোষ ঘোষণা করলেন 'My mission is over.' অর্থাৎ বারীন ঘোষ চেয়েছিলেন গুপ্ত সমিতি ও বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ব্যাপক প্রচার। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর সময় 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল।

বাংলাদেশের বৈপ্লবিক চিন্তা প্রচারে 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকা রুশ বিপ্লবের ছকে ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম পরিচালনার কথা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার কথা বলেছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর বারীন ঘোষ ও তাঁর সহযোগীদের সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের অবসান ঘটে।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির নতুন নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অতি দ্রুত বাংলাদেশ এবং উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রমথনাথ মিত্র ঢাকায় গিয়ে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঢাকা অনুশীলন সমিতির জন্য পুলিন দাসকে পরিচালক এবং আনন্দ চক্রবর্তীকে অধিনায়ক নিয়োগ করেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতি বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। তরুণ ও যুবকদের

নিয়ে গঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতি শৃংখলা, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সমিতির সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলিতে সমিতির অজস্র শাখা গড়ে উঠেছিল। পুলিন দাসের প্রত্যক্ষ তদারকিতে অনুশীলন সমিতির শাখাগুলি গড়ে ওঠে। ১৯১০-এর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সময় পর্যন্ত পুলিন দাসের নেতৃত্ব অব্যাহত ছিল। তাঁর নির্বাসনের পর সমিতির নেতৃত্বে আসেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃতলাল হাজরা প্রমুখ তরুণ ও যুবকেরা। এঁদের বয়স তখন উনিশ থেকে চব্বিশের মধ্যে। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য এবং গোপন কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য দু'টি বিভাগ ছিল। ১৯০৮-এ অনুশীলন সমিতি দুঃসাহসিক রাজনৈতিক ডাকাতি করে। ঢাকা জেলার বাহ্রা গ্রামে সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত ভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে একজন ধনী লোকের বাড়িতে ডাকাতি করা হয়। বাহ্রা ডাকাতির রাজনৈতিক তাৎপর্য সুদূর প্রসারী ছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে ১৯০৮-এর শেষের দিকে ফরিদপুরের নড়িয়া অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র সহযোগে রাজনৈতিক ডাকাতি করা হয়।

পুলিশ বুঝতে পারে যে, ঢাকা অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূলে রয়েছে পুলিন দাস। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ১৯০৮-এর নভেম্বরে পুলিন দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অনেকগুলি সফল রাজনৈতিক ডাকাতি এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতি ব্রিটিশ শাসকদের মনে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপ দমন করার জন্য ব্রিটিশ শাসক ১৯০৮ এর ডিসেম্বরে পুলিন দাস, ভূপেন নাগ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখকে ১৮১৮-এর তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করে। পুলিন দাসকে পাঞ্জাবের জেলে অন্তরীণ রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার জাতীয় বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি থেকে পুলিন দাসকে সরিয়ে নিতে সমর্থ হল। অবশ্য বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি এর দ্বারা ব্যাহত হয় নি।

ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ শাসক ১৯০৮-এর ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন করে কতকগুলি অপরাধমূলক মামলা জুরির সাহায্য ব্যতিরেকেই হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে বিচারের ব্যবস্থা করল। নতুন সংশোধনী আইন প্রয়োগ করে ব্রিটিশ শাসক

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করার জন্য ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি' ময়মনসিংহের 'সুহৃদ ও সাধনা সমিতিকে' বেআইনী ঘোষণা করল। সমিতিগুলির আইনসম্মত কার্য-কলাপ বন্ধ করা হলে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। তার ফলে জাতীয়-বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নতুন উদ্দীপনায় পরিচালিত হয়।

১৯১৩ সালে অনুশীলন সমিতির জাতীয়-বিপ্লবীরা পিকরিক এ্যাসিড বোমা তৈরী করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারের ব্রিটিশ মহকুমা শাসকের উপর পিকরিক এ্যাসিড বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ব্রিটিশ শাসক বেঁচে যান। পরবর্তীকালে বাংলা দেশের জাতীয়-বিপ্লবীরা মারাত্মক পিকরিক এ্যাসিড বোমার সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন। বাংলাদেশে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অনুশীলন সমিতি ও 'যুগান্তর গোষ্ঠীভুক্ত জাতীয়-বিপ্লবীদের ভূমিকা আগেই আলোচিত হয়েছে। 'যুগান্তর' পত্রিকা বিপ্লব-তত্ত্ব প্রকাশ করে সন্ত্রাসবাদী কার্য কলাপের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল। সারা দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করাই ছিল জাতীয় বিপ্লবীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'যুগান্তর' পত্রিকা অবিরাম ভাবে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের রণনীতি ও রণকৌশল প্রচার করেছিল। বিপ্লব-তত্ত্ব প্রচারের পাশাপাশি 'যুগান্তর' পত্রিকা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কাজ পরিচালনার জন্য কেমনভাবে অর্থসংগ্রহ করা হবে তার খসড়া প্রকাশ করেছিল।

বাংলাদেশের পাশাপাশি বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে জাতীয় বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৯ সালে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। অজিত সিং, অম্বাপ্রসাদ, লালা হরদয়াল প্রমুখরা পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের পথিকৃৎ। ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ হয়েছিল যে, 'আর্য সমাজ' পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক কার্যকলাপে উৎসাহ দিয়ে থাকে। অবশ্য 'আর্য সমাজ' এই অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। ভূমি খাজনা বৃদ্ধি পাঞ্জাবে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে তীব্র করেছিল। এই মনোভাবই খুব শীঘ্র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করেছিল। দীননাথ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ প্রমুখ

পাঞ্জাবের জাতীয়-বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক সমিতিগুলির মধ্যে ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব-ভারত' সংগঠনটি সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এই সময় মহারাষ্ট্রের অগ্রগামী জাতীয়-বিপ্লবী ছিলেন। 'অভিনব ভারতের' সদস্য পি এন বাপটকে বোমা তৈরী শিক্ষণের জন্য প্যারিসে পাঠানো হয়েছিল। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে 'অভিনব ভারত' ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করত। বোমা তৈরীর কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করার পর কোলাপুর বোমা মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার ফলে বহু বিপ্লবীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

আলোচ্য পর্বে মহারাষ্ট্রের খারে ও কার্ভে, রাজস্থানের অর্জুনলাল শেঠী, ভারতকেশরী সিং, রাও গোপাল সিং এবং মাদ্রাজের নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী, ভি. আয়ার প্রমুখরা এই প্রদেশগুলিতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে জাতীয়-বিপ্লবীরা বহির্ভারতে কর্মতৎপরতা শুরু করেন। বৈপ্লবিক পন্থায় ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য তাঁরা চালান। ১৯০৫ সালে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটি' স্থাপন করেন এবং বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচারের জন্য 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে লণ্ডন প্রবাসী তরুণ জাতীয়-বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে ওঠেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা তরুণ বিপ্লবীদের লণ্ডন শহরে থাকার জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মাদাম কামা। মাদাম কামা লণ্ডনে বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালান। লাজপৎ রায় এবং অজিত সিং-এর অন্তরীণ আদেশের বিরুদ্ধে মাদাম কামা প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচলনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি সরকারী রোষ এড়ানোর জন্য লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচার চালান।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দামোদর বিনায়ক সাভারকার, লালা হরদয়াল, মদনলাল ধিংড়া প্রমুখ যুবকেরা উচ্চশিক্ষার জন্য লণ্ডনে গিয়ে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বৈপ্লবিক গোষ্ঠীতে যোগ দেন। মদনলাল ধিংড়া ১৯০৯ সালে উইলিয়াম কার্জন-ওয়াইলিকে হত্যা করেন। তিনি হত্যার অপরাধে প্রাপ্ত প্রাণ-দণ্ডকে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শহীদের মর্যাদা বরণ বলে অভিহিত করেন।

লণ্ডন এবং প্যারিসে বৈপ্লবিক প্রচার যেমন চলেছিল ঠিক তেমনই ১৯০৭-এ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ায় তারকনাথ দাস 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেনস লীগ' স্থাপন করে বহির্ভারতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক প্রয়াসকে জোরদার করেন। তারকনাথ প্রতিষ্ঠিত লীগের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করা। লালা হরদয়াল এই লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পাঞ্জাবী ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদের জন্য 'গদর পার্টি" প্রতিষ্ঠিত হয়।

লালা হরদয়াল 'গদর পার্টি" প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'গদর' শব্দের অর্থ হল বিপ্লব।' 'গদর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। 'গদর' আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পাঞ্জাবীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। খুব শীঘ্র গদর আন্দোলনের প্রধান নেতা হরদয়াল মার্কিন সরকারের বিরাগভাজন হয়ে ঐ দেশ ত্যাগ করেন।

৩. জাতীয়-বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপের দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) ভারতে ও বহির্ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের তীব্র তৎপরতা দেখা যায়। এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায় বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলে সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করা হয়। যদিও এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তবুও ভারতের জাতীয়-বিপ্লবীরা এই সময় প্রকৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা গভীর সংকটে পড়েছিল। বিদেশী শাসকের সংকটময় অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তির সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করে জাতীয়-বিপ্লবীরা তাঁদের উন্নত রাজনৈতিক বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদ তাঁদের পদ্ধতি হলেও তাঁরা সামরিক ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

জাতীয়-বিপ্লবীরা সংবাদ পেয়েছিলেন যে, ভারতে মাত্র দশ হাজার সেনাবাহিনী মোতায়েন আছে। অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানের সমরাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের ধারণা হয়েছিল বৈদেশিক শক্তিগুলি যদি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করে তাহলে

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর হবে। তাঁরা ভেবেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেয় সে ক্ষেত্রে খুব সহজেই তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতীয়-বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রধানত চারটি আশু কর্তব্যকে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রথমত, ভারত ও ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত ভারতীয় সৈনিকদের দলত্যাগ করানো, দ্বিতীয়ত, ভারতে প্রত্যাগত পাঞ্জাবী 'গদর' বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করানো; তৃতীয়ত, জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ভারত-জার্মান সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকে কার্যকর করা এবং চতুর্থত, ভারতের গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে ঐক্য সাধন করে সশস্ত্র সংগ্রামকে জোরদার করা। জাতীয় বিপ্লবীকে জার্মানীর সহযোগিতায় যুক্ত করে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯১৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, লালা হরদয়াল প্রমুখেরা জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ভারতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে বার্লিনে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি' গঠন করলেন। এই কমিটি 'বার্লিন কমিটি' নামে সমধিক খ্যাত। তুরস্কের জার্মানদের সহযোগিতায় 'বার্লিন কমিটি' শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। 'বার্লিন কমিটি' জার্মান অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই দুটি জাহাজ ভারতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল। 'সিডিশান কমিটির' প্রতিবেদনে জানা যায় যে, জার্মান সরকার ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেঃ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে আফগান পরিকল্পনা, গদর বিপ্লবীদের পরিচালনায় ব্যাংকক পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য বাটাভিয়া পরিকল্পনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'গদর পার্টি' ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিল। ১৯১৪ সালে 'গদর' পত্রিকার একটি সংখ্যায় ভারতীয় হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সৈনিকদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থানে সামিল হতে বলা হয়। ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলা হলঃ 'নির্ভীক মানুষেরা! কতদিন আর দাসত্বে থাকবেন? জেগে উঠুন আর আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হোন।' 'গদর' পত্রিকা লিখল, 'We should fight guerrilla wars...war cannot be

accomplished without the sword'. 'গদর পার্টি' ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জার্মানীর সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছিল। 'গদর' আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াসে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানকে গদর পার্টির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা।

'গদর পার্টি' ভারতের বাইরে বসবাসকারী শিখদের দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়ে ব্রিটিশবিরোধী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে তাদের যুক্ত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে সিঙ্গাপুরের শিখ ধনী ব্যবসায়ী গুরদিত সিং 'কোমাগাতামারু' নামে একটি জাহাজ ভাড়া করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী পাঞ্জাবীদের কানাডায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। 'কোমাগাতামারু' জাহাজটি কানাডার বন্দরে পৌঁছলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ মাত্র কয়েকজনকে জাহাজ থেকে অবতরণের যোগ্য বলে ঘোষণা করে। কানাডার আইন অনুসারে অবশিষ্ট যাত্রী বন্দরে অবতরণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে হংকং-এর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'কোমাগাতামারু' জাহাজের যাত্রীদের ঐ বন্দরে অবতরণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হয়। শেষ পর্যন্ত জাহাজটি জাপান থেকে ফিরে ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করে। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে 'কোমাগাতামারু' হুগলী নদীর বজবজ বন্দরে নোঙর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ঘোষিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস ধরে জাহাজে থাকা ক্লান্ত ও শ্রান্ত শিখ যাত্রীদের বজবজে অবতরণের অনুমতি দানে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা আগেই জেনেছিল গদর পার্টির সমর্থকেরা ভারতে ফিরছেন।

ভারত সরকার 'কোমাগাতামারু' জাহাজের যাত্রীদের একটি বিশেষ ট্রেনে পাঞ্জাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। বেশির ভাগ শিখ যাত্রী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে কলকাতা শহর অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকার 'গদর পার্টির' সমর্থক শিখদের কলকাতা অভিযান বন্ধ করার জন্য সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে গুলিগোলা চালায়। তার ফলে ১৮ জন শিখের মৃত্যু হয়। 'কোমাগাতামারু' জাহাজের ঘটনা এবং শিখ হত্যার ঘটনা ভারতের বাইরে বসবাসকারী শিখদের প্রবলভাবে উত্তেজিত করে।

বাংলাদেশের জাতীয়-বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য এক অভিনব উপায়ে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতায় অবস্থিত রডা অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতা সংস্থা বিদেশ থেকে বন্দুক, পিস্তল এবং কার্তুজ আমদানি করেছিল। কলকাতার 'আত্মোন্নতি গুপ্ত' সমিতির সদস্যরা

পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়ে রডা কোম্পানিতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছানোর আগেই সেগুলিকে পথিমধ্যে হস্তগত করেন। আশু রায় এবং কালিদাস বসু আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই পেটিকে নিয়ে পলায়ন করেন। এই পেটিতে বহু মাসুয়ার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ কার্তুজ ছিল। 'সিডিশন কমিটি' এটিকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করে। লুণ্ঠিত মাসুয়ার পিস্তল এবং কার্তুজ বাংলাদেশের জাতীয়-বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

১৯১২ সালে ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লীর রাজপথে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনার পর দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। রাসবিহারী বসু দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আত্মগোপন করেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে যে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিল তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ ছিল পাঞ্জাবী। রাসবিহারী বুঝেছিলেন এদের উপরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। সুতরাং এদের আনুগত্যে ঘুণ ধরানোই হল রাসবিহারীর প্রধান লক্ষ্য। তিনি পূর্ব সীমান্তে আসাম-বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার পর্যন্ত একসঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন সৈন্য ব্যারাকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার চলতে লাগল।

ইউরোপের যুদ্ধ তখন জার্মানীর অনুকূলে। বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হল লাহোরে। রাসবিহারী ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সর্বত্র একযোগে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করার দিন ধার্য করলেন। জনৈক কৃপাল সিং-এর বিশ্বাস-ঘাতকতায় ব্রিটিশ সরকার রাসবিহারী পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের সংবাদ আগেই জেনে যায়। রাসবিহারী সেজন্য এক দিন আগিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অভ্যুত্থানের আয়োজন করলেন। কিন্তু দিন পরিবর্তনের সংবাদও পুলিশ জেনে যায়। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর রাতে এবং পরদিন খুব ভোরবেলায় পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ সেনাবাহিনী আমদানি করা হল। নেতৃস্থানীয় সাতজন গ্রেপ্তার হলেন। বহু অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ল। যে সমস্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা হল তাদের ন'টি দলে ভাগ করে অভিযুক্ত করা হল। ন'টি পৃথক পৃথক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হল। এই মামলাগুলির ফলে ২৮ জন প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা পান, ২৯ জন খালাস হয়ে আসেন এবং বাকি সবাই দ্বীপান্তর ও দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডাজ্ঞা পান। রাসবিহারী বসু ছদ্মনামে ভারত ত্যাগ করে জাপানে চলে যান।

জার্মানীর অস্ত্র সাহায্যে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোয় প্রয়াসী হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগীরা। ১৯১৫ সালে মার্চ মাসে শ্রীরামপুরের জীতেন লাহিড়ী জার্মানী থেকে ফিরে এসে খবর দিলেন যে, জার্মান জাহাজ 'মেভেরিক' প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এপ্রিল মাসে ভারতে আসছে। যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীরা 'মেভেরিক' জাহাজ থেকে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ এবং সেগুলিকে বণ্টন ও রক্ষণাবেক্ষণের আয়োজন করলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে এম এন রায়) 'মার্টিন' ছদ্মনাম গ্রহণ করে জার্মান কনসালের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাটাভিয়ায় যান। জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে বাংলাদেশকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা যতীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি। কারণ অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ ভারতে আসে নি। দীর্ঘ দশ দিন সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে জার্মান জাহাজের জন্য অপেক্ষা করে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীরা আত্মগোপনের জন্য উড়িষ্যায় চলে আসেন।

কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পর পুলিশ যতীন্দ্রনাথের সন্ধানে বালেশ্বরে ধাওয়া করে। পুলিশের দ্বিমুখী আক্রমণের সামনে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীরা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তুমুল লড়াই চালান। শেষ পর্যন্ত চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং যতীন্দ্রনাথ মারাত্মকভাবে গুলিতে আহত হন। রাসবিহারী বসু জার্মান অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। বিদেশী অস্ত্র-শস্ত্রের উপর নির্ভর করে ভারতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালানো কি দুরূহ ব্যাপার যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বরে আত্মগোপন ও পরে নিরুপায় হয়ে পুলিশের সঙ্গে তুমুল লড়াই চালানোর ঘটনাটি থেকে তা প্রমাণিত হয়। শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়-বিপ্লবীরা বৈদেশিক অস্ত্রের সাহায্যে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, যতীন্দ্রনাথকে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক করা হয়। ১৯১০-এর হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন্দ্র নাথ ও তাঁর ৪৩ জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলের অভ্যন্তরে যতীন্দ্রনাথ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। বারীন ঘোষের নেতৃত্বে মুরারীপুকুর গোষ্ঠীর মত যতীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সন্ত্রাসমূলক আক্রমণে তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি। তিনি গভীর রাজনৈতিক আকাংখা নিয়ে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত

হয় নি। অসীম সাহসিকতার তিনি যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তার জন্য দেশবাসী তাঁকে 'বাঘা যতীন' নামে ভূষিত করেছেন।

৪. জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তৃতীয় পর্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইউরোপ ও এশিয়ায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এবং ভারতের জাতীয়-বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমন করার নতুন নীতি ও কৌশল গ্রহণ করল। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসককে তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। (১) অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা-লোলুপ নরমপন্থী নেতাদের নামমাত্র ভারত শাসনের অধিকার দিয়ে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার (১৯১৭) প্রবর্তন; (২) যুদ্ধ চলাকালীন ভারতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ অনুসন্ধান এবং সেগুলিকে দমনের সুপারিশ করার জন্য রাওলাট কমিশন গঠন (রাওলাট বিল, ১৯১৯); (৩) রাজবন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তিদানের নীতি গ্রহণ (১৯১৯)। রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ও বিক্ষোভ যুদ্ধোত্তর ভারতে শ্রমিক ও কৃষককে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করেছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে রাওলাট বিল বিরোধী আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই সময় অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ শাসকের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রেক্ষাপটে জাতীয়-বিপ্লবীরা ভাবলেন কেমনভাবে মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারের সাংবিধানিক মোহ থেকে ভারতীয়দের মুক্ত করা যায়। ঠিক এই সময়ে গান্ধীজী ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস অসহযোগ গণ-আন্দোলন শুরু করলেন। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি মত জাতীয়-বিপ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন কোন উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন নি। চৌরি-চৌরায় পুলিশ হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখলে জাতীয়-বিপ্লবীরা পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার কথা চিন্তা করলেন। ১৯২৩ সালে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি পুনরায় সক্রিয় হয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে দেয়। এই সময় 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' প্রয়োগ করে পুলিশের কর্তারা জাতীয়-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে চরম নির্যাতন চালায়। পুলিশী নির্যাতনের নায়ক ছিল চার্লস টেগার্ট। ১৯২৪ সালে কয়েক হাজার বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক করা হয়। টেগার্টের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়েকটি বৈপ্লবিক সমিতি তৎপর হয়ে ওঠে।

টেগার্টকে হত্যা করার জন্য জাতীয়-বিপ্লবীরা গোপীনাথ সাহার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। টেগার্টকে গুলি করতে গিয়ে ভুলক্রমে গোপীনাথের গুলি অপর একজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। বিচারে গোপীনাথের প্রাণদণ্ড হয়। বেলগাঁংয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে গান্ধীজী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ একটি জোরালো সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। খুব সামান্য ভোটের ব্যবধানে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' দলের তরুণ সক্রিয় সদস্য ও অনুগামীরা ব্রিটিশ শাসকের নির্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দমননীতির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কার্য-কলাপ শুরু করার জন্য একটি নতুন বিপ্লবী দল গঠনে প্রয়াসী হলেন। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে যখন জাতীয় সংগ্রামের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ঠিক তখনই ভারতের জাতীয়-বিপ্লবীরা হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন (Hindusthan Republican Association) নামে একটি নতুন বিপ্লবী দল গঠন করলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে 'Federated Republic of the United States of India' গঠন করাই হল এই সংগঠনের লক্ষ্য। 'ভবিষ্যৎ ভারতের প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন এবং মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটানোকে মূল লক্ষ্য' হিসাবে প্রচার করা হল। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন মজবুত করে বৈপ্লবিক চেতনা বিকাশের কথা বলা হল।

নবগঠিত বৈপ্লবিক সংগঠনের সর্বাপেক্ষা সাহসিকতাপূর্ণ বিপ্লবী কর্ম হল রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে কাকোরী স্টেশনে সরকারি অর্থ লুট করার জন্য ট্রেন ডাকাতি। ১৯২৫-এর আগস্ট মাসে কাকোরীতে দুঃসাহসিক রেল ডাকাতি হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর পুলিশ কাকোরী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। পুলিশ বিখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বিচারে কয়েকজন নেতার প্রাণদণ্ড হয় এবং অন্যান্যরা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড পান। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী রূপে রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রোশনলাল এবং আসফাকুল্লার ফাঁসি হয়। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল এবং আরো তিন জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান।

হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের প্রাণদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পর এই সংগঠনের দায়িত্ব ভগত সিং এবং চন্দ্রশেখর

আজাদের উপর এসে পড়ে। চন্দ্রশেখর কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে হিন্দুস্তান রিপাবলিক এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা মিলিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' (Hindusthan Socialist Republican Association) নামটি গ্রহণ করলেন। ভগত সিং-এর প্রস্তাব অনুসারে নতুন নামকরণ করা হয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত হল সমাজতন্ত্রের আদর্শ।

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রভাব ভগত সিং ও তাঁর সহযোগীদের প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনে'র উপর পরিলক্ষিত হয়। বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে বড় বড় শহরের শ্রমিক আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রয়াস দেখা দিল। লাহোরের অত্যাচারী ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার সাণ্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করলেন ভগত সিং। ভগত সিং-এর নতুন সংগঠন সারা উত্তর ভারত, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে পরিব্যাপ্ত হল। বিহারে এই সংগঠনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল। দক্ষিণ ভারতে পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, কিসত্না, গুন্টুর, নেল্লোর, মাদুরাই, তাঞ্জোর, মালাবার প্রভৃতি জেলাগুলিতে 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনে'র শাখা গড়ে উঠেছিল।

সাইমন কমিশন বয়কট বিক্ষোভ মিছিলে লাজপত রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় পাঞ্জাবের ব্রিটিশ পুলিশ অফিসাররা তাঁর মাথায় লাঠির আঘাত দেয় এবং এই ঘটনার কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন লাজপত রায়ের হত্যাকারীদের চরম শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী ভগত সিং ও রাজগুরু পুলিশ অফিসার সাণ্ডার্সকে গুলিতে হত্যা করেন। ১৯২৯ সালে এপ্রিল মাসে ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভার কক্ষের অভ্যন্তরে বোমা নিক্ষেপ করে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার অধ্যক্ষ বিঠলভাই প্যাটেল সভায় আনীত পাবলিক সেফটি বিল সম্পর্কে কংগ্রেস দল উত্থাপিত 'পয়েণ্ট অব অরডারের' (point of order) রুলিং দান শেষ করে ট্রেড ডিসপিউটস বিল এর (Trade Disputes Bill) উপর তাঁর রুলিং পাঠ করতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় ভগত সিং দর্শকের গ্যালারি থেকে দাঁড়িয়ে সভাকক্ষে বোমা নিক্ষেপ করেন। সেই সঙ্গে তিনি এবং বটুকেশ্বর দত্ত 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস

হোক', এবং 'দুনিয়ার মজুর এক হও' ধ্বনি দিতে দিতে 'লাল ইশতেহার' বিতরণ করেন।

বোমা নিক্ষেপের ঘটনার পর পুলিশ লাহোর এবং সাহারাণপুরে বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করে। ফলে 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনে'র বহু সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৯২৯ সালে বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ভগত সিং এই মামলার একজন প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি। মামলা চলাকালীন বিচারাধীন বন্দীরা জেলে পুলিশী দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করে রাজবন্দীর মর্যাদা দাবি করেন। কারণ তাঁদের ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচারাধীন বন্দীদের অনশন দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট ত্যাগ করেন। কেবলমাত্র যতীন দাস ৬৪ দিন অনশন ধর্মঘট চালিয়ে অবশেষে ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে মারা যান। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগত সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর প্রাণদণ্ড হয় এবং বহু অভিযুক্ত বিপ্লবীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। তরুণ যতীন দাসের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে মৃত্যু সারা ভারতের যুব আন্দোলনকে প্রবলভাবে উদ্দীপিত করে। তার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে।

ভগত সিং-এর ফাঁসি সারা ভারতে প্রবল বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ১৯৩১-এ করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ভগত সিং ও তাঁর সহযোগীদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ স্মরণ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কংগ্রেস নীতিগতভাবে হিংসা এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিরোধী হওয়ায় গান্ধীজী প্রস্তাবের মুখবন্ধ পরিবর্তন করে একটি সংশোধন যোগ করলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ ও যুব স্বেচ্ছাসেবকরা এই সংশোধনের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রবল বিতর্কের পর সামান্য ভোটের ব্যবধানে সংশোধনটি গৃহীত হয়।

ভগত সিং ও তাঁর সহযোগীদের ফাঁসির পর 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের' বৈপ্লবিক কার্যকলাপ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ১৯৩০-এ গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পরও ইতস্ততঃভাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। এলাহাবাদে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য চন্দ্রশেখর আজাদ নিজেকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর

উত্তর ভারতে এ্যাসোসিয়েশনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে যায়।

আইন অমান্য গণ-আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে ঠিক সেই সময় বাংলাদেশে বিপ্লবীরা একটার পর একটা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৩০ সালে সূর্য সেনের (মাস্টার দা) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি এবং তাঁর বৈপ্লবিক সহযোগীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গেই পূর্ব বাংলার অস্ত্রাগারগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। সূর্য সেনের সহযোগী হিসাবে অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং অনন্ত সিং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্তর মত অসীম সাহসী তরুণী সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চট্টগ্রাম শাখার 'ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি' (Indian Republican Army) নামে মাস্টারদা একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। এই ইশতেহারে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ভারতীয়দের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল রাতে চট্টগ্রামে পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। বিপ্লবীরা দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা অস্ত্রাগার থেকে গুলি গোলা নিয়ে যেতে ভুলে যান। ফলে লুণ্ঠিত বন্দুক এবং রাইফেলগুলির ব্যবহার সম্ভবপর হয় নি।

জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ পাহাড়ে সশস্ত্র সংগ্রাম সারা ভারতের তরুণ ও যুব বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কাজে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ পাহাড় সংঘর্ষের নেতারা প্রায় তিন বছর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। সূর্য সেন ১৯৩৩-এর মে মাসে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীরা অনেকগুলি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করেছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েকমাস পরেই ঢাকার মেডিকেল ছাত্র বিনয় বসু ইংরেজ ইনসপেকটর-জেনারেল অব পুলিশকে হত্যা করেন। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে বিনয় এবং তাঁর দুই বন্ধু বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে

ইংরেজ ইনসপেকটর-জেনারেল অব প্রিসনজনস্-কে হত্যা করেন। তাঁরা যথেচ্ছভাবে ইংরেজ অফিসারদের দিকে গুলি চালাতে চালাতে রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দা দিয়ে এগোতে থাকেন। গ্রেপ্তার আসন্ন জেনে বাদল বিষ খেয়ে তখনই আত্মহত্যা করেন এবং বিনয় ও দীনেশ নিজেদের গুলি করেন। বিনয় কয়েকদিন পর মারা যান। কিন্তু দীনেশ সুস্থ হলে তাঁর বিচার হয় এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯৩৪ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, বোম্বাই, রাজপুতানা, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। ১৯৩২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তদানীন্তন গভর্ণর ভাষণ দিতে শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী বীণা দাস তাঁকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিচারে বীণা দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টা করলে ডঃ নারায়ণ রায় ও ডঃ ভূপাল বসুকে আন্দামানের সেলুলার জেলে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা হয়। এই সংগ্রাম ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর খুব বড় রকম দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী প্রয়াস আর দেখা যায় নি। বিক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশ সমেত সারা ভারতে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপ প্রায় ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৩০-এর দশকে ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী প্রয়াসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৫. জাতীয়-বিপ্লবীদের মতাদর্শ ও রাজনীতি

ঊনিশ শতকের নব্বুই-এর দশকে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনায় যথেষ্ট জটিলতা দেখা দেয়। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের উদারনীতিক রাজনীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হয় নি। ১৮৯২-এর শাসনসংস্কার আবেদন নিবেদনের উদারনীতিক রাজনীতির অসারতা প্রমাণ করেছিল। নরমপন্থী পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে নি। রেনেশাঁস আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের প্রাচীন যুগকে পুনরাবিষ্কারের প্রয়াস চলেছিল। তার ফলে ধর্মীয় জাগরণের

উদ্ভব ঘটে। এই জাগরণের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও আর্য সমাজের অনুগামীরা প্রাচীন ভারতের ধর্মচিন্তাকে আধুনিক ভারতের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

হিন্দু জাগরণ খুব শীঘ্র হিন্দু পুনরুজ্জাগরণবাদের বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় ঐতিহ্যের উপর শ্রদ্ধার মনোভাবকে জাগিয়ে তোলে। তার ফলে জাতীয় জীবন এবং জাতীয় চিন্তায় 'গীতা'র প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবকে পুনর্জাগরিত করেন। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোর বিশ্বধর্ম সভায় বক্তৃতা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উদ্বুদ্ধ করে। একই সময়ে বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তিলক 'গণপতি উৎসব' এবং 'শিবাজী উৎসব'কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন।

বাংলাদেশ এবং মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্দীপিত করেন। বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তারূপে আবির্ভূত হন। অরবিন্দ ঘোষ প্রথমে মহারাষ্ট্র এবং পরে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বৈপ্লবিক মতাদর্শকে জনপ্রিয় করেন। বঙ্কিম, তিলক এবং অরবিন্দ 'গীতার' ধর্মযুদ্ধের দর্শন ব্যাখ্যা করেন।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে জাতীয় বিপ্লবীদের মতাদর্শে হিন্দু ধর্মের প্রবল প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাস (cult) এই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটি হল বাঙালীর দেবী কালী বা শক্তির ধর্মবিশ্বাস। মহারাষ্ট্রে এই সময় জনপ্রিয় হল ভবানী ধর্মবিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেবী দুর্গাকে মাতৃভূমিরূপে কল্পনা করে একটি নতুন ধর্মীয় মতাদর্শের সৃষ্টি করলেন। ভবানীর করুণাই শিবাজীকে অসীম সাহসী করেছিল, এই বিশ্বাস মহারাষ্ট্রে ভবানী ধর্মীয় মতাদর্শকে জনপ্রিয় করে তোলে। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা শক্তির ধর্ম বিশ্বাসে (cult of Shakti) এবং মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা ভবানীর ধর্মবিশ্বাসে (cult of Bhabani) অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গুপ্ত সমিতির জাতীয় বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য অরবিন্দ ঘোষ বাংলাদেশের শক্তিতত্ত্ব এবং মহারাষ্ট্রের ভবানী তত্ত্বের সমন্বয়ে 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে হেমচন্দ্র কানুনগোকে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত করেন।

দীক্ষার অনুষ্ঠানে তিনি হেমচন্দ্রকে এক হাতে 'গীতা' স্পর্শ করিয়ে অপর হাতে তরবারি দিয়ে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার শপথ বাক্য পাঠ করান। প্রমথনাথ মিত্র ঢাকায় যখন পুলিন দাসকে বৈপ্লবিক কর্মে দীক্ষিত করেন, সেই সময় অনুরূপ অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। গুপ্ত সমিতিগুলি হিন্দু আচার ও অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রধানত পরিচালিত হয়, তার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা বৈপ্লবিক কর্মে আকৃষ্ট হতে পারেন নি।

সতীশ পাকড়াশী তাঁর 'অগ্নিযুগের কথা' পুস্তকে বলেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাতীয়-বিপ্লবীরা প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখতেন। তাঁরা ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ, বাণিজ্য ও শিল্পকে ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় বিপ্লবীরা বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে হিন্দুধর্মকে একীভূত করেছিলেন।

প্রথম যুগের জাতীয় বিপ্লবীদের মতাদর্শের ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্ম ও 'গীতা'। কিন্তু তাঁদের বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তাঁরা ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ইতালি, রাশিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডের গুপ্ত সমিতিগুলির কর্মপদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠন করে, সশস্ত্র অভিযানে অর্থ সংগ্রহ করে, ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাস চালিয়ে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। জাতীয় বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বিদেশী প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অরবিন্দ ঘোষ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত সমিতি, সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বরোদায় এসে তিনি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রথম পর্বে জাতীয় বিপ্লবীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে ইউরোপের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির রাজনীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাতীয়-বিপ্লবীরা বৈদেশিক অর্থ সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন।

বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের তৃতীয় পর্বে জাতীয়-বিপ্লবীদের মতাদর্শে সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ইউরোপের গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবীদের অনুকরণে

ভারতের জাতীয় বিপ্লবীরা অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার এবং গোয়েন্দার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত এবং দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম পরিচালনা করে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। এই পর্বে তাঁরা রুশ বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাবে শ্রমিক-কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করার কথা ভেবেছিলেন। যদিও তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনে'র সংবিধান ও ইশতেহারে সমাজ-তান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। সংবিধানে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে; এই প্রজাতন্ত্র সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। 'দি রেভেল্যুশনারি' (The Revolutionary) নামে চার পৃষ্ঠার একটি ইশতেহার (১৯২৫) প্রকাশ করে এ্যাসোসিয়েশন বৈপ্লবিক কর্মসূচী প্রচার করে। এই বৈপ্লবিক দল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতি সম্মানসূচক মনোভাব গ্রহণের কথা বলেছিল।

এ্যাসোসিয়েশনের 'ইশতেহারে' সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় বিপ্লবীরা কখনও সন্ত্রাসবাদী অথবা নৈরাজ্যবাদী নয়। তাঁরা ভারত ভূমিতে নৈরাজ্য বিস্তার করতে চান না, সেজন্য তাঁদের কখনও নৈরাজ্যবাদী বলা যায় না। সন্ত্রাসবাদ কখনও তাঁদের লক্ষ্য নয়। শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসবে, তাঁরা এ মত পোষণ করেন না। তাঁরা কখনও সন্ত্রাসবাদের জন্যই সন্ত্রাসবাদকে চান না। যদিও তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিশোধ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।' সন্ত্রাসবাদী কর্মপদ্ধতি গ্রহণে জাতীয় বিপ্লবীরা কেন বাধ্য হয়েছিলেন ইশতেহারে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'বিদেশীরা সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে বর্তমান সরকারকে বজায় রেখেছে। এই সরকারি সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার জন্যই প্রতি-সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন হয়।'

সন্ত্রাসবাদী কর্মপদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হলেও 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের' সংবিধান ও ইশতেহারে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে স্বাধীন ভারতের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। এই পর্বে জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে শ্রেণী চেতনার উদ্ভব ঘটে।

ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার কক্ষে বোমা নিক্ষেপের

ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রকাশ্য আদালতে যে ঐতিহাসিক বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের' মতাদর্শ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁরা ব্রিটিশ প্রাধান্যে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে 'শ্বাসরোধকারী শোষকের স্তম্ভ' বলে বর্ণনা করেন। আইনসভায় পরিত্যক্ত অথচ বড়লাটের সার্টিফিকেটে গৃহীত 'জননিরাপত্তা বিল' এবং 'ট্রেড ডিসপিউট্স বিল' ভারতের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য রচিত হয়েছে। এই কুখ্যাত বিল দু'টির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের জন্য তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেন।

ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের মতাদর্শ ব্যক্ত করে আদালতের সামনে বিবৃতি দিয়ে বলেন: সমাজের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, সেজন্য ভারতীয় সমাজকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা দরকার। শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটালে মানুষের দুর্গতির লাঘব হবে না। বিপ্লব বলতে তাঁরা কি বোঝেন তা ব্যাখ্যা করে বললেন: 'শেষ পর্যন্ত এমন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে সর্বহারার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পাবে।' ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বিবৃতিতে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল।

গান্ধীজী হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর 'Young India' পত্রিকায় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। তিনি বিপ্লবীদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতিব যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে 'Young India পত্রিকায় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন।

'হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' গান্ধীজীর আহবানে সাড়া দিয়ে 'বোমার দর্শন' (The Philosophy of Bomb) নামে একটি ইশতেহার প্রকাশের জন্য প্রেরণ করে। ইশতেহারটি ১৯৩০-এর জানুয়ারি মাসে 'Young India'-তে প্রকাশিত হয়। এই ইশতেহারে বলা হয় বিপ্লবীরা বিশ্বাস করেন যে, ভারতের মুক্তি কেবলমাত্র বিপ্লবের দ্বারাই সম্ভব। বিপ্লব শুধুমাত্র বিদেশী সরকার ও তার সাকরেদদের সঙ্গে ভারতীয়দের সশস্ত্র সংগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে; বিপ্লবীরা পুঁজিবাদ ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটাবেন; দেশী ও বিদেশী শোষণ থেকে কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষকে মুক্ত করে বিপ্লব সমৃদ্ধি আনবে এবং তার ফলে

নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। 'বোমার দর্শন' ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে বলা হল, 'Above all, it will establish the dictatorship of the proletariat'.

জাতীয় বিপ্লবীদের মতাদর্শে সমাজতন্ত্রের প্রভাব দেখা গেলেও তাঁরা ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদের রাজনীতিতে তখনও বিশ্বাসী ছিলেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দলবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াসের নিঃসন্দেহে একটি উন্নততর বিকাশ। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অবসান ঘটতে দেখা যায়। নতুন মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত ও দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি পরিত্যাগ করে তাঁদের পছন্দমত ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে শুরু করেন। জাতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই পরবর্তীকালে শ্রেণীসচেতন বামপন্থী রাজনীতিতে যোগ দেন। আবার অনেকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে সমবেত হন। কেউ কেউ আবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বর্তমান শতকের বিশের দশকে, বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তৃতীয় পর্বে, জাতীয় বিপ্লবীদের মতাদর্শের দুর্বলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তখনও পর্যন্ত তাঁরা গণ-আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' প্রচারিত ইশতেহারে ভারতে শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও পদ্ধতি হিসাবে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় রাখতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের উপর নির্বিচার হিংসাত্মক দমনপীড়ন চালিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী হিংসার প্রত্যুত্তরে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার রাজনীতি ও মতাদর্শে জাতীয় বিপ্লবীরা বিশ্বাসী ছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতার দাবিতে শ্রমিক ও কৃষককে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে গণ-আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করে ব্যাপক জন সমর্থন ভিত্তিক সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাই প্রকৃত পথ এ ধারণা তখনও পর্যন্ত তাঁদের মতাদর্শে প্রতিফলিত হয় নি।

দশম অধ্যায়

১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংকট

১. ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন : পটভূমি ও প্রকৃতি

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারত শাসন সংস্কার সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে ভারত সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারতের সর্বস্তরের জনমত সদ্য প্রকাশিত শ্বেতপত্রের সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিল। ভারতীয় জনমতের সমালোচনা ব্রিটিশ সরকারের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় সভার দ্বারা গঠিত যুগ্ম-কমিটি শ্বেতপত্রের সুপারিশগুলিকে বিবেচনার জন্য কাজ শুরু করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যুগ্ম কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য ভারত সরকার এদেশ থেকে সাতাশজন প্রতিনিধিকে মনোনীত করে। অনেক আলাপ আলোচনা এবং বহু ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের পর যুগ্ম-কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয়। যুগ্ম-কমিটির সুপারিশে নতুন কিছু ছিল না। শ্বেতপত্রে প্রকাশিত সুপারিশগুলিকে ভিত্তি করে যুগ্ম-কমিটির সুপারিশগুলি রচিত হয়। ১৯৩৪-এর ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন সংক্রান্ত বিলটি উত্থাপিত হয়। পার্লামেন্টের উভয় সভায় রক্ষণশীল দলের সদস্যরা ভারত শাসন সংক্রান্ত বিলটির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৩৫-এর আগষ্ট মাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলটি গৃহীত হয়। শ্বেতপত্রের সুপারিশগুলি ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভারত শাসন বিলটি ভারতের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু মহাসভা এই বিলকে গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ বিকাশের পথে প্রতিক্রিয়াশীল ও বাধাদানকারী সাংবিধানিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করে। মুসলিম লীগ বিলটিকে সমালোচনা করে বলে : 'The Muslim classes and the Muslim masses will suffer from the new scheme as much as any other section of the Indian people'. ভারত শাসন বিলটি আইনে পরিণত হলে মুসলিম লীগ এই আইনকে totally unacceptable' বলে বর্ণনা করে। কারণ এই আইন ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতের লিবারেল ফেডারেশন নতুন আইনের সমালোচনা করে

বলে : 'The full rights of national self-government with the irreducible minimum of reservations' ঘোষিত না হওয়ায় নতুন আইন ভারতীয়ের রাজনৈতিক আকাংখা পূর্ণ করতে পারে নি। খালসা দরবারের প্রতিনিধি সর্দার মঙ্গল সিং ভারত শাসন আইনকে 'a constitution which has been forced upon an unwilling and helpless people' বলে বর্ণনা করেন।)

১৯৩২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত ছিল। বেআইনী অবস্থায় কংগ্রেস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত শাসন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন প্রয়াসকে নিন্দা করেছিল। কারণ রাজনৈতিক সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা ক'রে এবং দেশে উৎপীড়ন চালিয়ে শাসন সংস্কার করা যায় না। ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারত শাসন সংক্রান্ত বিলকে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে ভারত শাসন বিলকে সমালোচনা করে বলা হয় : '...it is to facilitate and perpetuate the domination and exploitation of the country by alien people under a costly mask...'। কংগ্রেসের প্রস্তাবে নতুন ভারত শাসন বিলকে ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন অপেক্ষা অনেক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বলে বর্ণনা করা হয়।

ভারতীয় জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ আন্দোলনকে দুর্বল করা এবং জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার জন্য অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নতুন ভারত শাসন আইন রচিত হয়েছিল। ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামকে দুর্বল করাই ছিল এই আইনের লক্ষ্য। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশক্তির প্রতিভূ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বৈরাচারী শাসকদের নতুন ভারত শাসন আইনে সাংবিধানিক মর্য্যাদা দেওয়া হল। কারণ নতুন সংবিধানে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল। এই সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থায় মুসলমান, শিখ, হরিজন, অনুন্নত সম্প্রদায় প্রভৃতি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে স্থায়ী করা হল।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন ১৯৩৭-এ কার্যকর করা হলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংবিধানের তৃতীয় দফার পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। ভারত শাসন

সংস্কার সংক্রান্ত সাংবিধান ব্যবস্থায় প্রথম দফার পরীক্ষা শুরু হয়েছিল মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার দিয়ে। দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা শুরু হয়েছিল মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে কেন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই সংবিধানকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন। যদিও নতুন আইনের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে জাতীয় আন্দোলন তীব্র করতে ব্যবহার করা সম্ভবপর ছিল এবং নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, কিন্তু চরম প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে তাঁরা কখনও গ্রহণ করতে পারেন নি। সেজন্য তাঁরা সামগ্রিকভাবে নতুন সংবিধানের বিরোধীতা করেছিলেন।

ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ

১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইনের দু'টি প্রধান অংশ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রদেশগুলিকে নিয়ে প্রাদেশিক অংশ গঠিত হয়েছিল। ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরণের যুক্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপায়িত করেছিল।

ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান শর্ত হল সারা দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন সুকৌশলে ভারতে অনৈক্য এবং নানা ধরণের বিভেদের বীজ বপন করেছিল। ভারতে অখণ্ড প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপনের পরিবর্তে সারা দেশকে নিতান্ত কৃত্রিমভাবে ব্রিটিশ ভারত এবং তথাকথিত রাজন্য-শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র স্বীকার করে, দেশীয় রাজ্যের ভারত সৃষ্টি করে, প্রশাসনিক তারতম্যের অবতারণা করেছিল। ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত সৃষ্টি করবার পিছনে কোন ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক যুক্তি ছিল না। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির জন্য ভারতে দুই ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতের মধ্যে যে প্রশাসনিক তারতম্য ও অনৈক্য ছিল তার অবসানের পরিবর্তে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি তাকে আরও প্রতিক্রিয়াশীলভাবে স্থায়ী করায় প্রয়াসী হয়েছিল।

উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের আইনটি স্বৈরাচারী ভারতীয় রাজন্যবর্গকে আরও সাংবিধানিক ক্ষমতা দিয়ে ভারত প্রশাসনের মূল কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধি করা। জাতীয় ঐক্য ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা স্থাপনের পরিবর্তে দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ব্রিটিশ শাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে এক অদ্ভুত ধরণের বিকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইস প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের কোন সাদৃশ্য ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে সেখানকার জাতি প্রশ্ন ও জাতি সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ছকে রচিত হয় নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শক্তিগুলিকে আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটির অবতারণা করা হয়েছিল।

বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানগুলির সঙ্গে তুলনা করলে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিকে কখনই এবং কোন অর্থেই যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। কারণ সংবিধানের সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কোন শাসন ব্যবস্থা প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হতে পারে না। নতুন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিতে ব্রিটিশের দাক্ষিণ্যে টিঁকে থাকা রাজন্যবর্গের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশে আইনসভার সারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন ক্ষমতা ছিল না। কারণ কেন্দ্রীয় আইনসভা শুধুমাত্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রশাসনিক ও অন্যান্য আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিল।

ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশে ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে দায়িত্বশীল ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ব্রিটিশ ভারতের জনগণের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অনুগ্রহ পুষ্ট স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতাকামী ও সংগ্রামমুখী জনসাধারণের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করে বিশ্বের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চরম প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সেজন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটির

তীব্র বিরোধীতা করে।

নতুন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় দুটি কক্ষ সৃষ্টি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। উভয় সভাতেই রাজন্যবর্গকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ কক্ষ কাউন্সিল অফ স্টেটস্-এ মোট ২৬০টি আসনের মধ্যে ১০৪টি আসন রাজন্যবর্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। নিম্ন কক্ষ ফেডারেল এ্যাসেম্বলীতে মোট ৩৭৫টি আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন রাজন্যবর্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সারা ভারতের মোট এক-চতুর্থাংশ জুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান ছিল। কিন্তু আইনে রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ ভারতে তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ সংগৃহীত হত ব্রিটিশ ভারত থেকে এবং শতকরা ১০ ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে। নতুন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশে রাজন্যবর্গকে শতকরা ৯০ ভাগ আয়ের উপর অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হল।

১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের অধীনে আইনসভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সঙ্গে মনোনীত সরকারি সদস্যরা আইন প্রণয়ন করতেন। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার মনোনীত সরকারি সদস্যের পরিবর্তে আরও প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গকে সদস্য করা হয়। আইন সভায় রাজন্যবর্গের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের মন্ত্রীসভাকে গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত করার ক্ষমতা লাভ করলেন। মন্ত্রীসভার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। মন্ত্রীসভার সদস্যদের আইনসভার পরিবর্তে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে দায়িত্বশীল থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নতুন আইনে মন্ত্রীসভাকে দায়িত্বশীল সরকার বলা যায় না। মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আইনসভায় পরাজিত হলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হত না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আইনসভা অসহায়ভাবে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেলের উপর নির্ভরশীল। মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৭৫ ভাগের উপর আইনসভার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অবশিষ্ট শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয় বরাদ্দের উপর আইনসভা তার মতামত ব্যক্ত করতে পারত। গভর্ণর-জেনারেলের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করা যেত না। অতএব প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমস্ত নীতিগুলিকে খন্ডন করেই নতুন ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ভারতের সামরিক বিভাগ এবং আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আইনসভার ছিল না। প্রতিরক্ষা বিভাগ সংরক্ষিত বিভাগ হিসাবে ঘোষিত হওয়ায় আইনসভার আওতার বাইরে ছিল। সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশ বাহিনী ভারত সচিবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। গভর্ণর-জেনারেল পুলিশের জন্য নিয়মাবলী রচনা করতেন। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নামমাত্র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শক্তির কোন অংশের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার ছিল না। এমন কি সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আইন প্রণয়ন করা হলে, সে আইনটি গভর্ণর-জেনারেলের মনঃপুত না হলে, সেটি সম্মতি না পেয়ে বাতিল হয়ে যেত। ব্রিটিশের পছন্দমত আইন প্রণীত না হলে গভর্ণর-জেনারেল নিজেই আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিলেন।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশে আইনসভা ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতা ছিল নামমাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেলকে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি-রূপে গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ বিবেচনার ক্ষমতা (special discretionary powers) এবং বিশেষ দায়িত্বগুলি (special responsibilities) অনুধাবন করলে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরা পড়বে। ভারতে ব্রিটিশের মূলধন বিনিয়োগ, কলকারখানা, এবং বহুবিধ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য গভর্ণর-জেনারেলকে ভারত শাসনে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক অংশ

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক অংশকে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকারের তাঁবেদারে পরিণত করা হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছিল। অর্থাৎ, সামান্য রদবদল করে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার কাঠামোটিকে প্রাদেশিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রাদেশিক গভর্ণরের আইন প্রণয়ন, অর্থবিষয়ক ক্ষমতা, পুলিশ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ, আইন ও শৃংখলা রক্ষা এবং সাতটি বিশেষ দায়িত্বের ক্ষমতা (special responsibilities) তাঁকে প্রাদেশিক পর্যায়ে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে আইনসভায় উচ্চ কক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনে দ্বিতীয় কক্ষ ছিল না।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার তুলনায় প্রাদেশিক পর্যায়ের শাসনব্যবস্থায় কিছু নমনীয়তা এবং কিছু জনপ্রিয় উপাদান ছিল। প্রাদেশিক স্তরে রাজন্যবর্গের কোন স্থান ছিল না। নিম্ন কক্ষের আইনসভাগুলি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হলেও, উচ্চ কক্ষের আইন-সভাগুলি সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হত। প্রাদেশিক স্তরে কোন সংরক্ষিত বিভাগ ছিল না। অবশ্য গভর্ণরের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বাহিনী থাকত, এবং তিনি পুলিশবাহিনী পরিচালনার নিয়মাবলী রচনা করতেন। গুরুতর সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে সরকারি প্রশাসন চালাতে পারতেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির সামান্য কিছু স্বাধীনতা ছিল। অবশ্য সর্বভারতীয় গুরুত্বমণ্ডিত এবং ব্রিটিশের বিশেষ স্বার্থ ও অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির সঙ্গে জড়িত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার ছিল না।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ব্রিটিশ ভারতের মোট ১১ শতাংশ জনসংখ্যার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে সীমিত ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হয়েছিল। সম্পত্তি, করদান, নির্দিষ্ট অর্থ মূল্যের ভাড়াটিয়া এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ১১ শতাংশ জনসংখ্যাকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

গভর্ণর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের অপরিসীম ক্ষমতার চৌহদ্দির মধ্যে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কাজ করতে হত। অর্থবিষয়ক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রায় কোন ক্ষমতাই ছিল না। আয়কর, আমদানি-রপ্তানি ও বাণিজ্য কর এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় করের মোট আয়ের শতকরা ৮০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার সংগ্রহ করত। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল। ভূমি রাজস্বই ছিল প্রাদেশিক সরকারের আয়ের মূল উৎস। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার চূড়ান্ত বোঝা বইতে হত কৃষকদের। সেজন্য দেখা গেল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বায়ত্ত-শাসন এবং সমাজ সেবার মত বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে এই সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য আসে নি।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্তরে স্বায়ত্তশাসন দানের কথা ঘোষিত হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা এবং স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা একদিকে যেমন কার্যকর করা হয়েছে, ঠিক অপরদিকে গভর্ণর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের অপরিসীম ক্ষমতা সেগুলিকে অপহরণ করেছে। মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়ে বোঝা গেল মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা এবং প্রাদেশিক

স্বায়ত্ত-শাসন কতটা পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য।

২. নতুন ভারত শাসন আইনে নির্বাচন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত নতুন ভারত শাসন আইনে নির্বাচন কাজে তদারকি করার জন্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করেছিল। নতুন ভারত শাসন আইনে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস সাংগঠনিক-ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। ১৯৩৬-এর এপ্রিলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৭-এর জুলাই-এ ছ'টি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হলে নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তদারকি করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে নিয়ে পার্লামেন্টারী সাব-কমিটি গঠন করে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডকে সংসদীয় বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩৪-এ কংগ্রেস নতুন সংবিধান সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণায় ভারতের জন্য সংবিধান-প্রণয়ন সভা (Constituent Assembly) গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নতুন ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয়। ১৯৩৬-এর আগস্টে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নির্বাচনী ইশতেহারকে অনুমোদন করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহারটি রাজনৈতিক-ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই ইশতেহারে বলা হয়ঃ 'ভারতীয় জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইন এবং সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার সংকল্প কংগ্রেস পুনর্বার ঘোষণা করছে। কংগ্রেসের মতে এই সংবিধানের সংগে কোন রকমের সহযোগিতার অর্থ হ'ল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্ত করা এবং যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতীয় জনগণকে শোষণ ক'রে চরম দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করেছে তাকে সমর্থন করা।'

'এই সংবিধানের কাছে কোন রকম নতি স্বীকার না ক'রে বা এর সংগে কোন সহযোগিতা না ক'রে; আইনসভাগুলির ভেতরে ও বাইরে এই সংবিধানের পরিসমাপ্তি ঘটানোর (both inside and outside ligislatures, so as to

end it) সংকল্প কংগ্রেস পুনর্বার ঘোষণা করছে।…'

'ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিদেশী কোন শক্তি বা কর্তৃত্বের ইচ্ছা অনুসারে তৈরী হবে তেমন কোন অধিকারকে কংগ্রেস কখনো স্বীকার করেনি বা করবে না।…স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জাতি যে সংবিধান প্রণয়ন করবে ভারতীয় জনগণ তাকে স্বীকার ক'রে নেবে'।

'কংগ্রেস ভারতে যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায়, যেখানে সমগ্র রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগনের কাছে হস্তান্তরিত হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান-প্রণয়ন সভাই কেবল ভারতের সংবিধান রচনা ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ।…'

'নতুন সংবিধানে আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদের মন্ত্রীসভা গঠন করা বা না করার প্রশ্নটি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।'

ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জহরলাল নেহরু বলেনঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রযন্ত্রের (apparatus of British imperialism) সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমরা আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি না। বরং নতুন আইনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নিয়মতান্ত্রিক রাস্তায় চলা বা শুকনো সংস্কারবাদের দিকে পা বাড়ানোর জন্য আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি না (We are not going to the Legistures to persue the path of constitutionalism or barren reformism).

ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসাবে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় ঐক্য, জাতীয় পূর্ণ স্বাধীনতার রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং দীর্ঘ কয়েক বছরের গণ-সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্য কংগ্রেসকে বিপুল নির্বাচনী সাফল্য লাভে সহায়তা করেছিল। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে শুধুমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথাই বলা হয় নি। নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি সমেত সুনির্দ্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল। এই কর্মসূচী ভারতের বিশাল জনগণকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

নির্বাচনী ইশতেহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল যে,

১৯৩১-এর কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি হল কংগ্রেসের সাধারণ লক্ষ্য। ভারতের 'appalling poverty, unemployment and indebtedness of the peasantry' অবসানের জন্য ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কার; ঋণের বোঝা লাঘব করার জন্য কৃষকের ঋণ মকুব; কৃষকের জন্য ভূমি খাজনা কমানো: অলাভজনক জমিগুলির জন্য খাজনা তুলে দেওয়া; শিল্পশ্রমিকদের জন্য 'decent standard of living'-এর প্রতিশ্রুতি; শ্রম-মালিক বিরোধে মধ্যস্থতার মারফত সম্মানজনক মীমাংসা; বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং বেকারিত্বে সামাজিক নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি; শিল্প শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ও ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকার; এছাড়া, মহিলা, হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কল্যাণ সাধন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীভিত্তিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসকে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে বিপুল জয়ের পথ সুগম করেছিল। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল জাতীয় কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের জয়ে স্তম্ভিত হয়েছিল। ব্রিটিশের সর্বপ্রকার প্ররোচনা ও উস্কানী দান সত্ত্বেও কংগ্রেসের জয় সরকারি মহলে নিরুৎসাহের সৃষ্টি করেছিল।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় কংগ্রেস মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ (central provinces) বিহার এবং উড়িষ্যার আইনসভাগুলিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বোম্বাই, বাংলা, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মত চারটি প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেস এককভাবে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় অবশ্য কংগ্রেসের সাফল্য তেমন হয় নি। মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১৫টি আসন লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ১১টি প্রদেশের আইনসভাগুলির মোট উন্মুক্ত আসন সংখ্যা (open seats) ছিল ৬৫৭। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৪৮২। কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য ৫৮টি সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৬টি আসন লাভ করে। শ্রমিকদের জন্য মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৮, কংগ্রেস ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮টি আসন লাভ করে। ভূস্বামীদের জন্য মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৭, ৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪টি আসন লাভ করে। শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য মোট আসন সংখ্যা ছিল ৫৬.

কংগ্রেস ৮টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩টি আসন লাভ করে।

কংগ্রেসের বিপুল জয়ে সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা 'দি টাইমস' মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল যে ঃ গ্রামাঞ্চলে ভূমিসংস্কার এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্গতি লাঘবের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের সাফল্যের অন্যতম কারণ। কৃষিপ্রধান ভারতে ভূমিসংস্কার ও কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতিতেই নিহিত আছে এই বিশাল দেশের কোন রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষের কাছে কতটা জনপ্রিয়তা লাভ করবে। ভারতের সুবিশাল জনসংখ্যার মাত্র এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষ ভোট দিয়ে কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে সমর্থন জানাল।

৩. কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদান সম্পর্কে বিতর্ক

(কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী অংশটি নতুন ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভায় যোগদানের ঘোরতর বিরোধী ছিল। লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহেরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কংগ্রেসের মন্ত্রী-সভায় যোগদানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'নতুন আইনের শর্ত অনুযায়ী মন্ত্রীদপ্তর গ্রহণ করার অর্থ হল, মন্ত্রীদপ্তর প্রত্যাখ্যান ক'রে কংগ্রেস যে প্রস্তাব নিয়েছে তাকে খণ্ডন করা। জাতীয় সম্মান ও আত্মমর্যাদার স্বার্থে মন্ত্রীদপ্তর গ্রহণ করা যায় না। মন্ত্রীসভা গঠনের অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নমূলক যন্ত্রের (repressive apparatus of imperialism) সঙ্গে সহযোগিতা করা। সেক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণকে শোষণ ও উৎপীড়ন যারা করছে কংগ্রেসকে তাদের অংশীদার হয়ে যেতে হয়। মন্ত্রীসভায় যোগদান, অথবা সে ব্যাপারে দোদুল্যচিত্ততা প্রকাশ করাটা কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক ত্রুটিজনক হবে। মন্ত্রীদপ্তরের গভীর খাদে একবার পড়ে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসাটা খুবই কষ্টকর হবে।')

ফৈজপুর কংগ্রেসে অনেকেই মন্ত্রীসভায় যোগদান প্রশ্নটিকে আপাতত স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। মন্ত্রীসভায় যোগ না দিয়ে গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি চালিয়ে গণ-পরিষদ গঠনের দাবিকে জোরদার করার সংশোধনী প্রস্তাবটি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভায় পক্ষে ৪৫ এবং বিপক্ষে ৮৩ ভোটে পরাজিত হয়। অনুরূপ প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পক্ষে ৬২ এবং বিপক্ষে ৪৫১ ভোটে, পরাজিত হয়। মন্ত্রীসভা বর্জনের সংশোধনী প্রস্তাবটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে

পক্ষে ৪৮ এবং বিপক্ষে ৮৭ ভোটে পরাজিত হয়।

(১৯৩৭-এর মার্চে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ফরমুলা রচনা করে। সেটি হল যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে সেখানে কয়েকটি শর্তে মন্ত্রীসভা গঠন করা হবে। আইনসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা সরকারের মনোভাব সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠন করবেন না। সরকারকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, গভর্ণর তাঁর হস্তক্ষেপের বিশেষ ক্ষমতা (special power of interference) প্রয়োগ করবেন না, কিংবা সাংবিধানিক কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না। এ সম্পর্কে সরকারকে সুস্পষ্ট ইতিবাচক ঘোষণা করতে হবে।)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রী দপ্তর গ্রহণ সম্পর্কে শর্ত আরোপের ফরমুলাটির পক্ষে ১২৭ বিপক্ষে ৭০ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী ভাবাপন্ন প্রতিনিধিরা মন্ত্রীসভায় যোগদানের প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধীতা করেন। তাঁদের আশংকা ছিল মন্ত্রীসভায় যোগ দিলে কংগ্রেস সংগঠন গণ-আন্দোলন পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হবে এবং ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। মন্ত্রীসভায় যোগদানের বিরুদ্ধে তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাবটির পক্ষে ৭৮ এবং বিপক্ষে ১৩৫ ভোট প্রদত্ত হওয়ায় সেটি পরাজিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। প্রথম দিকে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের অধীনে কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার বিরোধী ছিল। পরে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সমর্থন করলেও কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদানের তীব্র বিরোধীতা করে। সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং, উত্তর প্রদেশের রফি আহমেদ কিদোয়াই এবং শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও এই দলের মন্ত্রী-সভায় যোগদান বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। জওহরলাল নেহেরু নৈতিক সমর্থন জানান।

গান্ধীজীর অনুগামী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদানের প্রস্তাবকে সমর্থন জানালে সেটি কংগ্রেস সংগঠনের সর্বস্তরে গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ছিলেন এই প্রস্তাবের সমর্থক ও জোরালো প্রবক্তা। অপরদিকে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী ভাবাপন্ন বামপন্থী সদস্য ও নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীসভায় যোগদানের

ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা অল্প হওয়ায় মন্ত্রীসভায় যোগদান প্রস্তাবটি কংগ্রেসের সর্বস্তরে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

৪ কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন : সাফল্য ও ব্যর্থতা

গভর্ণর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে মন্ত্রীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কোন-রকম বাধার সৃষ্টি করবেন না এ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারেরর কাছ থেকে কংগ্রেস সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবি করার পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তিন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবির প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত করলেন না। ঠিক তিন-মাস পরেই ১৯৩৭-এর ১-লা এপ্রিল ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী নতুন সংবিধান বলবৎ করল। সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের বিরুদ্ধে ১লা এপ্রিল সারা ভারতে পরিপূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আলাপ-আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার গভর্ণরের সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে কোন বিবৃতি না দেওয়ায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ২২শে জুন বড়লাট ঘোষণা করলেন, যে কোনও দলই সরকার গঠন করুক না কেন গভর্ণরেরা মন্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করবেন না, এবং তাঁরা সংঘাত ও বিরোধ নিরসনে সচেষ্ট থাকবেন।

বড়লাটের সুস্পষ্ট ঘোষণায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগদানে সম্মত হয়। ১৯৩৭-এর জুলাই-এ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৮ জন অ-কংগ্রেসী সদস্য লিখিতভাবে কংগ্রেসের নিয়মবিধি গ্রহণ করায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থ হয়। ব্রিটিশ ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পরে আসাম এবং সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেস অন্য দলের সহযোগিতায় কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। ১৯৩৭-এর জুলাই থেকে ১৯৩৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত দু'বছর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র বিরোধ শুরু হয় এবং ১৯৩৯-এর নভেম্বরে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করে।

দু'বছর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন কংগ্রেস সারা ভারতে রাজনৈতিক প্রত্যাশা বিপুলভাবে জাগিয়েছিল। এই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় কংগ্রেস

মন্ত্রীসভাকে গভীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আন্দামান এবং ভারতের বিভিন্ন কারাগারে বহু সহস্র রাজবন্দী এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক আইন ভারতীয় জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। দমনমূলক আইনের অবসান ঘটানোর ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের ছিল না। সারা ভারতের কৃষকেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে তীব্র আন্দোলন করেছিল। ফলে ভারতের সুবিশাল গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামমুখী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল।

(সীমিত হলেও দু'বছরে কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভাগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। নব গঠিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি অধিকাংশ রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া যায় নি। বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। প্রদেশগুলিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাদেশিক ও ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য রাজনৈতিক সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সময় বোম্বাই থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়।)

মাদ্রাজে রাজাগোপাল আচারী পরিচালিত সরকার সমাজতন্ত্রী নেতা এস এস. বাট্‌লিওয়ালাকে আদালতে অভিযুক্ত করে এবং তার ফলে তাঁর ছ'মাস কারাদণ্ড হয়। কয়েকটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা রাজদ্রোহ প্রচার নিষেধকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ অনুচ্ছেদ এবং সভাসমিতি নিষেধকারী ১৪৪ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করেছিল।

কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি কৃষকদের জন্য আইন প্রণয়ন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মাদ্রাজের মন্ত্রীসভা কৃষকের পুরাণো জমে থাকা ঋণ মুকুব করে, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাই-এর মন্ত্রীসভাগুলি কৃষিঋণের সুদের পরিমাণ কমিয়ে আইন প্রণয়ন করে। কৃষকের জমির স্বত্ব রক্ষা করে, যথেচ্ছ খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করে, এবং খাজনা আদায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। সর্বস্তরের কৃষকের প্রত্যাশা অনুযায়ী আইন প্রণীত না হওয়ায় কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে অসন্তোষ বেড়ে গিয়েছিল। কৃষকের স্বত্ব রক্ষা করে যে আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল সেগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, দরিদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের চেয়ে বড় বড়

কৃষকের স্বার্থ অধিকতর সংরক্ষিত হয়েছিল।

কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যাশা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সারা ভারতের শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি শিল্পবিরোধ আইনের আওতায় মধ্যস্থতা করতে গিয়ে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং চাকুরির শর্তকে উন্নত করেছিল। ১৯৩৮-এর বোম্বাই শিল্প বিরোধ বিল শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। কারণ এই বিলে মধ্যস্থতা চলাকালীন চার মাস ধর্মঘট করাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। এই বিলের প্রতিবাদে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট পালন করে। বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি শ্রমিকদের জন্য বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। মিল মালিকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই সুপারিশ কার্যকর করা হয়। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস সরকার কানপুরের শ্রমিক ধর্মঘটে মধ্যস্থতা করে শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় এবং বেতন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। তাতে শ্রমিকের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। বিশ্বব্যাপী অর্থ-নৈতিক মন্দার প্রভাবে ভারতের অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার ফলে শ্রমিকের জীবন যাত্রার উপর আঘাত আসে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় মজুরি বৃদ্ধি সামান্যই হয়েছিল। বোমবাই-এ শিল্প বিরোধ বিলের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘট করলে প্রাদেশিক সরকার শোলাপুরে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং শ্রমিকের ধর্মঘটের স্বাধীনতা হরণ করায় প্রয়াসী হয়।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি সাফল্য অর্জন করেছিল। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়ের নৈতিক মান খর্ব করার জন্য এবং প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সারা ভারতের শিল্পাঞ্চল-গুলিতে ব্যাপক ভাবে মাদকদ্রব্য বিক্রির দোকান চালু করার লাইসেন্স দেয়। কংগ্রেসের মাদকদ্রব্য বিরোধী অভিযান এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রণীত মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকারী আইনগুলি ব্রিটিশ শাসনের মাদকদ্রব্য থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়েছিল। শিক্ষাসংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণ এবং নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃমঙ্গলের ব্যবস্থা করে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছিল। দেখা গেল, অত্যন্ত সীমিত অর্থ সংস্থানের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বায়ত্ত-শাসনের কোন কাজই করা

যায় না। সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হয়েছিল।

কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্যরা নিজেদের জন্য ব্যয়-সংকোচনের একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারতের মত গরীব দেশে তাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন। অতএব জনসমক্ষে মন্ত্রীদের ভাবমূর্তি বাড়ানের জন্য তাঁরা প্রত্যেকে মাসে পাঁচশো টাকা বেতন নিয়েছিলেন। অবশ্য শুধুমাত্র মন্ত্রীদের বেতন কমিয়ে প্রদেশগুলির বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ ১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইন মোট সংগৃহীত রাজস্বের সামান্য অংশই প্রদেশগুলির হাতে দিয়েছিল। রাজস্বের সিংহভাগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে।

(১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত দু'বছর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা চালিয়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি। কংগ্রেসের নরমপন্থী-রক্ষণশীল অংশটি মন্ত্রীসভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। দেখা গেল, মন্ত্রীরা উচ্চশ্রেণীভুক্ত জমিদার-ভূস্বামী এবং শিল্পপতিদের স্বার্থকে অধিকতর প্রাধান্য দিলেন। এই দু'বছরে গণ-আন্দোলনের সংগ্রামমুখী চেহারায় মন্ত্রীরা ভীত বোধ করলেন, এবং ক্রমশ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের আইনের বেড়াজালের মধ্যে চলতে পারে না। শৃংখল বন্ধনকারী ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক মন্ত্রীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য রচিত হয় নি। দু'বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করেই অগ্রসর হতে পারে।)

(সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে গেল প্রাদেশিক গভর্ণর এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী অফিসারদের হাতে। সিভিল সার্ভিসের অধিকাংশ অফিসার ছিলেন ব্রিটিশ। কংগ্রেসের পক্ষে সেজন্য সুদূরপ্রসারী প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয় নি। কংগ্রেসের মন্ত্রী সভায় যোগদানের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন: 'বিশাল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ক্রমশ সংসদীয় বা নিয়মতান্ত্রিক মানসিকতায় সংক্রামিত হচ্ছেন (infected with the parliamentary or

constitutional mentality) এবং তাঁরা বৈপ্লবিক উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছেন (losing its revolutionary fervour)'.

। জওহরলাল নেহের্ু কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দ্ু'বছর কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা চালিয়ে মান্ুষের প্রত্যাশা প্ূর্ণ করতে পারে নি। জওহরলাল কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে গান্ধীজীকে লিখেছিলেন: 'কংগ্রেস মন্ত্রীসভা অযোগ্যভাবে কাজ করছে এবং তাঁদের যা করা উচিত তাও করছেন না (The Congress Ministers are working inefficiently and not doing much they could do) তাঁরা প্ুরানো ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছেন এবং ঐ ব্যবস্থাকে সমর্থন করছেন।' জয়প্রকাশ নারায়ণ জওহরলাল নেহের্ুকে লেখা এক পত্রে বলেছিলেন: 'ঘটনাবলী এমন ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে যার ফলে বহ্ু কোটি নিপীড়িত মান্ুষের গণতান্ত্রিক সংগঠন কংগ্রেস ক্রমশ ভারতীয় কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে (converting the Congress from a democratic organisation of the millions of the down-trodden people into a handmaid of Indian vested interests '.)

কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগ্ুলির কাজকর্মে জওহরলাল নেহের্ু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন: 'কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগ্ুলি প্রতি-বিপ্লবী হ'য়ে পড়ছে (become counter-revolutionary) এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করছে (a pro-imperialist policy)'

৫. ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী

১৯৩৮-এর ফেব্র্ুয়ারীতে হরিপ্ুরায় অন্ুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের য্ুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের প্রতি কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্ৃষ্টিভঙ্গীর স্ুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়। নতুন শাসন ব্যবস্থার অধীনে প্রাদেশিক আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্ুদ্ৃঢ় করা। প্রস্তাবিত য্ুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের প্রতি কংগ্রেসের সহযোগিতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ নতুন শাসনব্যবস্থায় য্ুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি গণতান্ত্রিক ভারতের ধারণাকে গভীরভাবে আঘাত করে সমগ্র দেশকে সাম্রাজ্যবাদী গাঁটছড়ায় বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সেজন্য হরিপ্ুরা কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ

করে নতুন সংবিধান এবং তার যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল : 'প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার কংগ্রেস তীব্র নিন্দা করছে এবং প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটি এবং ভারতীয় জনগণ সমেত প্রাদেশিক সরকারগুলি এবং মন্ত্রীদের এই পরিকল্পনা কার্যকর করায় বাধা সৃষ্টি করতে অনুরোধ করছে।'

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন : 'নতুন ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি ভারতীয় ঐক্য গঠনের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাগুলিকে উৎসাহ দেবে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে নিয়ে যাবে।' সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত ক'রে ভারতবাসীকে আপোষহীন বিরোধীতা করার জন্য আহবান জানান ('uncompromising hostility towards the proposed Federation').

ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্যতম শর্ত হল ব্রিটিশ ভারতের বাইরে অবস্থিত দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করা। সুচতুর ব্রিটিশ শাসক প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে অগ্রণী হয়েছিল। অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিনিধি করা হল স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গকে। কংগ্রেস নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, দেশীয় রাজ্যের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে ভারতে কখনই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যাবে না। কারণ দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকবেন সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। হরিপুরা কংগ্রেসে দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী হিসাবে 'প্রজামঙ্গল' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আহবান জানানো হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান প্রসঙ্গে হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় : দেশীয় রাজ্যগুলিতে কার্যরত 'কংগ্রেস কমিটিগুলি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। ঐ কমিটিগুলি কোনরকম সংসদীয় কাজে নিযুক্ত থাকবে না।' দেশীয় রাজ্যগুলিতে আইনসভার মত আধা-দায়িত্বশীল সরকারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়ায় সেখানকার রাজনৈতিক সংগঠনগুলি

আন্দোলনের উপর সমধিক গুরুত্ব দেবে। কংগ্রেসের নামে দেশীয় রাজ্যগুলির আন্দোলন পরিচালিত হবে না।

দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দ্রুত ব্যাপক আকার ধারণ করে। ত্রিবাঙ্কুর, রাজকোট এবং উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজী রাজকোটে অনশন করে সেখানকার জনগণের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

নতুন ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করায় কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। জনগণের দ্বারা গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্যরা ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবেন এই দাবি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল। ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারে গভীর রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার, নতুন সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে রক্ষণশীল ও বামপন্থী নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে বিরোধীতা করে এবং গণপরিষদ গঠনের দাবি করে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা এই দু'টি প্রশ্নে ব্রিটিশের সঙ্গে আলোপ-আলোচনার পরিবর্তে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

নতুন ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেছিল। নির্বাচনে ৭টি প্রাদেশিক আইনসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল যে, মন্ত্রীসভায় যোগদান করলেও নতুন ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি ভারত শাসন আইনের সবচাইতে বিপজ্জনক, অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ।

১৯৩৯-এর ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নতুন সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে স্বাধীন ভারতের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণ-পরিষদের দ্বারা ভারতীয় সংবিধান রচনার দাবি জানানো হয়েছিল। কারণ, 'গণপরিষদের দ্বারা রচিত সংবিধান ছাড়া অন্য কোন সংবিধান ভারতীয় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।' ১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিকে কংগ্রেস প্রবলভাবে

বিরোধীতা করে এসেছে।

৬ গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র : মতবিরোধ ও সংঘাত

কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহেরু বামপন্থী শক্তির নেতৃত্ব করতেন। তিরিশের দশকের শেষের দিকে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতপার্থক্য প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি মনোনীত করেন। হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরোধের ফলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের করালছায়া ঘনিয়ে আসছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে ব্রিটেন ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিল। ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসের সামনে যে রাজনৈতিক প্রশ্নটি সবার মনে জেগেছিল সেটি হল আসন্ন বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হরিপুরা কংগ্রেসে সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হল : 'ভারত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষ নিতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে দেশের জনশক্তি ও সম্পদের ব্যবহারকে ভারত কখনও অনুমোদন করতে পারে না। জনগণের সুস্পষ্ট সম্মতি ছাড়া ভারত কোন যুদ্ধে অংশ নিতে পারে না।' ভারতে যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চালানো হচ্ছে কংগ্রেস কখনও তা অনুমোদন কবে না। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবে আরও বলা হল : 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়ানোর চেষ্টা করা হলে ভারত তা প্রতিরোধ করবে।'

হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর মতপার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : 'কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি কংগ্রেস দল যাতে ব্রিটিশের সঙ্গে কোনরকম আপোষ না করে সেজন্য বিরোধীতাকে তীব্র করায় তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াস গান্ধীজীর সমর্থক মহলে (Gandhian circles) বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। কারণ তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন।' কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল যে, গান্ধীজীর অনুগামীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে আগ্রহী নন।

১৯৩৮-থেকে কংগ্রেসের কিছু নেতা ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। সেই থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস বোধ হয় ব্রিটিশের সঙ্গে আপোশ করায় অগ্রণী হয়েছে।

অবশ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে বা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোন বিবৃতি দেওয়া হয় নি যাতে এই গুজব সমর্থিত হয়। রাজনৈতিক দল হিসাবে বিবৃতি না দিলেও কিছু কিছু কংগ্রেসী নেতাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও বিবৃতি থেকে এই রকম একটা ধারনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, হয়ত কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের কিছু সংশোধন করে ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারে। এ সম্পর্কে তারাচাদ *'History of Freedom Movement in India'* (চতুর্থ খণ্ড) পুস্তকে লিখেছেন: 'এ-কথা সত্য যে এই সময় যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নকে তাড়াতাড়ি চালু করা সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার প্রয়াস চলেছিল।' এই মন্তব্যের স্বপক্ষে তারাচাদ ১৯৩৮-এর ১৬ই এপ্রিলে লিনলিথগোর সঙ্গে গান্ধীজীর কথাবার্তা উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ২৭২-২৭৩)।

কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর মতপার্থক্য সুস্পষ্ট আকার ধারণ করল পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ১৯৩৯-এর মার্চে ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশন ডাকা হল। ১৯২০ সাল থেকে জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর সম্মতি অনুসারেই নেওয়া হত। বিশেষ করে প্রতি বছর কংগ্রেসের সভাপতি কে হবেন তা ঠিক করতেন গান্ধীজী। ১৯২০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় নি। কারণ গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকেই সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করলে সবাই তা মেনে নেন।

১৯৩৮-এ সেপ্টেম্বরে জানা গেল সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজী তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতির পদে বৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মৌলানা আজাদ তাঁর প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নিলে গান্ধীজী চূড়ান্তভাবে পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৯৩৯-এর কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিরূপে মনোনয়ন করেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্পে অটল থাকেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে, কংগ্রেস সভাপতির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির মত প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া উচিত; সেজন্য মতাদর্শ ও নীতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা অভিমত দিলেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে

কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচন হওয়া উচিত। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্পকে আদৌ সমর্থন করেন নি। তাঁদের মতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আঠারো বছর ধরে গড়ে ওঠা কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়নের প্রথাকে সুভাষচন্দ্র ভাঙতে পারেন না

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংবাদ প্রচারিত হলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, যমুনালাল বাজাজ, জয়রামদাস দৌলতরাম, শংকররাও দেও, ভুলাভাই দেশাই এবং জে. বি কৃপালনী যৌথভাবে বিবৃতি দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানান যাতে পট্টভি সীতারামাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হতে পারেন। যৌথ বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, আগামী বছরে কংগ্রেসের প্রভাবশীল অংশের নেতারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি সম্পর্কে বোঝাপড়ায় আসতে পারেন এমন ধারণা অনেকের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য, কংগ্রেসেব প্রভাবশীল নেতারা একজন বামপন্থী সভাপতিকে আর চাইছেন না। কারণ তিনি বোঝাপড়া ও দরদস্তুর চালানোর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবেন। এই রকম অবস্থায় এমন একজনের কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত যিনি হবেন 'an anti-federationist to the core of his heart'. এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, আচার্য নরেন্দ্র দেবের মত খাঁটি যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশবিরোধী নেতাকে কংগ্রেস সভাপতিরূপে মনোনয়ন করা হলে তিনি তাঁর প্রার্থীপদ স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেবেন।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পট্টভি সীতারামাইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি পদের জন্য নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন ১৫৮০ ভোট এবং পট্টভি সীতারামাইয়া পেয়েছেন ১৩৭৭ ভোট। অর্থাৎ, ২০৩ ভোটের ব্যবধানে সুভাষচন্দ্র পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে গান্ধীজী ১৯৩৯-এর ৩১শে জানুয়ারীতে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন: (১) যে নীতির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন সে নীতিকে স্পষ্টভাবে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা অনুমোদন করেন নি; (২) শুরু থেকেই তিনি সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন; (৩) তিনি সুভাষচন্দ্র প্রচারিত ইশতেহারের তথ্য ও যুক্তিগুলির সঙ্গে কখনও একমত হন নি;

(৪) তিনি পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রার্থীপদ থেকে নাম প্রত্যাহারে অনুমতি দেন নি। সেজন্য সীতারামাইয়ার পরাজয় হল প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরাজয় ('The defeat is more mine than his')।

১৯৩৯-এর কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু ও পট্টভি সীতারামাইয়ার মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রদেশভিত্তিক বিস্তারিত ফলাফল দেওয়া হল :

সুভাষচন্দ্র ও সীতারামাইয়ার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল

প্রদেশ শহর	সুভাষচন্দ্র	সীতারামইয়া	প্রদেশ শহর	সুভাষচন্দ্র	সীতারামইয়া
আজমীর	১৮	৮	কেরালা	৮০	১৮
অন্ধ্র	৩৯	১৮১	মহাকোশল	৬৭	৬৮
আসাম	৩৪	২২	মহারাষ্ট্র	৭৭	৮৬
বাংলা	৪০৪	৭৯	নাগপুর	১২	১৭
বেরার	১১	২১	উ.প. সীমান্ত প্রদেশ	১৮	২৩
বিহার	৭০	১৯৭	পাঞ্জাব	১৮২	৮৬
বোম্বাই শহর	১৪	১১	সিন্ধু	১৩	২১
ব্রহ্মদেশ	৮	৬	তামিলনাড়ু	১১০	১০২
দিল্লী	১০	৫	উত্তর প্রদেশ	২৬৯	১৮৫
গুজরাট	৫	১০০	উড়িষ্যা	৪৪	৯৯
কর্ণাটক	১০৬	৪১	মোট —	১৫৮০	১৩৭৭

সূত্র : বি এন পাণ্ডে সম্পাদিত 'লিডারশিপ ইন সাউথ এশিয়ায়' ডেভিড টেলারের নিবন্ধ : 'দি ক্রাইসিস ইন দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ১৯৩৬-৩৯'

সুভাষচন্দ্র-সীতারামাইয়া নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রদেশভিত্তিক প্রদত্ত ভোটের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মোট ২১টি প্রদেশ ও শহরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ১২টি প্রদেশের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছেন। ১২টি প্রদেশ ও শহরের মধ্যে আবার বাংলা, কর্ণাটক, এবং উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিপুলভাবে তাঁকে সমর্থন করেন। অপরদিকে ৯টি প্রদেশ ও শহরের মধ্যে অন্ধ্র, বিহার ও গুজরাট প্রদেশের প্রতিনিধিরা পট্টভি সীতারামাইয়াকে বিপুলভাবে ভোট দেন।

গান্ধীজীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত পট্টভি সীতরামাইয়ার পরাজয়ে তাঁর অনুগামীরা

বিস্মিত হন। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র জাতীয় দাবি ও কর্মপন্থার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ভারতের জাতীয় দাবি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে সময়-সীমা ভিত্তিক চরমপত্র পেশ করতে হবে। সময়সীমার মধ্যে উত্তর না পেলে, অথবা উত্তর অসন্তোষজনক হ'লে, জাতীয় দাবিপূরণে ভারতীয়রা তীব্র আন্দোলন শুরু করবে। আন্দোলন অর্থে তিনি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে আইন অমান্য গণ-আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে গণ-আন্দোলনের চরমপত্র দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জাতীয় দাবি আদায়ের কথা তিনি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন।

সুভাষচন্দ্রের জয়ে কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সভাপতি নির্বাচনের পরেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি সীতারামাইয়া শংকররাও দেও, জে বি কৃপালনী, জয়রামদাস দৌলতরাম, যমুনালাল বাজাজ প্রমুখ ১২ জন সদস্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা যৌথভাবে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে পত্র লিখে জানান যে, বিভিন্ন মতের জোড়াতালি দেওয়া কংগ্রেসের পরিবর্তে সভাপতি যেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতাদর্শ প্রতিফলিত করে এমন একটি সমমনোভাবাপন্ন কমিটি গঠন করেন।

জওহরলাল নেহেরু ১২ জনের সঙ্গে যৌথভাবে পদত্যাগ না করলেও তিনি স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দেন। তিনি কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর প্রাক্-নির্বাচনী বিবৃতির অভিযোগগুলি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন। প্রাক্-নির্বাচনী বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রভাবশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটির প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করায় আগ্রহী হয়েছেন। জওহরলাল সমেত মোট ১৩ জন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করায় কংগ্রেসে গভীর রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রভাবশীল নেতৃত্বের জয়লাভে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটে।

১৩ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদত্যাগের পরেই গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং প্রায় ১৬০ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতিকে জানালেন যে, তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপনে ইচ্ছুক। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে আগামী বছর সংকটজনক অবস্থা দেখা দিতে পারে এবং সেই অবস্থায় দেশ ও কংগ্রেসকে সংকট থেকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে পারেন

শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধী। সেজন্য কংগ্রেস মনে করে যে, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মহাত্মার আস্থাভাজন হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সভাপতিকে গান্ধীজীর পছন্দ অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। অর্থাৎ, দীর্ঘদিন ধরে সভাপতির মনোনীত ব্যক্তিরাই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হতেন। ১৯৩৯-এর ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে জয়লাভের ফলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনয়নের ভার সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের পরিবর্তে গান্ধীজীর উপর অর্পণ করার প্রস্তাব করা হল।

গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবটি সম্পর্কে সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র রুলিং দেন যে, এই প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে আলোচিত হতে পারে না। তিনি অবশ্য প্রস্তাবটি 'সাবজেক্টস কমিটিতে' উত্থাপিত হওয়ার অনুমতি দেবার জন্য সম্মতি প্রকাশ করেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবটি কংগ্রেসের প্রকাশ্য ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং গৃহীত হয়ে যায়। এই প্রস্তাবে গান্ধীজীকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি প্রত্যাখ্যান করা সমেত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কংগ্রেসে গৃহীত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে ওয়ার্কিং কমিটির জন্য সদস্যের তালিকা দিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে জানালেন তাঁর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে অন্যান্য সদস্যের মতপার্থক্য এতই মৌলিক যে কোন নামের তালিকা দেওয়ার অর্থ হল তাঁর উপর সেগুলি চাপিয়ে দেওয়া। এমতাবস্থায় তিনি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করলেন। গান্ধীজী বললেন ঃ 'you are free to choose your own Committee'.

গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির সম্ভাব্য সদস্যদের তালিকা দিতে অস্বীকৃত হলে সুভাষচন্দ্র তার প্রতিবাদে কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। পরের দিন রাজেন্দ্র প্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতিরূপে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৩৯-এর ১লা মে রাজেন্দ্র প্রসাদ ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন। সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলে যে ১২ জন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁদের পুনর্মনোনীত করেন। অবশ্য জওহরলাল নেহেরু এই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকতে অস্বীকৃত হন।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে গান্ধীজীর অসহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৯-এর জুনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহবান করে। এই সভায় সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসীদের ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিনা অনুমোদনে কোনপ্রকার সত্যাগ্রহ অথবা গণ-আন্দোলন পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হল।

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে কংগ্রেস কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর চরম আঘাত বলে মনে করলেন। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা ১৯৩৯-এর ৯ই জুলাইকে এ আই সি সি প্রস্তাববিরোধী দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। ৯ই জুলাই বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে সভাসমিতি করে উৎসাহের সঙ্গে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

প্রতিবাদ দিবস প্রতিপালিত হলে ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদে অযোগ্য ঘোষণা করে, এবং সেই সঙ্গে তাঁকে আগামী তিন বছর কংগ্রেসের কোন কমিটিতে সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় অনুপযুক্ত ঘোষণা করে। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'গুরুতর শৃংখলাবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদে এবং ১৯৩৯-এর আগস্ট মাস থেকে তিন বছর সময় পর্যন্ত যে-কোন নির্বাচনমূলক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হবার অযোগ্য ঘোষণা করা হল।'

একাদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ক্রমে ক্রমে। তিরিশের দশকের শুরু থেকেই পৃথিবী ধীরে ধীরে অথচ সুস্পষ্টভাবে বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করল। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ জীইয়ে রাখা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ধ্বংস করা, মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করার জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীল অস্ত্র হিসাবে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের উদ্ভব ঘটে; এবং তার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিস্ত ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ, স্পেনে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ, নাৎসী জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া ও পরে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল, জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ প্রভৃতি আক্রমণাত্মক ঘটনাগুলির মাধ্যমে ফাসিস্ত শক্তিবর্গ নতুন বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ছড়াতে শুরু করল। তিরিশের দশকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের যে পটভূমি সৃষ্টি হল তার প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটল ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বরে। এই দিন নাৎসী জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইউরোপের রণাঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান এবং জার্মানীতে নাৎসীবাদের আবির্ভাব এবং হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী সামরিক শক্তির পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তথা মানবেতিহাসে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল পর্ব শুরু হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও উৎপত্তি ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম আর্থ-সামাজিক বিকাশ থেকে। ফিনান্স পুঁজির রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক রূপে ফ্যাসিবাদ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে হীনতম, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং অন্য জাতির বিরুদ্ধে পাশবিক যুদ্ধোন্মাদনা ছড়িয়েছিল। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

নৈতিক দায়িত্ব অনুসারে পোল্যান্ডকে সাহায্য করার কারণগুলি বিবৃত করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন বিশ্বের পুরাণো ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররূপে সুপরিচিত। সারা বিশ্বে এই দু'টি রাষ্ট্রের উপনিবেশ এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগ মাকড়সার জালের মত ছড়ানো ছিল। সেজন্য পোল্যান্ড আক্রান্ত হবার পর জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণায় ফ্যাসিস্ত বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনার কোন মনোভাব প্রকাশ পায় নি। তারা আশা করেছিল পোল্যান্ডকে পদানত করে হিটলার ইউরোপের পূর্ব দিকে নাৎসী সামরিক বাহিনীর অভিযান চালিয়ে যাবে। কারণ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধানতম শত্রু ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানে যে সামরিক উন্মত্ত অভিযান শুরু হয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিল যে শেষ পর্যন্ত নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শক্তির সামরিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় ত্বরান্বিত হবে। তিরিশের দশক থেকে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয় জার্মানীর প্রতি কঠোরতার পরিবর্তে দুর্বলতার মনোভাব পোষণ করেছিল। ১৯৩৬-এ জার্মানী রাইন নদীর তীরবর্তী নিরপেক্ষ অঞ্চল দখল করলে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তি জার্মানী লঙ্ঘন করতে শুরু করলে ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয় সামান্যতম প্রতিবাদ না করে ফ্যাসিবাদী শক্তির অভ্যুত্থানে ইন্ধন জুগিয়েছিল। জাপানের সঙ্গে জার্মানীর কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স খুবই খুশী হয়েছিল। জার্মান-জাপান কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তির সঙ্গে ইতালির সক্রিয় কমিউনিস্ট বিরোধিতা যুক্ত হলে ইউরোপ ও এশিয়ায় কমিউনিস্ট বিরোধী অক্ষ শক্তি (Axis Power , গঠন সম্পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদ্বয়ের। যুদ্ধরত দু'টি শক্তিগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। সেজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল মিত্র শক্তিবর্গের (Allied Power) রাষ্ট্র। মিত্র শক্তিবর্গের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের উপনিবেশ ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়েছিল। ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গ নিজেদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাজার সম্প্রসারণে বিশ্বে নতুন উপনিবেশ দখল করায় তীব্র সামরিক অভিযানে লিপ্ত হয়েছিল। ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তি-বর্গের উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে যখন সংগঠিত পুঁজিবাদী

রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়ে বিশ্বের উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি সম্পূর্ণ করেছিল।

ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক শোষণ, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য তিরিশের দশকে বিশ্বে নতুন কোন উপনিবেশ বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ উন্মুক্ত ছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণ সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে ফ্যাসিস্ত-নাৎসী শক্তিবর্গ ইউরোপ ও এশিয়ায় ভয়ংকর সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে অক্ষ শক্তিবর্গের কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে জাতি-বিদ্বেষী ও সম্প্রসারণশীল আদর্শ প্রচার করে ফ্যাসি-নাৎসী শক্তিবর্গের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। অপরদিকে মিত্র শক্তিবর্গ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হলেও গণতান্ত্রিক রীতি ও প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বজায় রেখেছিল। কিন্তু মিত্র শক্তিবর্গের রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জনপ্রিয় স্বাধীনতা আন্দোলন দমন ও গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কণ্ঠরোধ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করেছিল। সেজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়কে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের রাজনৈতিক আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নি। ফ্যাসি-নাৎসী শক্তিবর্গ পশ্চিম ইউরোপের দিকে সামরিক আক্রমণ তীব্রতর করলে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সকে সর্বশক্তি দিয়ে নাৎসী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দখলে এনে হিটলারের নাৎসী বাহিনী ১৯৪১-এর জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। ঐ বছরের ডিসেম্বরে আকস্মিকভাবে পার্ল হারবার আক্রমণ করে জাপান জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। ফলে ১৯৪১-এর শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ইউরোপ এবং এশিয়ায় জ্বলতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই মিত্র শক্তির পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটে। কারণ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ শুরু হয়।

ইউরোপে যুদ্ধ বাধার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভারতের বড়লাট ভারতীয় জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অনুরূপভাবে ভারতীয় নেতাদের

মতামতের তোয়াক্কা না করেই ব্রিটেন ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করেছিল। পঁচিশ বছর পরেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত সম্পর্কে মূল মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সেজন্য দেখা গেল ভারতের জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর বিন্দুমাত্র মূল্য আরোপ না করেই ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হল।

যুদ্ধ ঘোষণার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য সংবিধান প্রণয়ন সভা গঠনের জাতীয় দাবিকে সরাসরি নাকচ করে দিল। ভারতের সীমান্তে তখনও পর্যন্ত যুদ্ধের কোন দাবানল জ্বলে ওঠে নি। সুদূর ইউরোপে নাৎসী-হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ এবং ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয়ের জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে তখনও পর্যন্ত স্পর্শ না করলেও ব্রিটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধের অংশীদার হিসেবে ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকেও খর্ব করে বড়লাটকে স্বৈরাচারীমূলক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হল। পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হবার পর ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার নামে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার নিতান্ত সীমিত সাংবিধানিক ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অকেজো করে ভারতীয়দের সামান্যতম গণতন্ত্র অস্বীকার করল। ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করার স্বৈরাচারী ক্ষমতা গ্রহণ করল। জার্মানীর বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার ভারতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা হরণ করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু যে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিক্রিয়া এক রকমের ছিল না। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও এই যুদ্ধের প্রকৃতি ১৯৪৫ পর্যন্ত সমান ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল।

সেইজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী এক ধরণের ছিল না। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জনগণের অথবা তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কোনরকম সম্মতি না নিয়েই ব্রিটেন একতরফাভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে সামিল করেছিল। ১৯৩৯-এ জার্মানী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বড়লাট ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে ভারতকে যুদ্ধরত (belligerent) দেশ বলে ঘোষণা করলেন। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত সরকার আইনকে (Government of India Act) সংশোধন ক'রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে কার্যত বাতিল করে দিল। সংশোধিত ভারত শাসন আইন বড়লাটকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করল। ১৯৩৯-এ ভারত প্রতিরক্ষা ঘোষণার বলে (Defenee of India Ordinance) কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র হুকুমনামা জারি করে ভারত শাসনের ক্ষমতা লাভ করল। বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অহেতুক তৎপরতা এবং বড়লাটকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদান ভারতীয় জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করল। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সম্পর্কে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে বলা হ'ল: 'কংগ্রেস বারংবার ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদের আদর্শ ও পন্থাকে এবং তাদের যুদ্ধের প্রশস্তি ও হিংসা সাধন এবং মানবীয় শক্তিকে দলিত করার কাজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন না করার কথা ঘোষণা করেছে। এরা অনবরত যে আক্রমণের মধ্যে নিজেদেরকে নিহিত করেছে এবং সভ্য আচরণের গৃহীত নীতিসমূহ এবং মাপকাঠি-গুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস তার নিন্দা করেছে। ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসী-বাদের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে সাম্রাজ্যবাদী নীতির দৃঢ়করণ যার বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণ লড়াই করেছে। কার্যকরী সমিতি তাই নির্দ্বিধায় পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর নাৎসী সরকারের সর্বশেষ আক্রমণকে তীব্র নিন্দা করছে এবং এই আক্রমণকে যারা প্রতিরোধ করছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে।'

কংগ্রেস প্রস্তাবে আরও সংযোজন করল : 'গণতন্ত্রের যথার্থ মাপকাঠি হল সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ উভয়েরই অবসান এবং অতীত ও বর্তমানে তাদের সাথে জড়িত আক্রমণের পরিসমাপ্তি। একমাত্র এর উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। সেই নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে কমিটি সর্বপ্রকারের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত। কিন্তু কমিটি নিজেদেরকে সেই রকম যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করতে পারে না, কিংবা তাকে সাহায্য করতে পারে না; যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ধারায় পরিচালিত এবং ভারত ও অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্যবাদকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট।'

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাত করে ১৯৩৯-এর অক্টোবরে একটি বিবৃতি দিলেন। এই বিবৃতিতে তিনি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দানকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের মধ্যেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার কথা বললেন। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে, যুদ্ধশেষে সর্বস্তরের ভারতীয়ের স্বার্থ রক্ষা করে ও সংখ্যালঘুদের সঙ্গে মত বিনিময় করে ভারত সরকার আইনের সংশোধন করা হবে। যুদ্ধ পরিচালনায় ভারতীয় জনমতকে সামিল করার জন্য বড়লাট ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শ-দান পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব দিলেন।

বড়লাটের বিবৃতি এবং প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অসন্তোষ প্রকাশ করে। কংগ্রেস যুদ্ধ পরিচালনায় ব্রিটেনকে সাহায্যদানে অস্বীকৃত হয়। কারণ বড়লাটের প্রস্তাবে ভারতকে স্বাধীনতাদানের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। এই অবস্থায় যুদ্ধ পরিচালনায় ব্রিটেনকে সাহায্য করার অর্থ হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করা। প্রতিবাদস্বরূপ ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা-গুলিকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি ১৯৩৯-এর অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে পদত্যাগ করে।

২২শে নভেম্বর ১৯৩৯ সালের কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট-ভাবে বলা হয়েছে : "যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের গৃহীত নীতি, বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণাসমূহ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে বর্তমান যুদ্ধটি, ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের মত, সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে শিকড় গেড়ে থাকতে চায় এরকম যুদ্ধের সাহায্যে। যুদ্ধের পিছনে এই ধরণের মতলব

থাকায় কংগ্রেস নিজেকে এর সাথে জড়িত করতে পারে না, এবং ভারতবর্ষের সম্পদকে শোষণ করার ব্যাপারে আনুকূল্য দেখাতে পারে না।"

১৯৪০-এ রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতীয় জনগণের সম্মতি না নিয়ে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রামগড় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অটল থাকে। ভারতের জনগণ কেবলমাত্র নিজেদের সংবিধান রচনা করতে পারে এবং তাঁরাই বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নির্ধারণ করার অধিকারী। রামগড় কংগ্রেস সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণপরিষদের দ্বারা ভারতের সংবিধান রচনার সংকল্পকে পুনরাবৃত্তি করে। বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীজী বিশ্বযুদ্ধকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে একীভূত না করে শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে শান্তিবাদী সংগঠনের পরিবর্তে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের রাজনৈতিক দল হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য সারা ভারতের কংগ্রেস কমিটি-গুলিকে সত্যাগ্রহ কমিটিতে পরিণত করতে রামগড় কংগ্রেস আহবান জানায়। যুদ্ধের সময়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর পথ উন্মুক্ত রেখেছিল প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতা করতে গিয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন: 'I see people are ready for disobedience, but not for Civil Disobedience'। অর্থাৎ, আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবর্তে জনগণ শুধুমাত্র অমান্য প্রদর্শনে প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন: 'আমরা এখনই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছি এমন কথা ঘোষণা করার কোন কারণ দেখছি না।' ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য।

১৯৪০-এর গ্রীষ্মকালে নাৎসী শক্তি ঝটিকা বেগে ইউরোপ আক্রমণ করলে ফরাসী দেশের সামরিক পতন ঘটে। এই সঙ্গে যুদ্ধের সংকট প্রবলভাবে দেখা দিলে কংগ্রেস ১৯৪০-এর জুলাইতে অনুষ্ঠিত পুণা অধিবেশনে ব্রিটেনকে শর্তাধীন যুদ্ধ সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। কংগ্রেস ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করার শর্তগুলি প্রকাশ করে। ব্রিটেনকে ভারতীয় স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করতে হবে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার (Provisional National

Government at the Centre) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন্দ্রে দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার স্থাপন করতে হবে। ব্রিটেন কংগ্রেসের দাবিগুলি মেনে নিলে রাজনৈতিক সংগঠনরূপে কংগ্রেস ভারত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করতে পারে।

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের শর্তাধীন সহযোগিতার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ব্রিটিশ সরকারের মতে ভারতের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ এবং রাজন্যবর্গ কংগ্রেসের প্রস্তাবে সম্মত হবে না। বড়লাট কংগ্রেসকে একটি নতুন প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব ১৯৪০-এর আগস্ট প্রস্তাব নামে পরিচিত। বড়লাটের প্রস্তাবে বলা হয়, যুদ্ধ শেষে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা হবে। এই সংস্থা নতুন সংবিধানের কাঠামো রচনা করবে। বড়লাটের প্রস্তাবে তাঁর প্রশাসনিক পর্ষদকে মনোনীত ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়। ভারতীয় ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যুদ্ধ পরামর্শ-দান পরিষদ (War Advisory Council) গঠনের কথা বলা হয়।

বড়লাটের আগস্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গান্ধীজী তারবার্তায় একটি বিদেশী সংবাদপত্রকে বলেন যে, আগস্ট প্রস্তাব ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, আগস্ট প্রস্তাব ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সমগ্র ধারণাটিকে কবরস্থ করল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলল: 'কংগ্রেসের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশ সরকার প্রমাণ করল যে তলোয়ার দিয়ে এই সরকার ভারত শাসনে বদ্ধপরিকর।' যুদ্ধের বিপদের সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত না করার যে ইচ্ছা কংগ্রেসের ছিল তাকে ব্রিটেন ভুল বুঝেছিল।

বড়লাটের আগস্ট প্রস্তাব কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক মনে হয়। প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪০-এর অক্টোবরে ব্যক্তিগত আইন অমান্য (individual civil disobedience) অভিযান শুরু করে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতে ব্রিটিশ সরকার মোট কুড়ি হাজার ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করে। গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ অভিযানের উদ্দেশ্যকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করার অধিকার বলে ঘোষণা করলেন।

১৯৪১-এর মধ্যভাগে বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেল। ১৯৪১-এর ২২শে জুন হিটলারের জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করল। জাপান অতর্কিতে পার্লহারবার আক্রমণ করে এশিয়া মহাদেশে বিশ্বযুদ্ধকে ছড়িয়ে দিল। ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মৈত্রী আরো সম্প্রসারিত হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনকে অন্তর্ভুক্ত করল। এই পাঁচটি রাষ্ট্রের নবগঠিত মৈত্রীর মধ্য দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) গড়ে উঠল। জার্মানী-ইতালী-জাপানকে নিয়ে গড়ে ওঠা অক্ষ শক্তির (Axis Powers) বিরুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্স-সোভিয়েট ইউনিয়ন-চীনকে নিয়ে গঠিত মিত্র শক্তি (Allied Powers) নতুন জাতিপুঞ্জ গঠন করল। এর ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চরিত্রগত গভীর পরিবর্তন দেখা দিল।

ভারতের জাতীয় জনমত বিশ্বযুদ্ধের নতুন রূপান্তরের তাৎপর্য দ্রুত উপলব্ধি করল। ভারতীয় জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করলেন: 'বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিগুলি এখন রাশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনকে নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীর মধ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে।' জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা নতুন গড়ে ওঠা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমমর্যাদাসম্পন্ন মৈত্রী হিসাবে ভারতের স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তাঁরা যুদ্ধের সময় ভারত প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা দানে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৪১-এর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের সামনে ভারত প্রতিরক্ষায় কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের সুযোগ এসেছিল। অর্থাৎ, কংগ্রেসের দাবি অনুসারে যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যটি সম্পর্কে সম্মানজনক আলাপ-আলোচনা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৪১-এ ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দু'টিকে নিয়ে গঠিত অ্যাটলান্টিক সনদে (Atlantic Charter) সমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের পছন্দমত সরকার গঠনের অধিকারকে স্বীকার করা হয়। বলপূর্বক বঞ্চিত মানুষের সার্বভৌম অধিকার এবং স্ব-শাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষিত হয়। অ্যাটলান্টিক সনদের মর্মবস্তুর বিরোধিতা করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সরকারিভাবে ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশগুলি এই সনদের আওতায় আসবে না। কারণ নাৎসীশক্তির দ্বারা পদানত ইউরোপের জাতি ও রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও স্ব-শাসনের জন্য এই সনদ প্রযুক্ত হবে।

ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শক্তির মিত্র হিসাবে জাপান দ্রুত সিঙ্গাপুর দখল করে

এবং মালয় আক্রমণ করে। তার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেস সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বন্ধু হিসাবে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে। অবশ্য এই সমর্থন শর্তাধীন ছিল। ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত হলে তবেই অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ 'কেবলমাত্র মুক্ত ও স্বাধীন ভারত দেশের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।' অবশ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জন্য যে সব দেশ লড়াই চালাচ্ছে তাদের প্রতি কংগ্রেসের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনের চিয়াং কাইশেক ব্রিটেনকে ভারতীয়ের হাতে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেছিলেন আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা পেতে হলে দ্রুত রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী ভারতকে স্ব-শাসন অধিকার দানের জন্য ব্রিটেনকে অনুরোধ করেন। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট পরোক্ষে চার্চিলের যুক্তি খণ্ডন করে অ্যাটলান্টিক সনদকে সারা বিশ্বে প্রয়োগ করা হবে এ কথা ঘোষণা করেন। দেখা যায়, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা পাবার জন্য ভারতে দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে।

ব্রিটেন ভারতে দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় কোন সময় আগ্রহ দেখায় নি। তার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারত প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা করার আহবান জানায় নি। ইতিমধ্যে জাপানের সামরিক আক্রমণে রেঙ্গুনের পতন হলে ১৯৪২-এর মার্চে ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক প্রশ্নটি আলোচনা করার জন্য ক্রিপস মিশন পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীতে দ্বৈতনীতি দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে জওহরলাল নেহেরু রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে প্রগতিশীল রাষ্ট্রের জোট বলে অভিহিত করেন। কিন্তু জাতীয় প্রশ্নে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা দান প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি মূল্যায়ণ এবং জোটবদ্ধতার সঠিক নীতি গ্রহণের পরিবর্তে ভারতের স্বাধীনতা লাভকে অগ্রাধিকার দেয়। সেজন্য দেখা যায় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নানাসময় বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়টির

উপর আলাপ-আলোচনা চালানোয় সর্মাধক গুরুত্ব আরোপ করে।

খ. মুসলিম লীগ

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তীব্র প্রতিক্রীয়া সৃষ্টি করেছিল। প্রধানতম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতের মুসলিম লীগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হবার পর যুদ্ধ সম্পর্কে এই দলের বক্তব্য প্রকাশ করে। ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ দেখা দিলে মুসলিম লীগকে এই সব আক্রমণমুখী ও উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার চেয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্প্রসারণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হবার পরেই মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৯-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে 'বাহুবলই শক্তি' এই মতবাদকে খণ্ডন করে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণকে নিন্দা করে। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে মানব স্বাধীনতার নীতিগুলিকে সমর্থন করা হয়। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে পোল্যাণ্ড ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সহযোগিতা করার প্রশ্নে মুসলিম লীগ কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করে। মুসলিম লীগের মতে ভারতের কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি আদৌ ন্যায় বিচার করা হয় নি। সেজন্য এইসব প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের ব্যক্তি স্বধীনতা, সম্পত্তি এবং মর্যাদা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সহাযোগিতা করার পূর্বশর্ত হল কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা করা। ভারতের ব্রিটিশ সরকার প্রাদেশিক গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার নির্দেশ না দিলে মুসলমানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হবে না। ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ব্রিটিশ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং কংগ্রেস জয়লাভ করে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ১৯৩৭-এর নির্বাচন প্রমাণ করেছিল যে বিশাল সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সারা ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিহত করতে না পেরে মুসলিম লীগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ব্রিটেনকে সহযোগিতা করার পূর্বশর্ত হিসাবে অগণতান্ত্রিক উপায়ে গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার দাবি জানিয়েছিল। ভারতের শাসন সংস্কার ও সাংবিধানিক অগ্রগতি সম্পর্কে কোন ঘোষণা করার পূর্বে মুসলিম লীগের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য ব্রিটেনকে অনুরোধ করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে। সেজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদের সম্মানজনক সহযোগিতা পেতে হলে ব্রিটেনকে মুসলিম লীগের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমানকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন ও সংকটময় পরিস্থিতিতে কঠোর সংকল্প এবং আত্মত্যাগ করার জন্য অহবান জানানো হয়েছিল। কারণ এই বিশ্বযুদ্ধে ভারতের নয় কোটি মুসলমানের ভাগ্য জড়িয়ে আছে।

কংগ্রেসের ভারতে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি নাকচ করে ১৯৪০-এর আগস্টে বড়লাট লিনলিথগো যুদ্ধশেষে ভারতের শাসন সংস্কারের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কংগ্রেস তাকে প্রত্যাখ্যাণ করে। ১৯৪০-এ সেপ্টেম্বরে মুসলিম লীগ বড়লাটের আগস্ট প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করে। এই প্রস্তাবকে মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অগ্রগতি বলে বর্ণনা করে।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপান ফ্যাসি-নাৎসীবাদী জোটে যোগ দিয়ে অতর্কিতে পার্লহারবার আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত হয়। জাপান অক্ষশক্তি জোটে যোগ দিলে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে। মুসলিম লীগের মতে জাপানের যুদ্ধে যোগদান ভারতের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের যুদ্ধ হয়। বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে প্রধানত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ বিশ্বযুদ্ধের কোন রকম মূল্যায়ন করে নি। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশের সঙ্গে দর কষাকষি করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুযোগ সুবিধা লাভ করাই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিশ্বযুদ্ধের মূল্যায়ণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেয়ে

জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতীয় হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করে ব্রিটিশের সঙ্গে নানা ধরণের দরকষাকষির রাজনীতিকে মুসলিম লীগ অগ্রাধিকার দেয়। সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটেন মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবিগুলিকে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

গ. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। প্রধান যুদ্ধমান দুই পক্ষের একদিকে ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, যাকে মদত দিচ্ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে ছিল জার্মান-ইতালীয় ফাসিস্ত শক্তিবর্গ, যার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী জাপান কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় সেই সময় ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী অবস্থায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ১৯৩৭-এ কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের সময় কমিউনিস্টদের কিছুটা আইনগত সুবিধা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সামনে অবাধভাবে কাজ করার সমস্ত সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরই ভাবতের কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ বিপদ খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউরোপের সর্বত্র কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ইউরোপের কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেজন্য ভারতের কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আন্তর্জাতিক শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী জাতীয় যুক্ত মোর্চা (United National Front) গড়ার কথা বলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেই মোর্চায় জাতীয়বাদী এবং বামপন্থী দলগুলিকে সামিল হতে আহবান জানান।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবাব আগে থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে নিন্দা করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অল্প কিছু সময়ের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে। সেই সঙ্গে বিনা সম্মতিতে

ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে ফেলার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র সমালোচনা করে। তখনও পর্যন্ত বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৯-এর ২রা অক্টোবরে একদিনের জন্য রাজনৈতিক ধর্মঘটের আহ্বান জানালে বোম্বাই-এর নব্বুই হাজার বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ধর্মঘট করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই বোম্বাইয়ের শ্রমিক ধর্মঘট হ'ল বিশ্বে সর্বপ্রথম যুদ্ধবিরোধী সফল শ্রমিক ধর্মঘট। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ভারতের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালায়। ১৯৪০-এর বছরটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভায় মুখর হয়ে ওঠে। বিহারের চিনি কল শ্রমিক, কলকাতার ঝাড়ুদার, ঝরিয়ার কয়লাখনি শ্রমিক এবং সেই সঙ্গে সারা ভারত কিষাণ সভা পরিচালিত কৃষকেরা তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'এক পাই নয়, এক ভাই নয়', ধ্বনি তুলেছিল। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত থেকে একটা পাই পয়সা দেওয়া হবে না, একজন মানুষকে পাঠানো হবে না। ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীব মৈত্রী গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন।

১৯৩৯-এর নভেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করে। কমিউনিস্টরা যুদ্ধের সংকটকে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনেব স্বার্থে ব্যবহার করাব কথা ঘোষণা করেন ('Revolutionary utilisation of the war crisis for the achievement of national freedom'); কমিউনিস্টরা ভেবেছিলেন যুদ্ধের সংকট ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের বিরোধকে হাজার গুণ তীব্রতর করবে। সেজন্য যুদ্ধের বিরোধিতা করে সংগ্রাম পরিচালনার নীতি কমিউনিস্টরা গ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্টদের কাছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল। সেজন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসপন্থী সহ সমস্ত বামপন্থী শক্তিগুলিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমবেত হতে আহবান জানিয়েছিল।

১৯৪০-এর জানুয়ারীর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইসতেহার প্রকাশ করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও অনুগামীদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-জনিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে আহবান জানায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করে তার সুযোগ গ্রহণ করতে বলা হয়। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং শান্তির পতাকাতলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে। এই সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের জাতীয় দাবিকে পূর্ণ সমর্থন করে গণ-পরিষদ গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়। অর্থাৎ ১৯৩৯-এর ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত জাতীয় দাবিগুলিকে ১৯৪০-এ কমিউনিস্টরা পূর্ণ সমর্থন জানান। কিন্তু ১৯৩৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪০-এর মার্চ পর্যন্ত অনুসৃত জাতীয় কংগ্রেসের যুদ্ধসংক্রান্ত নীতিকে কমিউনিস্ট পার্টি 'অপেক্ষা ক'রে থাকার নিষ্ক্রিয় নীতি' ব লে সমালোচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৪১-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে ফাসিস্ত-নাৎসী শক্তিবর্গের লড়াইকে সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করে। এই সময়কালে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে যুক্ত করে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রের মধ্যে উদ্দীপনা দৃষ্টি করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এবং জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে জন্য মানসিক-ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। তীব্র যুদ্ধ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বেশির ভাগ কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০-এ কারারুদ্ধ করে।

১৯৪১-এর জুনে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয়পুঞ্জ গঠন করে। জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বকে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের যুদ্ধ থেকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৯৪১-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের লড়াই হয়েছিল। ১৯৪১-এর জুনে নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় এবং বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

ফ্যাসিবাদী শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমনের অব্যবহিত পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ (People's War বলে ঘোষণা করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পাঁচ মাস পরে কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নতুন মূল্যায়ন করেন। এই সময় ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী অবস্থায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে পার্টির বহু নেতৃস্থানীয় সদস্য ব্রিটিশের জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন এবং বাকি নেতৃস্থানীয় সদস্যরা আত্মগোপন করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছিলেন। সেজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নতুন মূল্যায়ন করতে কিছু সময় লেগেছিল। ফ্যাসিবাদী আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। জনযুদ্ধের ধ্বনিকে সমর্থন করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবে বলা হয়েছিলঃ 'আমাদের পার্টি ব্যবহারিক পার্টি (paractical party)। নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের আশু কর্তব্য হ'ল শুধুই কেবল একটি নতুন সংগ্রামের পদ্ধতি নির্ধারণ করাই নয়, উপরন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নতুন পদ্ধতির উপযোগী নতুন ধ্বনির উদ্ভাবন করা।'

যুদ্ধের এই পর্যায়ে, যুদ্ধমান দুইপক্ষের মধ্যে একদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্যদিকে ফ্যাসিস্ত জার্মানী, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন থাকতে পারে নি। কারণ কমিউনিস্টদের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই পর্যায় সারা পৃথিবীর সামনে দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার মৌলিক প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছিল। বিকল্প দুটি হলঃ স্বাধীনতা অথবা ফ্যাসিবাদ। কমিউনিস্টদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়লাভের অবিচ্ছেদ্য পূর্বশর্ত হ'ল যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের জয় ও ফ্যাসিবাদের পরাজয়। কারণ ফাসিস্ত শক্তি জয়লাভ করলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমেত সারা বিশ্বের মুক্তি আন্দোলন সমূহ-ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য জনযুদ্ধের দৃষ্টিভংগী কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমেত সমগ্র মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলা হয়েছিল। কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছিলেন যে, জনযুদ্ধের ধ্বনি দিয়ে তাঁরা কখনও ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে একীভূত করতে চান না। কারণ পরাধীন ভারতে জনগণ এবং তাদের শাসকবর্গের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ সব সময় থাকবে। জনযুদ্ধে সহযোগিতা করলেও কমিউনিস্টরা জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেজন্য কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে ভারতে

যুক্ত জাতীয় মোর্চা (United National Front) গড়ার কথা বলেছিলেন। যুক্ত জাতীয় মোর্চার মূল কর্মসূচী হবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা। জাতীয় মোর্চার নেতৃত্বে ভারতে জাতীয় সরকার গঠনের দাবিকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছিল।

কমিউনিস্টরা একই সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে সামিল করা এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে সর্বদলীয় রাজনৈতিক দাবিরূপে ঘোষণা করার কথা বলেছিলেন। সেজন্য দেখা যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে যুদ্ধ প্রয়াসে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের ভারতের জাতীয় দাবির সমর্থনে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠন করতে আহ্বান জানিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীকে সঠিক-ভাবে মূল্যায়ন করতে হলে যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মার্কসবাদ যুদ্ধ সম্পর্কে শান্তিবাদী (paicfist) বা ন্যায়পরায়ণ যুদ্ধ-বিরোধী (just anti-war) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে না। প্রত্যেক যুদ্ধকে তার ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করাই মার্কসবাদের বৈশিষ্ট। লেনিন আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধকে (defensivc war) সব সময়ে ন্যায্য, প্রগতিশীল ও ন্যায়সম্মত মনে করতেন। শান্তিবাদীরা যুদ্ধের চরিত্র এবং ঐতিহাসিক পটভূমিবাদ দিয়ে সমস্ত যুদ্ধকে নিন্দা করে। মার্কসবাদ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক প্রগতিশীল যুদ্ধকে সমর্থন করে।

লেনিনের সময়ে পৃথিবীকে বিভক্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই সব প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয় তাকে লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই যুদ্ধে কোনো প্রগতিশীল পক্ষ ছিল না। যারা এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল তাদের সকলকে লেনিন সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সংস্কারবাদী এবং বিপ্লবীরা যুদ্ধের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন. প্রথমোক্তরা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন ; দ্বিতীয়োক্তরা এই প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের বিরোধিতা করার এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি উচ্ছেদের জন্য বিপ্লবের পক্ষে কাজ করার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই যুদ্ধের সামাজিব

তাৎপর্যের বিচার করে, পৃথিবীকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য বিচার করে, যুদ্ধবাজ সরকারগুলির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের দুই পর্যায়ে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান গ্রহণ করে।

প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে ছিল একদিকে জার্মানী এবং অন্যদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। এই যুদ্ধকে বিশ্বে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ ও সংঘাত বলে গণ্য করা হয়। এর উৎপত্তি হয়েছিল এই কারণে যে হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা তখনকার মত ব্যর্থ হয়। তাই ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্যাসিবিরোধী জোটে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের ফলেই কেবলমাত্র যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে নি, যদিও সে অবস্থায় এই বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক বছরের ভেতরেই মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের উপর ফ্যাসিবাদী বিজয় সম্পূর্ণ হয়। নাৎসী জার্মানী যুদ্ধ শুরু করার ন' মাস পরে ১৯৪০ সালের জুনের মধ্যে ফরাসী সরকারের আত্ম-সমর্পন সাঙ্গ হয়; গ্রেট ব্রিটেন নাৎসী লুৎফওয়াফের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে মারাত্মক বোমা আক্রমণের শিকার হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে পার্লহারবার আক্রমণের ফলে জাপানী ফ্যাসিবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির উপর নির্বিচারে আক্রমণ, আফ্রিকা মহাদেশে রোমেলের সৈন্যবাহিনীর অনুপ্রবেশ, বিশ্বের অক্ষশক্তির পৃথিবী জয়ের অভিলাষে নামা, এবং নাৎসী হিটলারের ১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ—এ সব বিষয়গুলি একসঙ্গে জড়িত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের চরিত্র এবং পৃথিবীর মানুষ এবং জাতিগুলির উপর এ-সবের সুদূর প্রসারী তাৎপর্যের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনে।

পরবর্তীকালের বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলিক পরিবর্তনের যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা সমর্থন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতন্ত্রের জয় এবং ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের চূড়ান্ত সামরিক পরাজয় এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের

দুর্বার গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির এক দশকের মধ্যে ভারত সমেত বহু দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করল এবং চীন, ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া সমেত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করল।

ঘ. কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পাঁচ বছর পূর্বে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করেছিল। ১৯৩৪-এর প্রথম বোম্বাই সম্মেলনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বলেছিলঃ 'সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করে এবং অন্যান্য সংকটের যথাযোগ্য ব্যবহার করে জাতীয় সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে।'

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রভাব জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবগুলির মধ্যে দেখা যায়। কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে প্রথম যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে জাতীয় কংগ্রেস লক্ষ্মৌ অধিবেশনে গৃহীত যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধের প্রতি শর্তাধীন সমর্থন করার প্রস্তাব গ্রহণ করলে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই দল আপোষহীন যুদ্ধ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করার জন্য কংগ্রেসকে তীব্র সমালোচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কর্মপরিষদ যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করে। পরবর্তীকালে এই দল যুদ্ধ সম্পর্কে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর আরো বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিঃশর্ত বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পায়। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণা যাই হোক না কেন তার জন্য কোন রকম অপেক্ষা না করেই গণ সংগ্রাম শুরু করার কথা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বলেছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং দরকষাকষির মনোভাব পরিত্যাগ করে সংগ্রামের মনোভাব গ্রহণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে আহবান জানানো হয়। ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করলে সেটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কর্মপরিষদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দলের আশু কর্তব্যগুলি নির্ধারিত করেছিল। এক, যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার এবং বিক্ষোভ মিছিল ও রাজনৈতিক ধর্মঘট পরিচালনা করা; দুই, জাতীয় কংগ্রেসের শাখাগুলিকে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার কার্যে সামিল করা, তিন, যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা। ১৯৩৯-এর অক্টোবরে প্রাদেশিক সরকারগুলি থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সন্তোষ প্রকাশ করে। শুধুমাত্র মন্ত্রীত্ব ত্যাগে ক্ষান্ত না থেকে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেসকে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবার জন্য আহ্বান জানায়।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্রিটেশের বিরুদ্ধে আপোষ-হীন সংগ্রামের নীতিকে তুলে ধরা। সেজন্য এই দল ঘোষণা করেছিল যে, আলাপ-আলোচনা এবং আপোষের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা আসতে পারে না। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভবপর। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-জনিত সংকট জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার উপযুক্ত সময় বলে এই দল মনে করত। ১৯৪০-এর জুলাইয়ে পুণা শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিটেনকে শর্তাধীন সমর্থন দানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই শহরে একই সময় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিঃশর্ত প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে। এই দলের প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'ভারত সম্পর্কে যে কোন ঘোষণা ব্রিটেন করুক না কেন, ব্রিটেন হ'ল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং এই যুদ্ধ হ'ল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।' জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটেনকে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সুস্পষ্ট-ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে বলেছিল, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটেন যে কোন ঘোষণাই করুক না কেন, ব্রিটেন মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস দাবি করেছিল অস্থায়ী জাতীয় সরকার। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ঘোষণা করল, ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সংগ্রাম বলতে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি রাজনৈতিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার কথা প্রচার করেছিল। রামগড় অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস তার শাখাগুলিকে সত্যাগ্রহ শাখায় পরিণত করে আইন অমান্য আন্দোলন

পরিচালনার প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেসের রামগড় প্রস্তাবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নীতি বলে চিহ্নিত করে। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে কংগ্রেস ব্রিটেনকে যুদ্ধে শর্তাধীন সমর্থনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি তাকে রামগড়ে গৃহীত সত্যাগ্রহ প্রস্তাবের বিরোধী বলে মনে করেছিল। কারণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করাই রামগড় কংগ্রেসের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল। যে কোনও রকম শর্তাধীন সহযোগিতার প্রস্তাবের সঙ্গে রামগড়ের প্রস্তাব সংগতিহীন।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি আন্দোলন পরিচালনার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের শাখাগুলিকে সত্যাগ্রহ শাখায় পরিণত করার দাবি জানায়। যুদ্ধ-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য এই দল স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেবার কথা বলে। সারা দেশে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করে যুদ্ধ-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলকে জোরদার করার জন্য আহবান জানায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট সমেত অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছিল। সেজন্য বামপন্থী দলগুলির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এই সময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতারা কারারুদ্ধ হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেস নতুন কোন মূল্যায়ন করে নি। জওহরলাল নেহেরু এই পর্যায়কে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছিলেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের বিন্যাসের মানদণ্ডে রাশিয়া, চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের জোটবদ্ধতা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূকে একত্রিত করেছে ; কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এই পর্যায়ের যুদ্ধে ভারতের সম্পর্কে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিবর্তন হয় নি। সেজন্য তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতিকে জনযুদ্ধ অথবা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে মূল্যায়ন করার বিরোধী। তাঁর মতে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ১৯৪১-এর জুনের পরবর্তী পর্যায়ের যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে চিহ্নিত করা একান্তভাবে অযৌক্তিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়কে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে অভিহিত করে। এই দলের মতে, সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ার ঘটনা যুদ্ধের প্রকৃতি ও চরিত্রে কোন পরিবর্তন আনে নি। আচার্য

নরেন্দ্র দেও বলেছিলেন যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যুদ্ধ অথবা পুঁজিবাদ এবং ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করার যুদ্ধকে কেবল জনযুদ্ধ বলা যায়। ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইতালি ও জাপানের মত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যখন উভয়পক্ষে যুদ্ধরত তখন সেই যুদ্ধ জনযুদ্ধ হতে পারে না।

ঙ ফরওয়ার্ড ব্লক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে। সুভাষচন্দ্রের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সামনে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম তীব্র করে এই সুবর্ণ সুযোগের যথাযোগ্য ব্যবহার করার কথা তিনি বলেন। কারণ এই সুযোগ সময়মত কাজে না লাগালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন কোনদিন আর অগ্রসর হতে পারবে না। সেজন্য ইতিহাস জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ক্ষমা করবে না। ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় থেকে সুভাষচন্দ্র আপোষহীন সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলে আসছিলেন।

সুভাষচন্দ্র রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতৃত্বের আপোষকামী মনোভাব এবং দোদুল্যচিত্ততার সমালোচনা করেন। তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচক ছিলেন। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের রাজনৈতিক দাবি পূরণে অসম্মত ছিলেন না। অবশ্য ভারতীয়ের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি এই দাবি পূরণ করা হয় তবেই তাঁর কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু অক্টোবর-নভেম্বর থেকে তিনি এই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতের জাতীয় দাবি তুলে ধরে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করার আহবান জানান। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ সরকার কোনদিনই ভারতীয়ের রাজনৈতিক দাবি মেনে নেবে না, সেজন্য ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত বামসংহতি কমিটি (Left Consolidation Committee) ১৯৩৯-এর অক্টোবরে নাগপুর শহরে 'আপোষ-বিরোধী সম্মেলন' (Anti-

Compromise Conference) আহবান করে। ১৯৩৯-এর নভেম্বরে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আপোষহীন মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করা হয়। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিকে শুধুমাত্র কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। রাজনৈতিক গতি সঞ্চারে এগুলিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তিনি কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্বকে আপোষমুখী বলে বর্ণনা করেন। সেজন্য তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের পরিবর্তন দাবি করেছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার কথা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বলেছিল। সুভাষচন্দ্র এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করলেও প্রয়োজনবোধে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম পরিচালনার কথা বলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, জনগণ এখনও প্রস্তুত নয় এবং দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা বজায় আছে এই অজুহাতে জাতীয় কংগ্রেস বারে বারে সংগ্রামী আন্দোলনকে স্থগিত রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে তিনি সংগ্রামী আন্দোলনকে তীব্র করার কথা বলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ছ'মাস পরে রামগড়ে অনুষ্ঠিত 'আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে' সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করেন। তিনি স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকারপত্রে গঠনমূলক কাজগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কংগ্রেসকে সমালোচনা করেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত 'আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে' দেশে সংগ্রামমুখী আন্দোলন জোরদার করার জন্য সারা ভারত এ্যাকশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জার্মানীতে চলে যান। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের পরেও ফরওয়ার্ড ব্লক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল।

৩ ক্রিপ্‌স মিশন ও শাসন সংস্কারের নতুন প্রস্তাব

১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপের যুদ্ধ গুরুতর আকার ধারণ করতে শুরু করে। নাৎসী জার্মানী একের পর এক পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে এবং ফ্রান্স দখল করে এবং জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন

আক্রমণ করে। যুদ্ধের গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ১৯৪১-এর জুলাই মাসে বড়লাটের কর্মপরিষদের (Viceroy's Executive Council) সম্প্রসারণ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (National Defence Council) গঠনের কথা ঘোষণা করা হল। ১৯৪১-এর শরৎকালে যুদ্ধের অবস্থা এমন দাঁড়াল যেখানে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের কথা ভাবতে হল। এই সময় নাৎসী জার্মানী অতি দ্রুত রাশিয়ার মধ্যে আক্রমণ তীব্রতর করলে নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতে যে কোন মুহূর্তে ফ্যাসিবাদী শক্তির অভিযানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ডিসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করে। জাপানী ফ্যাসিবাদী শক্তি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। ১৯৪২-এর মার্চ মাসে জাপানী সামরিক বাহিনী রেঙ্গুন দখল করে নিলে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ভারতের সীমান্তে ফ্যাসিবাদী জাপানী শক্তির অনুপ্রবেশ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করার বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে। কারণ শুধুমাত্র জাপানী শক্তির মোকাবিলাই ব্রিটিশের পক্ষে একমাত্র সমস্যা ছিল না। যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধোদ্যমে ভারতীয়ের একান্ত সহযোগিতা লাভ করাটাই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল যে শাসন-সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসনের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিলে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করা যাবে না।

১৯৪২-এর মার্চে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স-কে ভারতে প্রেরণের কথা ঘোষণা করলেন। চার্চিল জানালেন যে, ক্রিপ্‌স ভারতীয় সমস্যার 'ন্যায্য ও চূড়ান্ত সমাধানের' (just and final solution) ঘোষণাপত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ ও ভারতীয় সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল বলে কোন কোন মহলে ক্রিপ্‌সের খ্যাতি ছিল।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স যে ঘোষণাপত্রের খসড়াটি ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পেশ করেছিলেন তাতে দু'ধরণের প্রস্তাব ছিল। প্রথম প্রস্তাবে ভারতের ভবিষ্যত শাসন সংস্কার সম্পর্কে ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয়ের প্রতিনিধিদের পরামর্শ ও সহায়তা -গ্রহণ সম্পর্কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। (যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার

ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) দেবার কথা বলল। এই সঙ্গে ভারত ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার লাভ করতে পারবে। যুদ্ধ শেষ হবার পরেই একটি সংবিধান-প্রণয়ণ সভা (Constitution-making Body) গঠন করা হবে। এই সভার সদস্যরা ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যরা ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নিম্ন কক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে নির্বাচন নীতির পরিবর্তে মনোনয়নের কথা বলা হয়। সেই অনুযায়ী দেশীয় রাজন্যবর্গ রাজ্যসমূহের সদস্যদের সংবিধান-প্রণয়ন সভায় মনোনীত করবেন।

প্রস্তাবিত সংবিধান-প্রণয়ন সভা ভারতের জন্য যে সংবিধান রচনা করবে, ব্রিটিশ সরকার তা মেনে নেবেন এবং ভারতের সঙ্গে চুক্তি-আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তবে নতুন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে একটি শর্ত থাকবে, সেটি হল যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে ভারতীয় সংবিধানের বাইরে থাকতে পারবে এবং সরাসরি ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারবে। ভারতের যে কোন প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করে সেই সব অঞ্চলের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করতে পারবে। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যে সব আশ্বাস দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সংবিধান-প্রণয়ন সভার সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে।

ক্রিপ্‌সের দ্বিতীয় প্রস্তাবে যুদ্ধ চলার সময় ভারতীয়ের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য ব্রিটেনের চূড়ান্ত ক্ষমতা গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ চলার সময় কোন রকম শাসন সংস্কার বা সাংবিধানিক পরিবর্তন না করে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধোদ্যমে ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করবে।

ক্রিপ্‌স মিশনের প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত সযত্নে রচনা করা হয়েছিল। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ভেবেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভবিষ্যত ভারতের জন্য সংবিধান-প্রণয়ন সভা গঠনের ক্ষমতা লাভ করে ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করবে এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করবে অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসবে। তিনি মনে করেছিলেন মুসলিম লীগ প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান রচনার অধিকার লাভ করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাদাভাবে চুক্তি করবে। অর্থাৎ মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি ধর্মের

ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবে। দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গ নতুন সংবিধানের আওতার বাইরে থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পুরাণো চুক্তির শর্তগুলি মেনে চলবেন। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিশ্রুতি মত ন্যায়বিচার পালনের আশ্বাস দিলেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের পরিবর্তে ভারতীয়ের মধ্যে অসংখ্য বিভেদের বিষবৃক্ষ রোপন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোকে আরো মজবুত করতে চেয়েছিল।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের ঘোষণা পত্রটি ভারতীয় নেতাদের কাছে সামগ্রিক-ভাবে গ্রহণ অথবা বর্জনের জন্য রাখা হয়। ভারতের ভবিষ্যত শাসন সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন যুদ্ধ চলার সময় ভারতীয়ের সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে জাতীয় সরকার গঠনের উপর। জাতীয় সরকার গঠনের প্রশ্নে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব দেখালে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ভেঙ্গে যায়। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধ কালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে সরাসরি অস্বীকৃত হন। প্রকৃতপক্ষে ক্রিপ্স প্রস্তাব ছিল একটি সোনার পাথরবাটি। ১৯৪০-এ বড়লাটের দেওয়া আগস্ট প্রস্তাবের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল ক্রিপ্স পরিকল্পনায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০-এর প্রস্তাবটি ভারতের সর্বস্তরের জনমত প্রত্যাখ্যান করেছিল।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের সঙ্গে আলোচনাকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ বড়লাটের অধীনে যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকারে অংশগ্রহণে সম্মত হন। অবশ্য একটিমাত্র শর্তে তাঁরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সেটি হল জাতীয় সরকারকে প্রকৃত দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দিতে হবে। এই সরকারে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কে (Commander-in-Chief) একজন ক্যাবিনেট সদস্যরূপে কাজ করতে হবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমস্ত আশা এবং আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁদের বলা হল ভারতে ব্রিটিশের চরম ও একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা থাকবে। তবে একজন ভারতীয় প্রতি-রক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন যিনি শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর খাবার-দাবার ও সাজসজ্জার তদারকি করবেন। ক্রিপ্সের অনমনীয় মনোভাবে যুদ্ধ চলাকালীন সহযোগিতা ও জাতীয় সরকার গঠনের সমস্ত সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স-এর প্রস্তাবগুলি ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি

প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের মধ্যে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা লক্ষ্য করেছিল। সেজন্য এই প্রস্তাব কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, দেশীয় রাজ্যগুলির ন'কোটি জনসংখ্যাকে গণতন্ত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে চিরকালের মত বঞ্চিত করে রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিদের হাতে এই অঞ্চলগুলির চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস প্রবল প্রতিবাদ জানায়। তৃতীয়ত, যে কোন প্রদেশের পক্ষে ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে থাকার অধিকার দানের প্রস্তাবকে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে বলে মনে করেছিল। অবশ্য কোন অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই অঞ্চলকে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে কংগ্রেস আদৌ আগ্রহী ছিল না। মোট কথা, সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপ্‌স-এর ভবিষ্যত শাসন সংস্কারের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে।

মুসলিম লীগ তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রদেশগুলি ইচ্ছা মত ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে থাকতে পারবে এই প্রস্তাবকে মুসলিম লীগ স্বাগত জানায়। কারণ ভারতের যে সব প্রদেশ ও অঞ্চলগুলিতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা নিজেদের ইচ্ছা মত স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র গঠনের অধিকার পাবে এমন ইঙ্গিত ক্রিপ্‌স-এর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ লক্ষ্য করেছিল। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ক্রিপ্‌স-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। কারণ সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলিম লীগের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। ক্রিপ্‌স-এর প্রস্তাবের মধ্যে অনমনীয়তা ছিল বলে মুসলিম লীগ অভিযোগ করে। কারণ ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের পছন্দ মত রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের সুস্পষ্ট আশ্বাস দাবি করেছিল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ক্রিপ্‌স-এর প্রস্তাবগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে নি। হিন্দু মহাসভা ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে ভারত বিভাগের পূর্বাভাস বলে মনে করেছিল। ভারতের লিবারেল পার্টি ভারত বিভাগ পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী ছিল। হরিজন নেতা ডঃ আম্বেদকর ক্রিপ্‌স প্রস্তাবগুলির মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের রাজনৈতিক একাধিপত্য আরও বেড়ে যেতে পারে এই রকম আশংকা করলেন। শিখ নেতৃবৃন্দ ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী

প্রবণতা বেড়ে যাবে বলে মনে করলেন। ভারতীয় খ্রীশ্চান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের প্রতিনিধিরা ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে এই সব সংখ্যালঘু সমাজের জন্য যথেষ্ট সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই বলে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে গান্ধীজী, 'a post dated cheque on a failing bank' বলে বর্ণনা করেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতি আদৌ কার্যকর করা হবে কি না সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন ও জটিল অবস্থার মধ্যে পড়েও ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের যথার্থ সহযোগিতা পাবার কোন রাজনৈতিক আন্তরিকতা দেখায় নি। যুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রশ্নে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স সুস্পষ্ট-ভাবে বড়লাটের কর্মপরিষদের সম্প্রসারণের কথাই বললেন। যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠনে ক্রিপ্‌স অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালের প্রকাশিত তথ্যসমূহে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভ করার জন্য ব্রিটেনকে ভারতীয় নেতৃ-বৃন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক মীমাংসায় আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল ভারতে ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে জানান যে, ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ চলাকালীন রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানোর কোন আগ্রহ ছিল না। প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের যোগ্য দূত হিসাবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স শুধুমাত্র শূন্যগর্ভ আশ্বাস দেবার জন্য ভারতে এসেছিলেন। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ বড়লাটের অধীনে যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠনের মত ন্যূনতম রাজনৈতিক দাবিকে অস্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার নিজের অনিচ্ছা, দম্ভ ও অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

৪. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

ক পটভূমি

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের দূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স-এর আলোচনা ভেঙে গেলে ভারতের রাজনীতিতে হতাশার ছায়া নেমে আসে। যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠনের দাবি সরাসরি ক্রিপ্‌স অগ্রাহ্য করলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আলোচনা ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হয়। বড়লাটের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি অগ্রাহ্য করা হলে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ন্যূনতম দাবি মানতে প্রস্তুত নন।) এই সময় গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। (১৯৪১-এর শেষের দিক থেকে শুরু করে ১৯৪২-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদ থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে গান্ধীজী যুদ্ধবিরোধী গণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই 'ভারত ছাড়ো' রাজনৈতিক ধ্বনি দিয়ে গণ-আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্বে অবতীর্ণ হন।)

'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় গান্ধীজী তাঁর যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪২-এর এপ্রিলে তিনি লিখেছিলেন, 'সময়মত সুশৃংখলভাবে ভারত ত্যাগ করলেই ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ হতে পারে।' তিনি আক্রমণমুখী জাপানের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সর্বতোভাবে অহিংস অসহযোগিতা প্রদর্শনের জন্য উপদেশ দেন। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় বহু লক্ষ ভারতবাসীকে জীবন দানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জওহরলাল নেহেরু প্রথম দিকে যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি স্বৈরতান্ত্রিক অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মিত্রশক্তিকে সহায়তাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪২-এর মে মাসে গৃহীত সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে ভারতের স্বার্থ সমেত ব্রিটেনের নিরাপত্তা এবং বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগের জন্য বলা হয়। কারণ স্বাধীনতা অর্জনের দাবির ভিত্তিতেই ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই প্রস্তাবে জাপানের আক্রমণ মুখীনতার কোন উল্লেখ ছিল না। অবশ্য ভারত আক্রান্ত হলে অহিংস অসহযোগিতা দিয়ে তার মোকাবিলা করার কথা বলা হয়।

ক্রিপ্‌স জাতীয় দাবি গ্রহণে সরাসরি অস্বীকৃত হলে মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রভাবশীল কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ সমেত ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকারের ভিত্তিতে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবে ধর্মের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি স্বীকারের উপর

জোর দেওয়া হয়। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রকাশ্যে জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব এবং তাঁর 'ভারত ছাড়ো' নীতির সমালোচনা করেন।

১৯৪২-এর মে-জুন 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় গান্ধীজী যুদ্ধকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও 'ভারত ছাড়ো' নীতি সম্পর্কে তাঁব মতামত প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন, ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করবে। ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করলে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হতে পারে। ব্রিটেন ভারত ত্যাগের পরেও জাপান আক্রমণ করলে স্বাধীন ভারত আরো ভালোভাবে আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারবে। অবশ্য অহিংস অসহযোগিতাকেই তিনি আক্রমণ প্রতিরোধের মোক্ষম অস্ত্র বলে মনে করতেন।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের পর গান্ধীজী গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। ক্রিপ্‌স মিশনের ব্যর্থতার পর গান্ধীজী পুনরায় গণ-আন্দোলন পরিচালনার কথা ভাবতে শুরু করলেন। দশ বছর গঠনমূলক কর্মসূচী পরিচালনার পর তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতিতে গণ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনের অধীনে অপেক্ষা করার পর আর বেশি অপেক্ষা করার সার্থকতা নেই। সেজন্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে তিনি ভারতীয়দের ব্রিটিশের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করার জন্য উপদেশ দেবার কথা ভাবলেন। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা বললেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের এমন কোন আন্দোলন পরিচালনা করা উচিত নয় যা জাপানী সামরিকবাদকে উৎসাহিত করবে। গান্ধীজী বলেছিলেন যে, ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করতেই হবে। সেক্ষেত্রে জাপান ভারত আক্রমণ করবে না। তৎসত্ত্বেও জাপান ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয়রা সর্বশক্তি দিয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করবে।

গান্ধীজী মনে করতেন ব্রিটিশ শক্তি তাঁর আন্দোলন পরিচালনার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, গণ-আন্দোলন পরিচালনার সুস্পষ্ট কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি কি ভেবেছেন? গান্ধীজী তাঁকে কোন সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন নি। আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনীতে জানা যায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচী ছিল না। অবশ্য গান্ধীজী জানিয়েছিলেন যে, ১৯৪২-এর আন্দোলনে ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার পরিবর্তে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করবে। গান্ধীজী মনে করতেন যুদ্ধের সংকটজনক অবস্থায় ব্রিটিশ শক্তি এমন কিছুই করবে না যাতে ভারতের রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সেজন্য তিনি আন্দোলনের সুস্পষ্ট কর্মসূচী ভেবেচিন্তে ঠিক করবেন। কারণ রাজনৈতিক উত্তেজনা যেমন সৃষ্টি হবে ঠিক সেই অনুযায়ী তিনি আন্দোলনের কর্মসূচী রচনা করবেন। অর্থাৎ প্রাচ্যের যুদ্ধ যেহেতু ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত এসে গেছে সেজন্য আন্দোলন শুরু করলেই ব্রিটিশ শক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় আসবে। অবশ্য গান্ধীজী পরিচালিত অতীতের সমস্ত গণ-আন্দোলনের মত ১৯৪২-এর প্রস্তাবিত গণ-আন্দোলনটি সম্পূর্ণ অহিংস অসহযোগিতার আন্দোলন হবে বলা হল। গান্ধীজী সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া অন্য সকল প্রকার আন্দোলনের পদ্ধতি গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে ব্রিটিশ শক্তি সরে আসার ফলে এইসব অঞ্চলগুলি জাপানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছিল। পূর্ব সীমান্তে জাপানী শত্রু পক্ষ যদি ভারত আক্রমণ করে এই আশংকায় নদীপথে চলাচলের উপযোগী ছোট ছোট নৌকা ধ্বংস করে দেওয়া হল। মালয় ও বর্মায় যা ঘটেছে ভারতেও যাতে তা না ঘটে সেজন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এই সময় গান্ধীজীর প্রস্তাবিত 'ভারত ছাড়ো' নীতি কার্যকর করা সমীচীন হবে কি না সে সম্পর্কে অনেক নেতা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। জওহরলাল নেহেরু ভেবেছিলেন, এ অবস্থায় দেশে যদি গণ-অভ্যুত্থানের ধ্বনি দেওয়া হয়, তা হলে ফ্যাসিবাদীদের হাতে মিত্রশক্তির হয়তো পরাজয় ঘটতে পারে। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে গণ-আন্দোলন তীব্রতর করলে ভারতকে হয়তো স্বাভাবিকভাবে রাশিয়া ও চীনের পক্ষ বর্জন করতে হতে পারে।

খ. আগষ্ট প্রস্তাব : 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ

১৯৪২-এর ১৪ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে একটি দীর্ঘ

প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সে প্রস্তাবটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই প্রস্তাবকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমটি প্রস্তাবনার অংশ এবং দ্বিতীয়টি কর্মপ্রণালী নির্দেশের অংশ। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান দরকার। ব্রিটিশ শাসনের অবসান শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থে প্রযোজনীয় তাই নয় সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তা এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, সামরিকবাদ এবং সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিগুলির উপর আক্রমণ প্রতিহত করার স্বার্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়া দরকার। এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ শক্তি ভারত ত্যাগ করলে অস্থায়ী জাতীয় সরকার এবং সংবিধান-প্রণয়ন সভা গঠনের কথা বলা হয়। এই সঙ্গে এই প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, কংগ্রেসের ব্রিটেন অথবা মিত্রশক্তিকে বিব্রত করার আদৌ কোন ইচ্ছা নেই। অক্ষ-শক্তির আক্রমণমুখী নীতিগুলির উপর কংগ্রেসের কোন সহানুভূতি নেই। জাপানী আক্রমণ অথবা যে কোন আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য মিত্রশক্তি যদি ভারতের অভ্যন্তরে সামরিক ঘাঁটি রাখতে চায় সেক্ষেত্রে কংগ্রেস সেটি অনুমোদন করতে পারে।

প্রস্তাবের কর্মপ্রণালী নির্দেশের অংশে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার ওয়ার্কিং কমিটির দাবি অগ্রাহ্য করলে কংগ্রেস নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৯২০ থেকে যে ধরণের অহিংস আন্দোলন চালিয়ে এসেছে ঠিক সেই ধরণের আন্দোলন পরিচালনায় বাধ্য হবে। কারণ রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতার মূল নীতিকে কার্যকর করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। এই ধরণের ব্যাপক গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবেন মহাত্মা গান্ধী। ব্যাপক গণ-সংগ্রাম সম্পর্কে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

গান্ধীজীর বিশেষ দূত হিসাবে মিস্ স্লেড দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তিনি বড়লাটকে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব এবং প্রস্তাবিত আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। প্রস্তাবের বক্তব্যে বিদ্রোহের হুমকি দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে বড়লাট মিস্ স্লেডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃত হলেন। কারণ যুদ্ধ চলাকালীন অহিংস অথবা সহিংস বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকার বরদাস্ত করবেন না। গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব উপলব্ধি করলেন। এ সত্ত্বেও তিনি মনে করেছিলেন ব্রিটিশ রাজ-শক্তি কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।

১৯৪২-এর ৭ই আগস্ট সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি মিলিত হয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে অহিংস গণ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব

গ্রহণ করে।) প্রস্তাবে বলা হল: কংগ্রেসের সংগঠনকে কাজ করতে না দেওয়া হলে অথবা কংগ্রেস কমিটি কর্মপ্রণালীর নির্দেশ দিতে না পারলে স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসী দেশের মুক্তির জন্য নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় (গান্ধীজী ঘোষণা করলেন) পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করবে না। তিনি বললেন: ('We shall do or die. We shall either free India or die in the attempt'. গান্ধীজীর সুবিখ্যাত 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনিটি এই সময় উচ্চারিত হয়েছিল।)

(আগস্ট প্রস্তাবে ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্যদানের অঙ্গীকার ছিল, আর ছিল সরকারের প্রতি আহবান যাতে তারা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।) প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হয়েছিল: 'যে জাতি আজ সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিজের সংকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে ব্রতী, তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা আর কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। ·ব্যাপকভাবে অহিংস গণ-আন্দোলনকে পরিচালিত করার যে সংকল্প···কমিটি আজ তাকে অনুমোদন করার প্রস্তাব নিচ্ছে ··এ সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজী।' প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর গান্ধীজী কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'প্রকৃত সংগ্রাম যে এই মুহূর্তেই শুরু হচ্ছে তাই নয়। আপনারা আমার হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন; সেই ক্ষমতার ভিত্তিতে আমার প্রথম কাজ হল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করা। এ কাজে দু সপ্তাহ এমনকি তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। ততদিন আপনারা কি করবেন? ·· আপনাদের প্রত্যেককে এখন থেকে মনে করতে হবে যে আপনারা মুক্ত···মনে রাখতে হবে আপনারা সাম্রাজ্যবাদের পদানত নন।'

(৮ই আগস্টের মধ্যরাত্রে) গান্ধীজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজী আটক রইলেন, অন্য নেতাদের আটক রাখা হল আহমেদনগর দুর্গে। এক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস সংগঠনের সব নেতাকে কারারুদ্ধ করা হল। (সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি সমেত সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা হল। এলাহবাদের কংগ্রেস সদর দপ্তরে পুলিশ মোতায়েন করে কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হল।)

৯ই আগস্ট গান্ধীজী সমেত সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশিত হয়।) (স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সভা সমিতি, শোভাযাত্রা এবং হরতালের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের মানুষ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। ভারত প্রতিরক্ষা আইনের বলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। নেতাদের মুক্তির দাবিতে জনতা বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। যেখানেই জনতা সরকারী আদেশ মেনে নিতে বা ছত্রভঙ্গ হতে অস্বীকার করল সেখানে চলল পুলিশের গুলিবর্ষণ।

উত্তেজিত জনতা চলন্ত রেলগাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করল এবং রেলস্টেশন তছনছ করে সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিল। রেলের লাইন তুলে ফেলে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল। সরকারী গাড়ি এবং খাদ্যশস্যের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিল। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের সামনে উত্তেজিত জনতা সহিংস পাল্টা আক্রমণ চালালো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা ভারতের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাহিরে চলে যায়। কংগ্রেসের নেতারা তখন সবাই কারারুদ্ধ। উত্তেজিত জনতাকে পরিচালনা করার মত কোন দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতা তখন বাইরে ছিলেন না। কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্যের ডাক দেওয়ার আগেই নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হয়ে যান।

ছোট ছোট প্রতিরোধ ও সংগ্রাম হিসেবে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল খুব দ্রুত তা বিশাল গণ সংগ্রামে পরিণত হল। এই গণ-সংগ্রামকে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করা যায়। দক্ষিণ ভারতে সুদীর্ঘ ১৩০ মাইল রেলপথ উপড়ে ফেলা হয় এবং বিহারের মুঙ্গের জেলাকে দু'সপ্তাহের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হয়। সমগ্র বিহার প্রদেশে রেল চলাচল ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। কলকাতায় ট্রাম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা হয়। সরকারি অফিস আদালত সমেত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলেছিল ধর্মঘট। আগস্ট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ভারতের ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকেরা। সর্বত্র স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা হরতাল পালন করে। গ্রামেগঞ্জে কৃষকরা স্থানীয় বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেক অঞ্চলে কৃষকেরা নিজেরাই বিকল্প সরকার গঠন করে। বালিয়ায় স্থানীয় নেতারাই শহরের কর্তৃত্ব দখল করে নেন। সুতাহাটা, সাতারা ও কর্ণাটকে কৃষকেরা গেরিলা সংগ্রাম শুরু করে। মেদিনীপুর জেলার বহু অঞ্চল সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়।

আগস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণের মধ্যেও। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বল্পস্থায়ী এই গণ-অভ্যুত্থানকে ব্রিটিশ রাজশক্তি অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করেছিল। সারা ভারতকে প্রায় একটি বিশাল জেলখানায় পরিণত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিরস্ত্র জনতার উপর এরোপ্লেন থেকে মেশিনগানে গুলিবর্ষণ করা হয়। ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানের পর সারা ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে সরকারি দমননীতির এ রকম হিংস্র প্রকাশ আর কখনও দেখা যায় নি। প্রায় দশ হাজার মানুষ ব্রিটিশের অত্যাচার ও গুলিবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছিল। শাস্তিমূলক জরিমানা ও সম্পত্তি ক্রোক প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি হিসাব অনুসারে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ষাট হাজারের বেশি।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা সেই সময়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৪২-এ জনতা যখন স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করে তখন এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বৈপ্লবিক দলের কর্মীরা এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, নরেন্দ্র দেও, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ আলী, যোগেশ চ্যাটার্জী প্রমুখরা আত্মগোপন করে এই আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন। এ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করে সফল করার মত শক্তি জনতার ছিল না। তার কারণ, আন্দোলন সশস্ত্র আকার ধারণ করলেও এই সশস্ত্র আন্দোলন চালাবার মত দক্ষতা, সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র জনতার ছিল না। এ সত্ত্বেও কয়েক মাস সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল। প্রবল সরকারি নিপীড়ন ও আক্রমণের ফলে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত গণসংগ্রাম অচিরে স্তিমিত হয়ে যায়।

গ. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মূল্যায়ন

গান্ধীজীর নেতৃত্বে গৃহীত আগস্ট প্রস্তাব ও গণ-আন্দোলনের সময়কালটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিপ্‌স মিশনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভারতে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনাটি ভেঙে যাওয়ার অর্থ হল সাংবিধানিক উপায়ে ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সমস্ত সম্ভাবনা সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। সেজন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্যকরূপ মোকাবিলা করতে ওয়ার্কিং কমিটি ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর মত ১৯৪২-এ গান্ধীজীকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করল। 'ভারত ছাড়ো'

প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই গান্ধীজী সমেত সমস্ত প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁরা যদি গ্রেপ্তার না হতেন তাহলে গণ-সংগ্রামের কি কর্মসূচী গ্রহণ করতেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ ছিল না। অবশ্য গান্ধীজীর কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছিল যে, তিনি ১৯২০-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মত গণ-সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখল। তাঁকে যদি গ্রেপ্তার না করা হত তাহলে গণ-আন্দোলনের চেহারা কি হত এবং তিনি কি ধরণের নেতৃত্ব দিতেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির ছিল না।

আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের সময় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীজী যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে কার্যকর করার জন্য সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা তিনি বলেন নি। তাঁর ভাষণের বেশির ভাগ অংশেই হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে কংগ্রেসের দৃষ্টিভাঙ্গী কি হবে তার উল্লেখ ছিল। তিনি তাঁর 'Do or Die' বা 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনিতে সবাইকে সাড়া দিয়ে বিরাট আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। কিন্তু দেশবাসী কি করবেন সে সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা বললেন না। তিনি সাংবাদিক, রাজন্যবর্গ, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী এবং ছাত্রদের 'ভারত ছাড়ো' সংগ্রামে সামিল হবার জন্য বিশেষভাবে আহবান জানালেন। ভারতের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ হল শ্রমিক ও কৃষক। গান্ধীজী শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি কোন আহবান জানান নি।

গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জন্য আন্দোলন পরিচালনায় 'খসড়া নির্দেশনামা' (draft instructions) প্রস্তুত করেছিলেন। এই নির্দেশনামা খসড়াই থেকে যায়। কারণ এগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও প্রচারিত হয় নি। খসড়া নির্দেশনামায় একদিনের জন্য হরতাল পালনের কথা বলা হয়। হরতালের দিন কোন শোভাযাত্রা বা সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হবে না। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ভারতীয়রা প্রার্থনা ও উপবাস করবেন। অবশ্য গ্রামাঞ্চল শান্তিপূর্ণ থাকায় গান্ধীজী সেখানে সভাসমিতির অনুমতি দিয়েছিলেন।

আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের সময় গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ বিরোধী গণ-আন্দোলন বেশিদিন পরিচালনার দরকার হবে না। কারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ভারতের রাজনৈতিক

অচলাবস্থার অবসানে বাধ্য করবে; অল্পদিনের মধ্যেই সরকারি প্রশাসন অচল হয়ে পড়বে এবং সরকারি ও সেনাবাহিনী শুধুমাত্র 'ন্যায্য নির্দেশ' পালন করা শুরু করলে যুদ্ধোদ্যোগ ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে যে মিত্রশক্তি ব্রিটেনের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করবে। এই চাপের ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় দাবির কাছে নতি স্বীকার করবে।

আগস্ট প্রস্তাব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরেই দেখা গেল ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে গান্ধীজীর আশা সঠিক প্রমাণিত হল না। সারা ভারতের গণ-আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসন যন্ত্রকে এমনভাবে অকেজো করতে পারল না যাতে মিত্রশক্তিবর্গ প্রবল চাপ সৃষ্টি করে ভারতীয়ের রাজনৈতিক দাবি গ্রহণে ব্রিটেনকে বাধ্য করতে পারে। অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, চীনের চিয়াংকাইশেক ভারতের রাজনৈতিক দাবি বিবেচনা করার জন্য ব্রিটেনকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এই অনুরোধের প্রতি কোন সম্মান দেখান নি। গান্ধীজীর জীবনীকার টেণ্ডুলকর লিখেছেন: 'সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করার সকল প্রকার অহিংস ও সহিংস আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার প্রায় দমন করতে সফল হল।'

১৯৪২-এর সংগ্রামী গণ-আন্দোলনের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন যে, সংগঠন ও সমন্বয়ের অভাবেই এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। তিনি বলেছেন: 'গণ সংগ্রাম যখন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময় কংগ্রেসের কোন কোন মহলে বিতর্ক চলছিল যে জনতা যা করছে সেগুলি কংগ্রেসের কর্মসূচী অনুযায়ী হচ্ছে কি না।' পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারিভাবে ৯ই আগস্ট থেকে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে জহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থ যৌথভাবে বিবৃতি দিয়ে বললেন: 'No movement had been officially started by the AICC or Gandhiji.'

১৯৪২-এর গণ-আন্দোলন অসফল হলেও এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই আন্দোলন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের রাজনৈতিক দৃঢ়তাকে প্রকাশ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতীয়রা সর্বপ্রকার আত্মত্যাগে প্রস্তুত আছে এ কথাই আগস্ট আন্দোলন প্রমাণ করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে এ কথা অনুভব করতে পারে। সেজন্য

দেখা যায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পাঁচ বছর পরেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারত ত্যাগ করে।

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পরিকল্পনায় গান্ধীজী এক নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। গত ২২ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ১৯৪২-এ সর্বপ্রথম গান্ধীজী জনতার সহিংস আন্দোলনের প্রবণতাকে নিন্দা করলেন না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় চৌরি-চৌরার ঘটনায় পর তিনি জনতা হিংসাশ্রয়ী হয়েছে সেজন্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। ১৯৪২-এ তিনি সরকারের 'leonine violenc.'-এর বিরুদ্ধে জনতার 'mob violence'-কে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করলেন। গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন ধরণের গণ-উদ্যোগ, গণ-সমাবেশ এবং সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আন্দোলন চালাতে গিয়ে জনতা যদি অহিংস নীতি থেকে সরে আসে সেক্ষেত্রে তিনি কিছু মনে না করার কথা বলেছিলেন। অবশ্য আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের কথা তখনও তিনি ভাবেন নি।

৫. আজাদ হিন্দ ফৌজ

ক. পটভূমি

১৯২৯ সাল থেকে সুভাষচন্দ্র বসু আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী করে আসছিলেন। অবশেষে তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণী ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু দিয়ে বাস্তবায়িত হল।' ১৯৪০-এর মধ্যভাগ থেকে সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে গিয়ে বৈদেশিক সাহায্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার কথা ভাবেন। কারণ গান্ধীজীর অহিংস রাজনৈতিক মতাদর্শে তাঁর আস্থা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তিনি মিঞা আকবর শাহ এবং আচ্ছার সিং ছিমার সঙ্গে পরামর্শ করেন। ১৯৪০-এর আগস্টে তিনি গোপনে ভারতের বাইরে যান নি। যদিও গোপন পথে যাবার সম্ভাব্য আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েক মাস পরে তিনি যখন গোপনে ভারত ত্যাগ করেন। সে সময় পাঞ্জাবের আকবর শাহ এবং আচ্ছার সিং ছিমা তাকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রকে গোপন পথে ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে ভগতরাম তলোয়ারের ভূমিকা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগতরাম তলোয়ার তাঁর 'The Talwars of Pathanland and Subhas Chandra's Great Escape' শীর্ষক পুস্তকে

কেমনভাবে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের বাইরে চলে গেলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৪১-এর জানুয়ারির মধ্যভাগে সুভাষচন্দ্র ভারতের উত্তর-পশ্চিমের উপজাতি অঞ্চলগুলি পেরিয়ে কাবুলে পৌঁছান। প্রায় দু'মাস কাবুলে অবস্থানের পর মস্কো শহরের মধ্য দিয়ে বার্লিনে আসেন। তার ধারণা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির জয় অনিবার্য। সেই সময় নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) বলবৎ থাকায় সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য তিনি হয়তো পেতে পারেন।

১৯৪০-এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের জেলে বিনা বিচারে আটক থাকা-কালীন আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। ছ'দিন অনশন ধর্মঘট চলার পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কঠোর পুলিশ প্রহরায় তাঁর নিজের গৃহে অন্তরীণ রাখে। ১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারি ভোর বেলায় তিনি মুসলমান মৌলবীর ছদ্মবেশে নিজের গৃহ ত্যাগ করেন। রাজদ্রোহের অপরাধে নির্দিষ্ট বিচারের দিনে জানা গেল সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ গোয়েন্দার ধরাছোঁয়ায় বাইরে চলে গেছেন। কাবুলে তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদের সক্রিয় সহায়তা পান। কাবুল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন স্বল্প সময়ের জন্য। সেখান থেকে এরোপ্লেনে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এ ২৮শে মার্চ বার্লিনে পৌঁছান।

সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিনে পৌঁছান সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়ংকর আকার ধারণ করতে চলেছিল। এই বছরের জুন মাসে যুদ্ধের সমস্ত নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালায়। মিত্রশক্তির পক্ষ হয়ে ভারতীয় সৈনিকরা উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। অক্ষশক্তিবর্গ ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে মোকাবিলা করছিল। এই সময় সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছান এবং প্রথমেই হিটলারের বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাত করে আলাপ-আলোচনা করেন।

সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে দু'বছর (১৯৪১-৪৩) অবস্থান করে ফ্যাসিবাদের কার্য-কলাপ স্বচক্ষে দেখেন। প্রথমদিকে তিনি একাই ছিলেন। তাঁর না ছিল অর্থ-সম্পদ, না ছিল সামরিক সংগঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জটিল পরিস্থিতিকে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজে লাগানোর কোন আয়োজন তখনও পর্যন্ত ছিল না। তিনি কখনই জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি এবং ইরাকের রশিত আলির মত নাৎসী পুতুলে নিজেকে পরিণত হতে দেন নি। সুভাষচন্দ্র নাৎসী পুতুলদের

ন্যক্কারজনক ভূমিকা সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি বার্লিনে পৌঁছানোর পরেও হিটলার ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠনে অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক মনোভাব দেখান। তিনি বলেছিলেন: Indians 'cannot kill a louse (and) won't kill an Englishman either.' ১৯৪২-এর মে মাসের শেষের দিকে বহু প্রতীক্ষার পর সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রথম সাক্ষাতে হিটলার বিশ্বের একটি মানচিত্র দেখিয়ে সুভাষচন্দ্রকে যুদ্ধরত ফ্যাসিস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের বিশাল দূরত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ হিটলার সুভাষচন্দ্রের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভারত ঘোষণার সংকল্পকে অবদমিত করেতে চেয়েছিলেন।

অক্ষশক্তিবর্গ ভারতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট আশ্বাস সুভাষচন্দ্রকে দিতে পারে নি। ১৯৪১-এর জুনে সুভাষচন্দ্র রোমে গেলে তিনি সেখানকার নেতৃবর্গকে ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব দেন। স্বাধীন ভারত সরকার গঠন; যুদ্ধে অক্ষশক্তিবর্গের জয় হলে ভারতকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কে সুস্পষ্ট চুক্তি সম্পাদন এবং স্বাধীন ভারত বেতার তরঙ্গ প্রতিষ্ঠাব মাধ্যমে ভারতের উদ্দেশ্যে প্রচার অভিযান চালানোর সুযোগ দান। ১৯৪২-এর মে মাসে সুভাষচন্দ্র পুনরায় অনুরূপ আবেদন জানালে হিটলার এই আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য ফ্যাসিবাদীদের স্বার্থে বার্লিন থেকে বেতার প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রচারকার্য চালাতে সুভাষচন্দ্রকে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে জার্মানী থেকে 'আজাদ হিন্দুস্থান' বেতারের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র প্রচার কার্য শুরু করেন। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের অজান্তে তাঁর প্রচারিত ভাষণগুলিব উপর নাৎসী কর্তৃপক্ষ কঠোর তদারকি চালায়।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কর্মতৎপরতা শুধুমাত্র 'আজাদ হিন্দ' বেতাব তরঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি উত্তর আফ্রিকা থেকে আন্নাবার্গ শিবির পর্যন্ত ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে একটি আজাদ হিন্দ সেনা-বাহিনী গঠনের কথা ভাবেন। তিনি ১৯৪২-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ৪,০০০ ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে স্বতন্ত্র ভারতীয় ফৌজ (Indian Legion) গঠন করেন। নবগঠিত ভারতীয় ফৌজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য তিনি লম্ফমান ব্যাঘ্রের (Springing Tiger) প্রতীককে সামরিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেন। ভারতীয় ফৌজ গঠন ও পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত আর্থিক সংকটে পড়তে হয়। জার্মানীর বৈদেশিক বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ প্রয়োজনের

তুলনায় খুবই অল্পই ছিল। সুভাষচন্দ্রের মত ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতার পক্ষে নাৎসী হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়া সম্ভব ছিল না। সেজন্য তাঁকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর নবগঠিত ভারতীয় ফৌজকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাঁরা যেন কখনও অস্ত্র না ধরেন। জার্মানী ত্যাগ করার প্রাক্কালে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিমুখে সাবমেরিণ যোগে যাত্রার সময় তিনি ভারতীয় ফৌজকে শুধুমাত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা তথ্যে জানা যায়, সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতীয় ফৌজের সৈনিকরা পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হলে ১০ জন সৈনিককে সামরিক আদালতের বিচারে নাৎসীবাহিনী হত্যা করে। শুধু তাই নয়, তিনি 'আজাদ হিন্দ' বেতার তরঙ্গে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারকার্য করতে দেন নি।

জার্মানীতে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র বার্লিনের 'আজাদ হিন্দ' বেতার মারফত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর কঠোর আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'সারা জীবন আমি ভারতের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাই থাকব। ভারতের প্রতি, শুধুমাত্র ভারতেই আমার আনুগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অটল থাকবে।' নাৎসী জার্মানীতে বসে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি শুধুমাত্র ভারতের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রচার করতেন। আজাদ হিন্দ বেতার মারফত ভারতবাসীকে 'জয় হিন্দ' সম্বোধনে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করেন।

সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নিতান্ত স্বল্পকালের জন্য অনাক্রমণ চুক্তির শর্তগুলি মেনে চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংকটকে তীব্রতর করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ এবং ধ্বংস করাই ছিল নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ১৯৪১-এর জুন মাসে আকস্মিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে নাৎসী শক্তি তার স্বরূপ প্রকাশ করে। বিশ্ব ফ্যাসীবাদী শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় সারা বিশ্বে পরাধীন জাতিগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভকে ত্বরান্বিত করবে এ ধারণা

সুভাষচন্দ্র তখনও করতে পারেন নি। ফ্যাসিবাদের পরাজয় ভারত সমেত সারা বিশ্বের পরাধীন জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্রতর করেছিল। নাৎসী জার্মানীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ঠিক পাশাপাশি এশিয়ায় জাপানী সামরিক-ফ্যাসিবাদী অগ্রগতির সঠিক রাজনৈতিক তাৎপর্য সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন নি।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদী শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন নি। অত্যন্ত কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি সর্বতোভাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। জার্মানীতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি স্বাধীনভাবে রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করার চেষ্টা করলে নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গ তাঁকে চরম অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করে।

সুভ্যষচন্দ্র ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক অভিযান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তিনি নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ঠিক অনুরূপ-ভাবে নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গ সুভাষচন্দ্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের ফ্যাসিবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বার্লিনে আসার পর থেকেই সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে নাৎসী শক্তি তাঁর বেতার বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা এবং গতিবিধির উপর কঠোর গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে। হিটলারের উগ্র-জাতিবিদ্বেষ, ব্রিটেনের সঙ্গে আলাদাভাবে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা এবং ভারতের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণায় আপত্তি সুভাষচন্দ্রের মনে প্রবল বিরক্তির ভাব জাগিয়েছিল।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে সুভাষচন্দ্র সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আজাদ হিন্দ বেতার তরঙ্গে বললেন ঃ 'সিঙ্গাপুরের পতনের অর্থ হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ও প্রতিমূর্ত অন্যায়মূলক শাসনের অবসান, যা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।' ১৯৪২-এর মধ্যভাগ থেকে তিনি জাপানে যাবার পরিকল্পনা করেন। যুদ্ধ চলাকালীন সড়কপথে জাপানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ইতালির সামরিক অধিনায়করা বিমান পথে জাপানে নিয়ে যেতে রাজী না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র সাবমেরিণ যোগে সমুদ্রপথে গন্তব্য স্থানে যাওয়া মনস্থ করলেন। নাৎসী-ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গ সুভাচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী হয়। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য সুভাষচন্দ্রের জাপানে যাওয়ার

প্রস্তাবে তারা সম্মত হয়। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র জার্মানী থেকে জাপান অভিমুখে তাঁর ঐতিহাসিক সাবমেরিণ যাত্রা শুরু করেন। সহযাত্রী রূপে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবিদ হাসান। প্রায় সাড়ে চার মাস সাবমেরিন যাত্রার পর তিনি উত্তর সুমাত্রায় পোঁছেছিলেন।

জার্মানী থেকে সাবমেরিন যাত্রার বহুকণ্ট ভোগ করে জাপানে এসে সুভাষচন্দ্র কিছুটা মুক্তির আস্বাদ পান। কারণ জাপান মুখ্যত এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাপান ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ফ্যাসিবাদী-সামরিকবাদী জাপানের সঙ্গে বিশ শতকের প্রথম দশকের জাপানের কোন মিল ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে জাপানের অগ্রগতি ও সাফল্য সুভাষচন্দ্রের মনে আশার সঞ্চার করে। তিনি ভেবেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক অভিযানে সাফল্য লাভ করতে হলে জাপানের সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। তিনি জাপানের চীন আক্রমণকে সমর্থন করেন নি। অবশ্য তিনি চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান নি। সামরিক কারণে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানকে ব্যবহার করার জন্য তিনি বোধ হয় প্রতিবাদ জানান নি।

পূর্ব-এশিয়ায় পদার্পণের পর থেকেই সুভাষচন্দ্র শুধুমাত্র ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারলেন না। তিনি জাপানের যুদ্ধ লক্ষ্যের সঙ্গে নিজের লক্ষ্যের অভিন্নতা ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে ১৯৪৩-এ ঘোষিত জাপানকে সমর্থনের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি যথার্থ সৈনিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জাপানের সহায়তা চেয়েছিলেন। সৈনিকের কাছে যুদ্ধে জয়লাভই একমাত্র লক্ষ্য। সুভাষচন্দ্র সৈনিকের মত যে কোন উপায়ে তাঁর একমাত্র কাম্য ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হতে চেয়েছিলেন। বিশ্ব শক্তির ভারসাম্য কোন দিকে যাচ্ছে বা কোথায় দাঁড়াবে সে সম্পর্কে তিনি মনঃসংযোগ করেন নি।

১৯৪৩-এর জুন মাসে ঐতিহাসিক বেতার ভাষণে তিনি ভারতীয়দের বলেছিলেন যে, অক্ষশক্তি বর্গকে তাঁরা যদি বিশ্বাস না করেন তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভারতবাসীকে তাঁর উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে হবে। কারণ সাম্রজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ শক্তি তাঁকে পরাজিত করতে পারে নি। অতএব অক্ষশক্তিবর্গ তাঁকে চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে কখনই সরিয়ে আনতে পারবে না।

খ সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

১৯৪২-এর জুন মাসের প্রথমদিকে সারা পূর্ব-এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়-দের প্রতিনিধিরা রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ব্যাংকক সহরে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। জাপানীদের সমর্থনে গঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের (Indian Independence League) সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু। এই সংঘ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে আসার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army) গঠিত হয়। মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার বহু ভারতীয় সৈনিককে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে এবং ব্রিটিশ শক্তি পশ্চাদপসরণ করলে প্রায় ২০,০০০ ভারতীয় সৈনিক এবং অফিসাররা জাপানীদের সামরিক কর্তৃত্বে চলে যায়। জাপানীরা আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈনিক ও অফিসারদের ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে তুলে দেয়। মোহন সিংকে ভারতীয় সৈনিকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করা হয়।

এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। অতি শীঘ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ সারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তারুণ্যমণ্ডিত গতিশীল নেতৃত্বে ৩০,০০০ সৈনিকের তিনটি সামরিক বিভাগ গড়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের জাপানে আগমনের আগে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন গতিশীলতা ছিল না। সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এলে সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজে নতুন উৎসাহ, প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দিককার অধিনায়ক ক্যাপটেন মোহন সিং জাপানীদের সঙ্গে তীব্র বিবাদ শুরু করলে শেষ পর্যন্ত তিনি জাপানী সামরিক বাহিনীর কাছে গ্রেপ্তার হন।

জাপানীদের সামরিক দম্ভের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি। অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ রাসবিহারী বসুর পক্ষে সুস্থ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমনের পর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতৃত্ব প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। জাপানের পার্লামেন্টে (Die') তোজো ব্রিটেনকে ভারত থেকে বিতাড়িত করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সহায়তা করার আশ্বাস দেন। ১৯৪৩-এর জুলাই

মাসের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান হলেন। তিনি সারা বিশ্বকে জানালেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। সামরিক বিদ্রোহ পরিচালনা করে ঐতিহাসিক লাল কেল্লা দখল করার জন্য 'চলো দিল্লী' রণধ্বনি দিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজকে সামরিকভাবে সংগঠিত ও সুসজ্জিত করার জন্য সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন, ব্যাংকক, সায়গন প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে অর্থ সংগ্রহ ও জনসমর্থনের জন্য বিরামহীন ভ্রমণ করেন। ১৯৪৩-এর আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্র বিশেষ আদেশ বলে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক অধিনায়ক আজাদ হিন্দ ফৌজকে শুধুমাত্র প্রচার ও নাশকতামূলক কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেন। সুভাষচন্দ্র সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে পরীক্ষামূলকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সমরাঙ্গনে লড়াই চালানোর সম্মতি দেওয়া হয়।

১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করেনঃ 'The provisional government is entitled to and hereby claims the loyalty of every Indian'. ২৩শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকার ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অতি দ্রুত জাপান এবং জাপানের কুক্ষিগত মাঞ্চুকুয়ো, নানকিন-চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন্স সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করে নেয় এবং হিটলারের জার্মানী অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারকে ব্রিটিশ অধিকারমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলির পরিচালনা ও প্রশাসনের ভার অর্পণ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটিকে সুভাষচন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য জাপানের ছিল না।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসন সুভাচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারের হাতে অর্পণ করার যে আশ্বাস প্রধান মন্ত্রী তোজো দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জাপানের নৌ কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয়দের হাতে সম্পূর্ণভাবে এই দ্বীপপুঞ্জগুলির প্রশাসন ছেড়ে দেওয়া হল না। অবশ্য

সুভাষচন্দ্র আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নতুন নামাকরণ করলেন যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপপুঞ্জ। নেতাজীর ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আন্দামানকে আজাদ হিন্দ ভূখণ্ডে পরিণত করা গেল না। জাপানী ফ্যাসিবাদী শক্তি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল তার স্মৃতি স্থানীয় জনগণ আজও বহন করে। সুভাষচন্দ্রকে গোপন করেই জাপানী সামরিক নেতারা এই সব বীভৎস কাণ্ড করেছিল।

সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত সততার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব-এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে ভাষা, পোশাক, খাদ্য, পারস্পরিক সম্বোধন এবং আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যাতে জাতীয় ঐক্যের মনোভাব সুদৃঢ় হয় সে বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য তিনি একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি জানতেন ধর্ম, আঞ্চলিকতা, ভাষার বিভিন্নতা প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির প্রভাব দূর করতে হলে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক অভিযান পরিচালনায় তিনি মহিলাদের সমবেত করার জন্য সিঙ্গাপুরে ঝাঁসীর রাণী বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শত শত মহিলা স্বেচ্ছায় যোগদান করে সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁরা পুরুষ সৈনিকদের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছিলেন।

১৯৪৪-এর প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ব্যাংককের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদেশে গিয়ে রেঙ্গুন শহরে অস্থায়ী সরকার, আজাদহিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এখন থেকে কার্যতঃ দুটি সামরিক সদর দপ্তর চালু হল। একটি রেঙ্গুনে এবং অপরটি সিঙ্গাপুরে। সুভাষচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ভারতের খুবই সন্নিকটে অবস্থিত ব্রহ্মদেশ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিযান তীব্র করা হোক। ভারতের মাটিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে হলে ব্রহ্মদেশকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। সিঙ্গাপুরের বেতার মারফত সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' সামরিক সংগীতটির প্রচার শুরু করেন।

শুরু থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা ও দুর্বলতার সম্মুখীন হয়। জাপানীদের যুদ্ধে জয়পরাজয়ের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি বা পশ্চাদপসরণ জড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ

ফৌজের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। আরাকান ফ্রন্টে আজাদ হিন্দ ফৌজ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সামরিক দক্ষতা দেখায়। ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে সর্বপ্রথম ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। সিঙ্গাপুরে পোঁছানোর ন'মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র সামরিক সাফল্য অর্জন করেন।

১৯৪৪-এর প্রথক দিকে জাপানীরা আরাকান ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ইম্ফলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করে। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ দাবি করেলে, জাপানী সামরিক অধিনায়কেরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে রণাঙ্গণে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করার সম্মতি দিতে চায় নি, তারা আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপানী সামরিক বাহিনীর লেজুড় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানী সামরিক অধিনায়কদের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সামনের সারিতে রাখার দাবি করেন। কারণ তিনি মনে করতেন ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরাই রক্তদান করে প্রথম শহীদ হবেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাপানী সামরিক অধিনায়কয়দের মতৈক্য স্থাপিত হয়। সেই অনুযায়ী ঠিক হ'ল যে জাপানী অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীনভাবে অভিযান চালাবে এবং ভারতের যে অঞ্চল মুক্ত হবে সেই অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রভূত সামরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়; ফৌজের নিজস্ব বিমান বাহিনী এবং আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পদাতিক বাহিনী ছিল না। আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের অভাব এবং নিতান্ত স্বল্প পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। সামরিক বাহিনীর ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের ছিল না। এত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের 'সুভাষ বাহিনী' ইম্ফলে যুদ্ধ চালিয়ে পার্বত্য এলাকার সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল।

কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গণে আজাদ হিন্দ ফৌজ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালায়। সীমিত সমর সম্ভার নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধ করতে হয়। কারণ জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে কখনও আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করে নি। কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গণে জাপানীরা ব্রিটিশের তীব্র সামরিক আক্রমণের

সম্মুখে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে সামনের সারিতে যুদ্ধ করার জন্য আহবান জানায়। শাহনওয়াজ-এর নেতৃত্বে 'সুভাষ ব্রিগেড', কিয়ানীর নেতৃত্বে 'গান্ধী ব্রিগেড' এবং গুলজারা সিং-এর নেতৃত্বে 'আজাদ ব্রিগেড' ইম্ফল রণাঙ্গণে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অসুবিধা সত্ত্বেও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করে।

অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন ভারত ভূমিতেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক সংগ্রাম চালাতে হবে। ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে নেতাজী সপ্তাহ উৎদযাপন উপলক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন: 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুযায়ী ইংরেজরা এখনই ভারত ত্যাগ করলে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে ভারত ভূখণ্ডে একজনও জাপানী সৈনিক পদার্পণ করবে না'। সুভাষচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জয়লাভ ভারতবাসীকে শক্তহাতে অর্জন করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাক্ষিণ্যের মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় না।

কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গণে ব্রিটিশ চতুর্দশ পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে জাপানী সামরিক বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের তীব্র লড়াই চলে। নিতান্ত স্বল্প সামরিক সম্ভার নিয়ে শুধু মাত্র ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পকে মূলধন করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে লড়াই চালায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধুনিক সমর সম্ভার এবং সামরিক আয়োজন থাকলে ব্রিটিশের পক্ষে কোহিমা ইম্ফল রণাঙ্গণে জয়লাভ করা হয়ত আরও কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ হত। জাপানী সামরিক কর্তৃত্ব আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর কখনও পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে নি এবং এই ফৌজকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করার সমস্ত প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিল।

কোহিমার কাছাকাছি ভারত-ব্রহ্মদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আটটি খণ্ডে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই হয়। সর্বশক্তি দিয়ে ইম্ফল রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী। ব্রিটিশের তীব্র বিমান আক্রমণের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজ বেকায়দায় পড়ে যায়। এই সময় ঘন বর্ষণের মত তীব্র দুর্যোগ আজাদ হিন্দ ফৌজের সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছিল। সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জাপানী জেনারেল মুতাগুচি ইম্ফল-কোহিমা

সড়ককে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেন। জাপানীরা মনে করেছিল ইম্ফল কোহিমা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি ঐ অঞ্চলে আসতে পারবে না। জাপানীদের সামরিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়ে ব্রিটিশ শক্তি প্রবল সামরিক আক্রমণ নতুনভাবে চালাতে শুরু করে। ফলে জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করলে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বাহিনীগুলি পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনী ভয়ংকরভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে দুর্গম পর্বত অতিক্রম করে মান্দালয় এবং রেঙ্গুনের দিকে পিছু হটে আসে।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসে ইম্ফলের পতনের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো পদত্যাগ করলেন। এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। চার হাজারের বেশি সৈনিক যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং অনেকেই আহত ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সামরিক শৃংখলা ভঙ্গ করে ফৌজের অনেক সৈনিক পালিয়ে যেতে থাকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে স্বতন্ত্রভাবে সামরিক সম্ভার ও অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের জন্য নতুন একটি বিভাগ খোলেন। অবশ্য জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী কোইসো জাপানের সঙ্গে সুভাষ-চন্দ্রের অস্থায়ী সরকারের কূটনৈতিক সংযোগ রক্ষা করার আশ্বাস দেন।

জাপানের সামরিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৪৫-এর ২৩শে জানুয়ারি তারিখে সুভাষচন্দ্র ইম্ফল ও চট্টগ্রাম দখল করে দিল্লী অভিমুখে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। ১৯৪৪-এর শেষের দিকে জাপানী সামরিক কর্তৃত্ব যুদ্ধজয়ের আশা পরিত্যাগ করে। ১৯৪৫-এর মার্চের শেষের দিকে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ব্রহ্মদেশের উত্তরদিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ১৩ই মে তারিখে সুভাষ-চন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সামরিক নেতা শাহনওয়াজ এবং ধীলন প্রমুখরা ব্রিটিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে পেগুতে যুদ্ধবন্ধী হলেন।

১৯৪৫-এর এপ্রিলে জাপানীরা রেঙ্গুন পরিত্যাগ করলে সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন যদি জাপানের সম্পূর্ণ সামরিক পরাজয় ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি হয়তো চীন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। অবশেষে তিনি রেঙ্গুন থেকে অত্যন্ত দুর্গম ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করে ব্যাংককে উপস্থিত হন।

১৯৪৫-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হিটলারের জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ

করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভারসাম্য স্পষ্টভাবেই মিত্রশক্তির দিকে ঝুঁকে-ছিল। নাৎসী-ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তিবর্গ পিছু হটতে হটতে আত্মসমর্পণের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময় লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করলে সুভাষচন্দ্র লর্ড ওয়াভেলকে এ পথে অগ্রসর না হবার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

১৯৪৫-এ আগষ্টে সুভাষচন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ শুনলেন। প্রায় একই সঙ্গে জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ তাঁর কাছে পেঁাছাল। আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করে নি। অবশ্য সুভাষ চন্দ্র এই সময় থেকে আর যুদ্ধ পরিচালনা করেন নি। অস্থায়ী সরকারের ক্যাবিনেট সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি সিঙ্গাপুর থেকে আরো পূর্ব দিকে যেতে সম্মত হলেন। এখন প্রশ্ন হল তিনি কোথায় যাবেন? থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন। সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

সুভাষচন্দ্রের শেষের দিনগুলি থেকে জানা যায় যে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংককের মধ্য দিয়ে সায়গন অভিমুখে বিমান যাত্রা করেছিলেন। সায়গনে পেঁাছে সেখান থেকে তাঁর সহযোগী হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি জাপানী বিমানে যাত্রা শুরু করেন। ১৯৪৫-এ ২২শে আগষ্ট টোকিও বেতার থেকে সুভাষচন্দ্র যে বিমানে যাত্রা করেছিলেন সেই বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ ঘোষণা করা হয়। টোকিও বেতারের ঘোষণা-অনুযায়ী ১৮ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্রের বিমানটি চরম দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

গ. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল উৎসাহদাতা এবং সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বৈদেশিক সামরিক সাহায্যে ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যতীন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ জাতীয়-বিপ্লবীরা বৈদেশিক সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশের শত্রু জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলার জাতীয়-

বিপ্লবীরা। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অর্থে এবং জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাংলার জাতীয়-বিপ্লবীরা পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে, কলকাতা শহরকে বিচ্ছিন্ন করে এবং একই সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অবরোধ করে ব্রিটিশের অস্ত্র সম্ভার দখল করার পরিকল্পনা করেন।

শেষ পর্যন্ত জাতীয়-বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈদেশিক অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই জাহাজটির সংবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে জানতে পেরে সেটি আটক করে ফেলে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ জাতীয়-বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা আগেই জানতে পেরেছিল। বাংলাদেশ সমেত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও সুদূর সাংহাই, সিঙ্গাপুর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক খানা তল্লাসী চালিয়ে জাতীয়-বিপ্লবীদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিটিশ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাথে যতীন মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সংগ্রাম বালেশ্বরের বুড়ি বালামকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিপটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলার জাতীয়-বিপ্লবীদের বৈদেশিক অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা জাগরূক ছিল। মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ জাতীয়-বিপ্লবীরা বৈদেশিক অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয়-বিপ্লবীদের বৈদেশিক অস্ত্র সম্ভারের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনার ঐতিহ্য বহন করে। ১৯৪০-এর মধ্যভাগ থেকেই সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার কথা চিন্তা করেন। কারণ বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন এবং তিরিশের দশকের লবণ-সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের অসাফল্য সুভাষচন্দ্রের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি গান্ধীজী পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ক্রমশ বিশ্বাস হারাতে থাকেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন একমাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়।

দীর্ঘকাল ধরে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে 'Enemy's enemy is my friend.' অর্থাৎ শত্রুর শত্রুই প্রকৃত বন্ধু। সুভাষচন্দ্র এই প্রবাদ বিশ্বাস করতেন। জার্মানীর মত নাৎসী শক্তি এবং জাপানের মত সামরিক-ফ্যাসিবাদী শক্তি দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশের শত্রু হওয়ায় সুভাষচন্দ্র নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের সহায়তায় ভারতের জন্য সশস্ত্র সামরিক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ভগতরাম তলোয়ারের সাক্ষ্যে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, সুভাষচন্দ্র নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের সঙ্গে থেকেও নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব ও স্বত্বাকে কখনও বিসর্জন দেন নি। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি হিটলার অথবা তোজোর আজ্ঞাবহ হয়ে যান নি। তিনি জার্মানীতে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দেন। ব্রহ্মদেশের আউং সানের নেতৃত্বে গঠিত মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে অস্ত্র ধারণে নিবৃত্ত করেন। কারণ ১৯৪৫-এর মার্চের পরে আউং সানের মুক্তিবাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল।

ব্রহ্মদেশের আউং সান, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ ও সরিফুদ্দিন সুভাষচন্দ্র বসুর মত শত্রুর শত্রুকে পরম বন্ধু মনে করে অক্ষশক্তি বর্গের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছর জাপানী দখলে থেকে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটে এবং তাঁরা জাপানী সামরিক-ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবশ্য ভিয়েতমিনের হো চি মিন ফ্যাসিবাদী জাপানের সঙ্গে কখনও সমঝোতা করেন নি।

১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরের সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন ঃ 'ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সংগঠিত বা শুরু করা, ব্যর্থ আশা মাত্র। পূর্ব-এশিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের সেই সংগ্রাম পরিচালনার সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।' ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ব-এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের পরিচালনা করতে হবে। সেজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ফ্যাসিবাদী জাপানের সঙ্গে সমঝোতা তাঁকে করতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বিশ্ব রাজনীতি এবং বিশ্ব শক্তিসমূহের ভারসাম্য কোন দিকে গেলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হবে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদের অত্যন্ত আক্রমণাত্মক চরিত্র হল নাৎসীবাদ-ফ্যাসিবাদ। নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অপরদিকে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নাৎসী-ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে যে ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ কখনও

ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে উৎসাহ দিতে পারে না। সেজন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে পরিচালনা করতে হয়। প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব সত্ত্বেও নাৎসীবাদী-ফ্যাসীবাদী শক্তিবর্গের উপরে তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

ভারতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে ১৯৩৮-৪০-এর বছরগুলি ছিল সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে নজীরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গণে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রাম সুভাষচন্দ্রের ১৯৩৮-৪০-এর গৌরবকে অতিক্রম করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কঠিন পরিস্থিতি ও নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে স্বাধীনতার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখেন। সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আজাদ হিন্দ ফৌজের অভূতপূর্ব উদ্যম ও সাহসিকতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত ও প্রদেশগত পার্থক্য সত্ত্বেও সুভাচন্দ্রের আহবানে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইস্পাতের মত সুকঠিনভাবে গড়ে উঠে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

ভগৎরাম তলোয়ারের সাক্ষ্যে জানা গেছে ফ্যাসিবাদী-নাৎসীবাদী শক্তিবর্গের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে (Indian Legion) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে ব্রহ্মদেশের আউং সান-এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে দেন নি। ব্রহ্মদেশ জাতীয় ফৌজের অধিনায়ক আউং সান আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশেষ ভূমিকা এবং সুভাষচন্দ্রের প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন নাৎসীবাদী জার্মানীর মত ফ্যাসিবাদী জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ ফৌজকে ফ্যাসিবাদী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের প্রতিকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহায্যে সামরিক অভিযানের রাজনৈতিক পদ্ধতিকে তীব্রতর করতে তিনি ফ্যাসিবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও জওয়ানদের ব্রিটিশের আদালতে বিচার শুরু হলে তার বিরুদ্ধে যে উত্তাল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে সেটি হল অবিস্মরণীয় ঘটনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যা ঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদ

১. সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের পটভূমি

ভারতীয় জনসংখ্যার সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু অংশ হল ভারতের মুসলমান জনগণ। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে মনে করেন ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের মূলে আছে সংখ্যালঘু মুসলমান নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় সংকীর্ণতা। সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও সংকীর্ণতা উদ্ভবের মূলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের সংকীর্ণতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের অবদান যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে, ধর্মীয় চেতনা ও রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু ও মুসলমান নেতারাই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। সাম্রাজ্যিক শাসন এবং ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে সেই বিভেদ সম্প্রসারণে সর্বপ্রকাব ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দৌলতে দেখা গেল হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ছাড়াও শিখ, ভারতীয় খ্রীশ্চান, অনুন্নত শ্রেণী, উপজাতি, তপশীলীভুক্ত জাতি বা হরিজন ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সাম্প্রদায়িক বিভেদের আকার ধারণ করতে লাগল।

সাম্রাজ্যবাদী লেখক, প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ এবং মুসলমান সমাজের সক্রিয় সাম্প্রদায়িক নেতারা মুসলমান জনগণ, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে একটিমাত্র বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতে মুসলমানেরা একান্তভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু। হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা সোচ্চারে বলতেন, হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণই ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা চেয়েছিল হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা। হিন্দু সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংখ্যালঘু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী আরো সংকীর্ণ ও বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িক আচার-আচরনের সৃষ্টি করেছিল।

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় জনসংখ্যার ঐতিহাসিক অবস্থান। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ভারতের দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এক

চতুর্থাংশ জনসংখ্যা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং অবশিষ্ট এক দশমাংশ জনসংখ্যা বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নটি বেশ বড় আকার ধারণ করে। বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস কোন সময়েই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করে না। রাজনৈতিক অবস্থা থেকেই সাম্প্রদায়িক বিভেদের কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বিশেষ করে এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যখন কোন দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বলপূর্বক সেই দেশে শাসন কায়েম রাখার চেষ্টা করে। ভারতের সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের মূলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবদান সবিশেষভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যকে নষ্ট করে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশের হাতে একটি প্রধান অস্ত্র।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, প্রাক ব্রিটিশ যুগে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ কখনো জটিল আকার ধারণ করে নি। এমনকি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ভারতে সাম্প্রদারিক সম্প্রীতি বজায় ছিল। ১৮৫৭-এর মহা-অভ্যুত্থানের পর থেকে ভারত শাসনে ব্রিটিশের নীতি আমূল বদলে যায়। সেই সময় থেকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নটি রাজনৈতিক আকার ধারণ করতে থাকে। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হলেও সেই যুদ্ধ কখনো হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের আকার ধারণ করে নি। দেখা গেছে যে মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের দায়িত্বশীল উচ্চ পদে বসাতেন এবং অনুরূপভাবে হিন্দু শাসকরা মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতে ব্রিটিশ ভারতের মত সাম্প্রদায়িক বিভেদ গুরুতর আকার ধারণ করে নি। অবশ্য রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতে জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসার লাভ করলে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উস্কানি দেওয়া হয়।

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের পটভূমি বিশ্লেষণের সময় আর্থ-সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কারণটি অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে উদীয়মান মধ্যবিত্তের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজের মত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে প্রথম ব্যবসা বাণিজ্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ফলে হিন্দু সমাজে

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়। ভারতের মুসলমান সমাজ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পেছিয়ে থাকে। ১৮৮২-এর হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে জানা যায় যে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৩.৬৫ অংশ উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিল।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের ফলে হিন্দু সমাজ থেকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের উদ্ভব ঘটে। উত্তর ভারতের বড় বড় জমিদাররা ছিলেন মুসলমান। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে বুর্জোয়াদের অগ্রগতিকে মুসলমান জমিদাররা হিন্দু বেনিয়াদের অগ্রগতি বলে ব্যাখ্যা করলেন। ফলে মুসলমান বড় বড় জমিদার ও উদীয়মান শিল্প ও বাণিজ্যিক হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি করল সাম্প্রদায়িক বিভেদের মনোভাব। উদীয়মান মধ্যবিত্তের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা দিল। ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে অনগ্রসর মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সাম্প্রদায়িক বিভেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারী চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক পেছিয়ে পড়ল। মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল অনেক পরে। সেজন্য তাঁরা দেখলেন যে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেক আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের সঙ্গে সম্মুখীন হবার জন্য উদীয়মান মুসলমান বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত মুসলমান জনগণের সমর্থন চেয়েছিল। শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণী আকাংখা ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশ শাসন এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ধর্মীয় ও ভাষাগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সমানভাবে বিকাশ লাভ করে নি। অর্থাৎ অসম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ বপন করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতি ভারতে অসম সামাজিক বিকাশকে তীব্রতর করেছিল। ব্রিটিশ শাসন ধর্মীয় ও ভাষাগত জনগোষ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সাম্রাজ্যিক শাসনের ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিতে ব্রিটিশ শাসনের নীতিকে 'balance and counterpoise' বলা হয়।

পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দের আর্য সমাজ আন্দোলন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদকে প্রচার করে। আর্য সমাজ আন্দোলনের মূল বক্তব্য বিষয় ছিল ঋগ্বেদ সংহিতার

মাহাত্ম্য প্রচার করা।/ স্বামী দয়ানন্দ ঋগ্বেদকে কোরান এবং বাইবেলের মত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে প্রচার করেন। তাঁর মতে উত্তর ভারতে ইসলাম ধর্ম এবং দক্ষিণ ভারতে খ্রীশ্চান ধর্ম হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান ও খ্রীশ্চান জনসংখ্যা বাড়িয়েছে। ঋগ্বেদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দয়ানন্দ ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রীশ্চানদের শুদ্ধিকরণের দ্বারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার আন্দোলন শুরু করলেন। ধর্মত্যাগ বা নতুন ধর্মগ্রহণ বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আর্থ-সামাজিক কারণে নিম্নবর্গের বহু দরিদ্র হিন্দু ইসলাম এবং খ্রীশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত ভীতি প্রদর্শনে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। শুদ্ধি আন্দোলনের মারফত স্বামী দয়ানন্দ উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ বপন করেন।' লালা লাজপত রায়ের মত চরমপন্থী ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী নেতা পাঞ্জাবের আর্যসমাজ আন্দোলনের জোরালো সমর্থক ছিলেন। মদনমোহন মালব্য 'হিন্দু সংগঠন' আন্দোলন আরম্ভ করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। ১৯২০ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের যে কোন ধর্মীয় অথবা সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠনে সদস্য পদ গ্রহণে কোন বাধা ছিল না। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য অবাধে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদে ছিলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মদনমোহন মালব্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি আবার কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯০৯-এর লাহোর অধিবেশনে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাঞ্জাবের হিন্দু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি গোপীচাঁদ ভার্গব খুব সহজেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদে উন্নীত হন। |হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের সমর্থক জাতীয়তাবাদী নেতারা পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের মূলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এবং উগ্র সংকীর্ণতাবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিকের ভূমিকা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক পর্ব বিভাগ করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্য যুগকে যথাক্রমে হিন্দু যুগ ও মুসলমান যুগ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যুগকে/ খ্রীশ্চান যুগ না বলে আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের ভারতীয় ইতিহাসের

পর্ব বিভাগের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। তাঁরা প্রাচীন ও মধ্য যুগকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পর্ব বিভাগ করে সংবেদনশীল তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ বপনের কাজ শুরু করেন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের প্রভাব সংকীর্ণতাবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিক এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ণতাবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিক এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের একাংশ মধ্যযুগের মুসলমান শাসনে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির চরম অবক্ষয় লক্ষ্য করলেন। তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উৎস সন্ধান করেছেন। সেজন্য দেখা যায় যে শিবাজী, মহারাণা প্রতাপ এবং গুরু গোবিন্দ সিংকে জাতীয় বীররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ তাঁরা 'বিদেশী শাসনের' বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। শেঠ গোবিন্দদাসের মত লেখক এবং নেতা মুসলমান ফৌজদার, সুবেদার অথবা দলপতির বিরুদ্ধে যে কোন রাজপুত বা বুন্দেলার ভূস্বামী যখনই কোন যুদ্ধ করেছিলেন সেই যুদ্ধের নায়ককে তিনি বীররূপে চিত্রিত করেছিলেন।

ভারতের মুসলমান সমাজের একাংশ সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবে ইন্ধন জুগিয়েছিল। প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের প্রভাবে গোঁড়া মুসলমানেরা 'বিরাট মুসলমান জগতের' সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। গোঁড়া মৌলবীদের অবদান এক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের একটি পৃথক সত্তা ও দাবি আছে এই আকাংখা তীব্রভাবে প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় জীবনে ভারতীয়ের স্বার্থের পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক মুসলমানের স্বার্থ হিন্দু স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই ধরণের ভেদবুদ্ধি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করেছিল। ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের মূলে ছিল ব্রিটিশ শাসকের 'divide and rule policy' এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী।

২. স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি ধীরে ধীরে গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা দেয়। আগে বলা হয়েছে ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানের পর থেকে ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দু-মুসলমান সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ভারতে

ধর্মগত ও ভাষাগত জনসংখ্যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক ঐক্য যাতে গড়ে না ওঠে সেজন্য ব্রিটিশ শাসকরা খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের ইচ্ছা তখনও পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯০৩-এ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এবং ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ সারা ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে এক নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষিত হবার পর নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক। সভাসমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে ও শোভাযাত্রা-মিছিল আয়োজন করে নরমপন্থী নেতারা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সত্ত্বেও ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কার্যকর করা হল। প্রায় ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল, যদিও পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। খণ্ডিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল আসামকে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাময়িক ব্যর্থতা সৃষ্টি করল চরমপন্থী বা সংগ্রামমুখী নেতৃবৃন্দের; তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থী নেতারা গণ-আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে অসংখ্য ছাত্র তরুণ ও যুবক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বদেশী বয়কট আন্দোলনে সামিল হয়।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী নেতাদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের অসংখ্য মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে যৌথভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা একদিকে যেমন চরমপন্থী নেতাদের জনপ্রিয় করে পুরোধায় এনেছিল, অপরদিকে জাতীয়-বিপ্লবীদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তৎপরতা বাড়িয়েছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে জাতীয়-বিপ্লবীদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। অরবিন্দ ঘোষের মত নেতা প্রকাশ্যে চরমপন্থী আন্দোলনের নায়ক ছিলেন এবং গুপ্তভাবে তরুণ জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতীকগুলি জাতীয়-বিপ্লবীরা ব্যবহার করতেন। কালীমূর্তির সামনে প্রতিজ্ঞা, ধর্মগ্রন্থ গীতা স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ ইত্যাদি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানগুলি তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী গণ-আন্দোলণের সম্ভাবনার সূচনা করলেও বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে পারে নি। ১৯০৫-এর আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করে নি। হিন্দু-মুসলমানের সুস্থ ও স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক ১৯০৫-এর পর থেকে জটিল আকার ধারণ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৬-১৯০৭-এর দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনতির জন্য শুধুমাত্র চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয়-বিপ্লবীদের দায়ী করা যায় না। অনেকগুলি শক্তির সমন্বয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল।

১৯০৬ ও ১৯০৭-এর বছরগুলিতে পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি দেখা দেয়। অতি দ্রুত যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলাগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে। ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক হিংসা দেখা দেয়। এই জেলার জামালপুর অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হিংসার ফলে বহু প্রাণহানি ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। জামালপুরের ঘটনা জাতীয়তাবাদী নেতাদের শংকিত করেছিল। হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার ফলে পূর্ববঙ্গের জেলা-গুলিতে ব্যাপক নরহত্যা ও লুণ্ঠন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ভীতি ও অবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করে। ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানের পর থেকে ব্রিটিশ শাসকরা শত চেষ্টা করেও যা পারে নি ১৯০৬-০৭-এর হিংসাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশের ইচ্ছাকেই পূর্ণ করেছিল।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের শেষপর্বে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি এবং ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ ভারতীয় জনমানসে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতি এবং হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের জন্য দায়ী কে সে সম্পর্কে সংবাদপত্র, নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাংগামার জন্য স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের আতিশয্যকে দায়ী করে। তাদের মতে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপকে উৎসাহ দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক মুসলমান পরিচালিত 'স্বজাতি' ও 'লাল ইশতেহার' পত্রিকাগুলি পূর্ববঙ্গে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য হিন্দু নেতাদের দায়ী করে। এই পত্রিকাগুলি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানিয়ে হিন্দুদের সর্বতোভাবে বয়কট করার জন্য অনুরোধ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য দায়ী কে এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতা ও পত্র-পত্রিকাগুলির বক্তব্যের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের মূল বক্তব্যের মিল দেখা যায়। উভয়েই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনকে দায়ী করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতির কারণ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে অনিচ্ছুক দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের উপর জোর করে বয়কট আন্দোলন চাপিয়ে দিলে হিন্দু-মুসলমান স্বাভাবিক সম্পর্কে দ্রুত ভাঙন ধরে। তিনি 'সদুপায়' প্রবন্ধে লিখলেনঃ 'যাহা হউক 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যত কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশংকার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল।' রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতির সমস্যাটি একান্তভাবে সামাজিক, সেজন্য এই সমস্যার সামাজিক সমাধানের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কুমিল্লার হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 'ঘটনায় মন্তব্য করে অরবিন্দ ঘোষ ঢাকার নবাব শলিমুল্লার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের কার্যকলাপকে দায়ী করেন। তিনি মোল্লা মৌলবী প্রচারিত বিবৃতি ও পত্র পত্রিকাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় উস্কানি দানের জন্য দায়ী করেন। অরবিন্দ ঘোষের মতে ঢাকার নবাব শলিমুল্লার সাম্প্রদায়িক প্রভাব পূর্ববঙ্গের যে সব অঞ্চলে প্রবল সেখানেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার উদ্ভব ঘটেছে। তিনি ব্রিটিশের পুলিশ বাহিনীকে নবাব শলিমুল্লার চর বলে অভিহিত করেন। কারণ পুলিশ বাহিনী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পরোক্ষে শলিমুল্লার সমর্থকদের পিছনে দাঁড়িয়ে মদত দিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম চরমপন্থী নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসকের পুতুল হিসাবে নবাব শলিমুল্লাকে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য দায়ী করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণকে বিদেশী

শাসকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আক্রমণাত্মক আঘাত হানার জন্য আহবান জানান।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের চরমপন্থী নেতাদের মত বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হাঙ্গামার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উস্কানিকে দায়ী করেছিলেন। তিনি সুস্থিত যুক্তির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ হিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উচ্চাকাংখাকেও দায়ী করেন। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্তরভুক্ত হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটায়। উচ্চাকাংখা পূরণে স্বার্থের সংঘাত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করেছিল। দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি দেখা দেয় নি বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি উচ্চাভিলাষী ও ধনী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী এবং জমিদারেরাই ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্য পাবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল।

সুমিত সরকার তাঁর 'The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908' গ্রন্থে অনেক তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে হিন্দু-মুসলমান বিরোধে প্রধানত চারিটি কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদাররা বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা উদীয়মান শিক্ষিত মুসলমানদের মর্যাদা দানে অস্বীকার করেছিল; তৃতীয়ত, হিন্দু জমিদারদের প্রতিনিধিরা গ্রামে গঞ্জে গরীব মুসলমান কৃষকদের উপর বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চাপিয়ে দিয়েছিল; চতুর্থত, মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সরকারি চাকুরি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে সমমর্যাদা দাবি করেছিল। এই সব কারণে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক স্বদেশী বয়কট আন্দোলনকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সময় বৃহত্তর মুসলমান সমাজ হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হোসানুর রহমান তাঁর 'Hindu-Muslim Relations in Bengal, 1905-1947' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'পেশাদারী শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু

মুসলমান দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।' তিনি বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব লক্ষ্য করেছেন। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাঙালী হিন্দুর জাতীয়তাবাদকে গুরুতরভাবে আহত করেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে হতাশা এসেছিল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা। ঢাকার নবাব শলিমুল্লা এই সময় মুসলমান সমাজের নেতারূপে পরিগণিত হন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৬-এ ঢাকা শহরে বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উৎসব প্রবল উৎসাহের সঙ্গে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে চরমপন্থী ও জাতীয় বিপ্লবী নেতারা হিন্দু ধর্মের প্রতীক ব্যবহার করে হিন্দু ধর্মের গুণকীর্তন করেন। তাঁরা নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের উদারনীতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে দেশীয় মতাদর্শ প্রচারের নামে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য ধর্মগ্রন্থ গীতা স্পর্শ করে শপথ নিতে বলেন। তিনি ভারতবর্ষকে দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করেছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক দেশপ্রেম জাগানোর জন্য 'শিবাজী উৎসব' পালন করেন। তিনি 'গণেশ পূজার' মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে প্রয়াসী হন। তিনি 'গোরক্ষনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবক্তা হয়েও চরমপন্থী নেতারা হিন্দু সমাজ, বর্ণাশ্রম ধর্ম, চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা এবং জাতপাতের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে হিন্দু-মুসলমান অসম্প্রীতির উদ্ভব ঘটেছিল। এই উদ্ভবের কারণ অন্বেষণ করতে হলে শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসকের বিভেদ নীতির উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলস্বরূপ সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মীয় ও ভাষাগত জনসংখ্যার মধ্যে অসম অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে সেই অসম বিকাশ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে ব্যাহত করে।

৩. মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা : সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক সংগঠন

মুসলিম লীগ

উচ্চবিত্ত অভিজাত মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠনরূপে ১৯০৬-এ মুসলিম

লীগ আত্মপ্রকাশ করে। হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রাক্তন পদস্থ কর্মচারী মেহদী আলি এবং মোস্তাক হোসেনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। মুসলমান খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রধান আগা খাঁ-র পৃষ্ঠপোষকতায় এই কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাজেট বক্তৃতার সময় লর্ড মর্লি ভারতের শাসন সংস্কারের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দেন। তিনি লেজিসলেটিভ কাউনসিল গুলিতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। লর্ড মর্লির এই ইঙ্গিত ভারতের অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক আকাংখা জাগায়।

অভিজাত মুসলমানদের প্রতিনিধিরা আলিগড় কলেজের ব্রিটিশ অধ্যক্ষের মাধ্যমে বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। বড়লাটকে লেখা চিঠিতে মেহদী আলি মুসলমানদের আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর আশংকার প্রধান কারণ ছিল যে, শিক্ষিত তরুণ মুসলমানেরা মর্লির বাজেট বক্তৃতার পর আইনসভার রাজনীতিতে যোগদানের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হতে পারেন। ভবিষ্যত শাসন সংস্কারের নির্বাচন ব্যবস্থায় যদি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (separate electorate) প্রবর্তন না করা হয় সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমানদের রাজনৈতিক আকংখা পূরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করে নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার স্বপক্ষে রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল দ্বিতীয় যুক্তি।

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আইনসভায় আসন না পাবার যে আশংকা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতারা করেছিলেন সেটি কিন্তু নিতান্ত অমূলক নয়। ১৮৯৩-এর নির্বাচনে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্যদের শতকরা ৪৫ ভাগ সদস্য ছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত। হিন্দু জমিদাররা পেয়েছিলেন শতকরা ২৭ ভাগ আসন। ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা পেয়েছিলেন শতকরা ১২ ভাগ আসন। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত একজনও মুসলমান সদস্য ছিল না। বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলমানরা শতকরা ৬ ভাগ আসন পেয়েছিল। অবশ্য ১৯১০-এ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব আদৌ ভাল ছিল না। ১৯০৪-এ মাসিক ৭৫ টাকা এবং তার উপরে সারা ভারতের সরকারি পদে নিযুক্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০৩, এই সময় অনুরূপ পদে নিযুক্ত হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১৪২৯। সারা ভারতের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়োগের হিসাব থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশে অনুরূপ পদে হিন্দু ও মুসলমানের নিয়োগ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২৬৩ ও ২৮৩। সরকারি রিপোর্টে জানা যায় দায়িত্বশীল সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল।

১৯০৬-এর অক্টোবরে মুসলমান প্রতিনিধিরা বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানান। তাঁরা বলেছিলেন আইনসভার প্রতিনিধিত্বে মুসলমানদের জনসংখ্যা এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের যথাযোগ্য প্রতিফলন প্রয়োজন। তাঁরা আইনসভার নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি জানালেন। সরকারি চাকরি, বিচার বিভাগের উচ্চপদ, স্থানীয় সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-মন্ডলীতে মুসলমানদের জন্য অধিকতর নির্দিষ্ট আসন দাবি করা হল। তাঁরা ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ১ জন মুসলমান সদস্যের নিয়োগ দাবি করলেন। আগা খাঁ-র নেতৃত্বে অভিজাত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদল বড়লাট মিন্টোকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল ভবিষ্যত শাসন সংস্কারের নির্বাচন ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজকে মুসলমান হিসাবে পৃথক প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে।

বড়লাট মিন্টো মুসলমান প্রতিনিধিদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের বলেছিলেনঃ 'আমি আপনাদের বলতে পারি, মুসলমান সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, যেখানে আমি সংশ্লিষ্ট আছি এমন যে কোন প্রশাসনিক পুনর্গঠনে সম্প্রদায়গতভাবে তাদের রাজনৈতিক অধিকাব ও স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।' বড়লাট সুস্পষ্টভাবে মুসলমান প্রতিনিধিদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের জানালেন যে, মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি মুসলমানদের অবদানের কথা তিনি মনে রাখবেন।

১৯০৬-এ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। কারণ মুসলিম লীগ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের পথিকৃৎ

রাজনৈতিক সংগঠন। মুসলিম লীগের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল ঃ ১ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব বৃদ্ধি করা ; ২. ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করে তাদের আকাংখাগুলিকে সংযত ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করা ; ৩ ঘোষিত লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৯০৮-এ অমৃতসর অধিবেশনে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবিগুলি আরো বেশি সুস্পষ্ট হল। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে লোকাল বোর্ড নির্বাচনে মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব, সরকারি চাকরি ও প্রিভি কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানানো হল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের চাকরি এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবি পেশ করা হল।

সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগের উদ্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায়। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি পেশ করে অভিজাত মুসলমান নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসকের বিভেদ নীতিকে জোরদার করেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে সংগ্রামমুখী নেতাদের পরিচালিত গণ-আন্দোলন এবং তার পাশাপাশি জাতীয়-বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অভিজাত মুসলমান নেতারা এবং ব্রিটিশ শাসক ভীত হয়েছিলেন। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা। কারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের তখনও পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছিল না।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন উচ্চ জমিদার শ্রেণী। উত্তর প্রদেশ থেকে প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতাদের উদ্ভব ঘটেছিল। ভারতের সর্বত্রই মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বেশির ভাগই বড় বড় জমিদার পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা।

১৯০৮-এর আলিগড় অধিবেশনে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হয়েছিলেন আগা খাঁ। পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮-এ মুসলিম লীগের বিহার প্রাদেশিক শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মুসলিম লীগে ঢাকার নবাব শলিমউল্লা সম্পাদক হন।

বোম্বাই শাখায় স্বয়ং আগা খাঁ সভাপতি ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বড় তালুকদার নওশাদ আলি খাঁ মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তিনি সভাপতি হন। পশ্চিমবঙ্গ এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সে স্থানীয় নবাবদের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক শাখা গড়ে ওঠে।

১৯১২ পর্যন্ত মুসলিম লীগের কর্মসূচী ও রাজনৈতিক দাবিগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ ১ মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি; ২. কংগ্রেস পরিচালিত স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা; ৩ বঙ্গভঙ্গ ও মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের প্রস্তাব সমর্থন; ৪ পূর্ববঙ্গ ও আসামের জন্য পৃথক হাইকোর্ট গঠন; এবং ৫. সরকারি চাকরির উচ্চপদে বেশি সংখ্যায় মুসলমানদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়।

বঙ্গভঙ্গ রদ এবং আন্তর্জাতিক সংকট মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবি ও কর্মসূচীতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের খলিফা এবং ব্রিটেন পরস্পর যুদ্ধরত হয়ে পড়লে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করে। সাধারণ মুসলমানের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেলেও বড় বড় মুসলমান জমিদার ও নবাবদের ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য কোন অংশে হ্রাস পায় নি। তুরস্কের খলিফা ক্ষমতাচ্যুত হলে ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। তার ফলে মুসলিম লীগে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে। খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থক মুসলিম লীগের নতুন নেতারা জাতীয়তাবাদী নেতারূপে পরিচিত হন। কারণ খিলাফৎ আন্দোলন মূলতঃ ছিল ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন। এই নতুন নেতৃত্ব মুসলিম লীগের সঙ্গে মুসলমান জনগণের সংযোগ ঘটায়। খিলাফৎ আন্দোলনের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল না। এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতারা একটি সাধারণ রাজনৈতিক মঞ্চে সমবেত হন। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট সমঝোতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯১৬-এর কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্যকে জোরদার করে।

১৯১৯ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর খিলাফৎ সংগঠন মুসলিম লীগকে প্রায় অকেজো করে দেয়। খিলাফৎ সংগঠন ১৯২৩ পর্যন্ত গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ১৯২৪-এ জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম

লীগের অধিবেশন হয়েছিল লাহোরে। সেই সময় জিন্না গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। তখনও পর্যন্ত জিন্না মুসলিম লীগের মধ্যে উদারনীতিক নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থা জোরালো ভাবে সমর্থন করে। ১৯২৪-এর লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দাবি করে। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে পাঞ্জাব, বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার দাবি করা হয়।

১৯২৪-এর লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি স্পষ্টতই মুসলিম লীগের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। খিলাফৎ আন্দোলন এবং গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ১৯২৪ থেকে সেই ঐক্যে ভাঙন ধরায়। ঐ সময় থেকে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে তীব্রভাবে প্রচার করে। কংগ্রেস পরিচালিত ভবিষ্যত গণ-আন্দোলনে যাতে মুসলমানেরা সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে না পারে সেজন্য মুসলিম লীগ খুবই সচেষ্ট হয়। কারণ বড় বড় জমিদার ও অভিজাত শ্রেণী পরিচালিত মুসলিম লীগ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনকে অ-নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বলে মনে করত। যথাসম্ভব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন পরিহার করে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক বিভেদকে মূলধন করে, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দর কষাকষির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের নীতির উপর মুসলিম লীগ প্রাধান্য দিয়েছিল।

হিন্দু মহাসভা

মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক সংগঠনরূপে হিন্দু মহাসভার উদ্ভব ঘটেছিল। সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু মহাসভা গঠনের উদ্যোগ নেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক সংগঠনের তীব্র আকাংখা দেখা গিয়েছিল। ১৯০৭-এ পাঞ্জাবে 'হিন্দুসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬-এ পাঞ্জাবে জমির মালিকানা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়নের

পর হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সংখ্যালঘু হলেও পাঞ্জাবের হিন্দুরা ওই প্রদেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। মুসলমান প্রধান প্রদেশে হিন্দু প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ১৯০৯ থেকে প্রতি বছর পাঞ্জাবে 'হিন্দুসভার' অধিবেশন ডাকা হত। পাঞ্জাবের 'হিন্দুসভার' নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত ১৯১৫-এ হরিদ্বারে সারা ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয়।

গোড়ার দিকে হিন্দু মহাসভা ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনরূপে হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্ত্য উদারনীতিক চিন্তাধারার প্রভাব যাতে না পড়ে সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিল। ১৮৯০-এ মাদ্রাজের শংকরাইয়া 'হিন্দুসভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারত সরকারকে মেয়েদের বিবাহের বয়স দশ থেকে বারো বছর করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। এই হিন্দুসভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মকে সমাজ সংস্কারক ও বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস ও প্রথাগুলিকে বজায় রাখা। শংকরাইয়া হিন্দু জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের সমাজতন্ত্রের বিপজ্জনক প্রভাব সম্পর্কে সাবধান করে দেন। তিলক এবং খাপার্ডের মত সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদী নেতারা 'বিবাহ সম্মতি বিল'কে তীব্র বিরোধিতা করে 'হিন্দুসভাকে' প্রকারান্তরে জোরদার করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে ১৯১৭-এ মণ্ট-ফোর্ড ঘোষণার পর হিন্দু মহাসভায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মণ্ট-ফোর্ড ঘোষণা ভারতে শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করে। হিন্দু মহাসভা ঐ সময় থেকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে। ইসলামের ধর্মান্তকরণ এবং সাম্প্রদায়িক মুসলমানের রাজনৈতিক বিভেদের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা সারা ভারতে ধর্মীয় ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে হিন্দু মহাসভা সংকীর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠে। যদিও প্রতিষ্ঠাতারা হিন্দু সমাজে সংহতি স্থাপনের জন্য হিন্দু মহাসভার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। ১৯১৫-এ হরিদ্বারে সারা ভারত হিন্দু মহাসভায় 'সাবজেক্টস কমিটি' গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে মুন্সিরাম (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) এবং রামভূজ দত্তের মত ব্যক্তিরা ছিলেন। হিন্দু মহাসভার সারা ভারত কমিটিতে ভগবানদাস, বিষণনারায়ণ দাস, লালা হংসরাজ, তেজ বাহাদুর সপ্রু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মতিলাল ঘোষ প্রমুখ

নেতারা ছিলেন। ১৯১৬-এর হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতিত্ব করেন।

হিন্দু মহাসভার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবেদনগুলি জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯২৪-এর বেলগাঁও অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্ট রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায়; এম. আর. জয়াকার, চিন্তামণি, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম প্রমুখরা সদস্য হয়েছিলেন। বহু বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

(হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐক্য সাধনে হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মতই সাম্প্রদায়িক বিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।) হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ১৯২২-এ গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের বহু সদস্য হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। তার ফলে হিন্দু মহাসভা সমর্থিত উত্তর ভারতের 'শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনে কংগ্রেসের বহু সদস্য যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে অবশ্য কংগ্রেস সদস্যদের হিন্দু মহাসভার সদস্যপদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৩০-এর দশকে হিন্দু মহাসভার নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিলেও সেই নীতি কোন আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে নি। ১৯৩১-এ হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে বিনায়ক দামোদর সাভারকর শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থের উল্লেখ করে সম্পদ বণ্টনের কথা বলেন। সাভারকর অর্থনীতি প্রসঙ্গে কথা বললেও হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সেজন্য ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।

হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ছিলেন বড় বড় জমিদার এবং ভারতে দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাঁরা শুধুমাত্র হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম রক্ষার কথা বলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩৪-এ সারা বাংলা হিন্দু রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রাক্তন বিপ্লবী ভাই পরমানন্দ জওহরলাল নেহেরুকে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারার জন্য তীব্র সমালোচনা করেন।

হিন্দু মহাসভার ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গ পরিচালিত নেতৃবৃন্দ ভারতে সমাজতান্ত্রিক এবং বামপন্থী আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

৪ 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি' : পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় রাখাই ছিল ব্রিটেনের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে অটল থেকে ব্রিটিশ শাসকরা বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের শাসন নীতি রচনা করেছিল। এমনকি উদারনীতিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারাও ভারতের জন্য সু-শাসন (good government) প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। তাঁরা কখনও ভারতের জন্য স্বাধীন সরকারের (free government) কথা কল্পনা করেন নি। উদারনীতিক ঐতিহাসিক জেমস মিল বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসনে স্বাধীন সরকারের কথা ভাবাই যায় না। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই স্বাধীন সরকার গঠিত হতে পারে। মর্লিকে লেখা মিণ্টোর পত্রে জানা যায় ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতারা ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

ভারতে ব্রিটিশের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য শাসনের ক্ষেত্রে বিভক্ত করার নীতি গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানের পর ভারতের বড় বড় জমিদার ও রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শাসকের লেজুড়ে পরিণত হয়েছিল। লর্ড মিণ্টো ভারতের অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন চেয়েছিলেন। লর্ড ডাফরিন উদীয়মান ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করে ব্রিটিশ শাসনকে মজবুত করার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি তাঁর মোহভঙ্গ ঘটেছিল। কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লর্ড ডাফরিনের ইচ্ছা পূরণ করে নি। অনুরূপভাবে লর্ড মিণ্টো সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী এবং উদীয়মান মধ্যবিত্তকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। লর্ড লিটন থেকে আরম্ভ করে লর্ড মিণ্টো পর্যন্ত বড়লাটেরা ভারতীয় জনগণের একাংশকে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফলে সংকীর্ণতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক চেতনা ভারতীয়দের একাংশের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করার নীতিকে ব্রিটিশ শাসকরা অগ্রাধিকার

দেয়। ব্রিটিশের 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতির' (divide and rule policy) সফল প্রয়োগ হয়েছিল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থায়। ভারতের সাধারণ জনসংখ্যার পাশাপাশি 'সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থ সমূহের' ('communities, classes and interests') প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। আইনসভায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সঙ্গে ধর্মীয় সংস্রববিহীন জমিদার, বণিক, শিল্পপতি এবং ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় জনগণের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিষময় করে তোলা হয়।

১৯০৬-এ ভারতের অভিজাত মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে মুসলমানদের জন্য পৃথক ও সুবিধাসম্পন্ন প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা দাবি করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে লর্ড মিন্টো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিজাত মুসলমান প্রতিনিধিদের দাবি মেনে নেন। সেই সময়েই লর্ড মিন্টো ভারতের জেলা ও গ্রামগুলির সমাজ জীবনে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবর্তনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমান প্রতিনিধিদের শিখিয়ে পড়িয়ে লর্ড মিন্টোর কাছে হাজির করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যাবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। অভিজাত মুসলমান নেতারা বড়লাটের কাছে দরবার জানিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাপে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য মুসলমানের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা বিকাশের জন্য ভবিষ্যত ভারত শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। মুসলমান নেতাদের দাবির স্বপক্ষে কোন বাস্তবিক ভিত্তি ছিল না। ১৯১০-এ উত্তরপ্রদেশে পুরানো যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা-গুলির নির্বাচন হয়েছিল। এই নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ১/৭ অংশ হলেও জেলাবোর্ডগুলিতে ১৮৯ এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে ৩১০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। এই নির্বাচনে জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৪৫ এবং ৩১০। বিশেষ প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা না থাকলেও যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলিতে মুসলমানরা তাদের জনসংখ্যার তুলনায় বেশি প্রতিনিধি

নির্বাচনে সমর্থ হয়েছিল।

১৯০৯-এর 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্টে' মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তন করে ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনে হিন্দুদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানরা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে যাতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিভেদকে স্থায়ী করার জন্য মুসলমানদের দ্বৈত ভোটাধিকার দেওয়া হয়। একজন মুসলমান ভোটার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে ভোট দিতেন এবং সেই সঙ্গে অমুসলমানদের জন্য সাধারণ আসনেও ভোট দিতে পারতেন। জমিদারদের আইনজীবী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশার মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য জমিদারদের জন্য বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়।

মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। ১৯০৯-এর আইনে ৩০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের আয়কর দাতা মুসলমান ভোটাধিকার পেতেন। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ৩০,০০ ০০ টাকা আয়ের আয়কর দাতারা ভোটাধিকার পেতেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে স্নাতক হবার তিন বছর পরেই একজন মুসলমান ভোটাধিকার পেতেন, অপরপক্ষে স্নাতক হবার বেশ কয়েক বছর পর একজন অমুসলমান ভোটাধিকার লাভ করতেন। সুপরিকল্পিতভাবে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন যাতে গড়ে না ওঠে। অর্থাৎ, বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদ কখনও সংখ্যালঘু স্বার্থের অন্তরায় নয়, প্রকৃত অন্তরায় হল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা।

১৯১৯-এর মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতীয়ের জন্য বরাদ্দ মোট ১০৫ টি আসনের মধ্যে অ-মুসলমান সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলীর জন্য (Non-Muhamedan General Constituencies) ৪৮টি আসন উন্মুক্ত রাখা হল। মুসলমান ও অমুসলমান নির্বাচক মণ্ডলীর পাশাপাশি ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের এবং ভূস্বামীদের জন্য বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হল। কেন্দ্র এবং রাজ্য আইনসভায়

মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার রিপোর্ট কংগ্রেস-লীগ সম্পাদিত লক্ষ্মৌ চুক্তির (১৯১৬) নীতিগুলি রূপায়িত করা হয়েছে বলে দাবি করল।

১৯১৬-এর লক্ষ্মৌ চুক্তি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ভুলই করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা কংগ্রেস-লীগ সম্পাদিত লক্ষ্মৌ চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির পথ সুগম করেছিল। লক্ষ্মৌ চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেই প্রদেশে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব সামান্য বাড়াতে হবে। উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু মুসলমান প্রতিনিধিত্বকে বিশেষ বিশেষ প্রদেশে সুনিশ্চিত করা। তেমনই যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব সামান্য কমাতে হবে। কিন্তু দেখা গেল ব্রিটিশ শাসকরা লক্ষ্মৌ চুক্তির অপব্যাখ্যা করে সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে দিল। 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি' প্রয়োগ করতে গিয়ে মণ্ট-ফোর্ড ভারত শাসন সংস্কারে ভারতীয় খ্রীশ্চান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তন করল।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হল। মুসলমানদের পাশাপাশি, শিখ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীশ্চান, অবহেলিত শ্রেণী (depressed classes), ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভূস্বামী, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে ব্রিটিশ শাসকেরা সাম্প্রদায়িক বিভেদের নীতিকে কায়েম করল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮২টি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করা হল। অর্থাৎ, ভারতীয় জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়ের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০৫টি আসন রাখা হল, এর মধ্যে আবার ১৯টি আসন অবহেলিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত করা হল। বাংলাদেশের প্রাদেশিক আইনসভায় জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হল। হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক আইনসভায় তাদের জন্য ৭৮টি আসন বরাদ্দ করা হল। তার মধ্যে আবার ৩০টি আসন অবহেলিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত করা হল।

১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা ও সাম্প্রদায়িক-বিভেদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসংখ্যাকে 'সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থের' ('communities classes and interests') দ্বারা বিভক্ত করা হল। ভারতবাসীকে ধর্ম, বর্ণ, স্বার্থ ইত্যাদির মানদণ্ডে বিভক্ত করার পিছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি বা জাতীয় জনসমাজ (nationalities) গঠনের তাগিদ ছিল না। ভাষা-সংস্কৃতিকে (linguistic-cultural) ভিত্তি করে ভারতের প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠনের কোন প্রস্তাব ছিল না। সংকীর্ণ ধর্ম ও স্বার্থভিত্তিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যকে দমন করাই ছিল ব্রিটিশের 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি'। সেজন্য দেখা গেল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রীশ্চান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং তথাকথিত অবহেলিত জাতির বিভেদপন্থী নেতারা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে ব্রিটিশের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে দেন।

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বুঝেছিলেন যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে তীব্রতর করার জন্য রচিত হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যৌথ প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা (joint electorate system) একান্ত প্রয়োজন, এ কথাও তাঁরা বুঝেছিলেন। সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী মেনে নিতে বেসরকারীভাবে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। নেহেরু কমিটি রিপোর্ট (১৯২৭), দ্বিতীয় গোলটেবিল কনফারেন্স (১৯৩১) এবং সর্বদলীয় ঐক্য সম্মেলনে (১৯৩২) যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সুযোগ এসেছিল তার সদ্ব্যবহার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ করতে পারেন নি। সেজন্যই দেখা যায় ১৯৩২-এ যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্নটি প্রাধান্য পেলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (communal award) ঘোষণা করে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ব্রিটিশ শাসকরা সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের প্রায় সব দাবি মেনে নিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের পক্ষে এখন শুধু বাকি রইল ধর্মীয় ভিত্তিতে একটি পৃথক রাষ্ট্র দাবি করা। কয়েক বছর পরেই মুসলিম লীগ এই দাবি ধ্বনিত করে।

কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তুলতে পারেন নি। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী নেতা হিন্দু

সাম্প্রদায়িক বিভেদের সমর্থক ছিলেন। জাতীয় নেতৃত্ব শিখ সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে উদার মনোভাব গ্রহণ করে-ছিলেন। ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশের 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতির ফলে মুসলমান, জমিদার, শিল্প-পতি ও বাণিজ্যের স্বার্থকে আইনের স্বীকৃতি দিয়ে রাজনৈতিক বিভেদকে তীব্র করা হল। আইনজীবী, শিক্ষক, যুবক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষকের গণ-তান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়া হল। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শুধু যে ভারতীয় ঐক্যকে দুর্বল করা হল তাই নয়, এই ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আন্দোলনকে দুর্বল করার কাজে লাগানো হল।

ব্রিটিশের 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি' সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তীব্র করে-ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তীব্র করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণকে কায়েম করা। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দু জমিদার ও মহাজনের অধীনে নিপীড়িত কৃষকরা আন্দোলন করলে ব্রিটিশ সরকার সেই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আখ্যা দিয়ে তার প্রকৃত চরিত্র আড়াল করেছিল। উৎপীড়ন ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যখনই জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধা-চরণ করত তখনই তাকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলা হত। ব্রিটিশ শাসকরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে ক্রমবর্দ্ধমান গণতান্ত্রিক চেতনার বিরুদ্ধে সফলভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

৫ 'দুই জাতি তত্ত্ব' ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি : 'দুই জাতি তত্ত্ব' উদ্ভবের পটভূমি

'দুই জাতি তত্ত্ব' ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মতাদর্শ সৃষ্টি করেছিল। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) মহম্মদ আলি জিন্না 'দুই জাতি তত্ত্বে'র মতাদর্শ ও রাজনীতি প্রচার করেন। 'দুই জাতি তত্ত্বের' উদ্ভব লাহোর অধিবেশনের বহু পূর্বেই ঘটেছিল। রাজনৈতিক সংগঠনের মঞ্চ থেকে জিন্না এই তত্ত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করেছিলেন। 'দুই জাতি তত্ত্ব' কেমনভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করেছিল তা জানতে হলে এই তত্ত্ব উদ্ভবের সামাজিক পটভূমি জানা প্রয়োজন। হিন্দু পুনরুজ্জাগরণবাদ ও হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির সঙ্গে সংকীর্ণতাবাদী সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের

রাজনৈতিক আকাঙ্খার সংঘাতের মধ্য দিয়ে 'দুই জাতি তত্ত্বের' উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়।

আদি পর্বে মুসলিম লীগ উচ্চবিত্ত মুসলমান ভূস্বামীদের সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯১৩-এ মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসিত সরকার এবং ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রীতি দাবি করে আদি পর্বের সংকীর্ণতা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম লীগ কংগ্রেস-লীগ লখনৌ চুক্তি (১৯১৬) স্বাক্ষর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হোমরুল লীগের আন্দোলন এবং গদর বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে সাময়িকভাবে দুর্বল করেছিল। ১৯১৮ থেকে ১৯২২-এর বছরগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ভারতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনে সমর্থ হয়। এই সময় মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এই সময়কাল পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে সাম্প্রাদায়িক সংগঠনগুলির প্রভাব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় নি।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন স্থগিত রাখার পরেই ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে থাকে। মাঝপথে আন্দোলন স্থগিত বা প্রত্যাহার করা হলে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। এই ধরণের সামাজিক পট-ভূমিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের তিক্ততা দ্রুত প্রসার লাভ করে। ব্রিটিশ শাসক এবং সম্পত্তির মালিকেরা প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রঙে চিত্রিত করেছিল। মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের পর, অর্থাৎ ১৯২২-এর পর থেকে পার্লামেন্টারী রাজনীতি শুরু হলে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে আলাদাভাবে হিন্দু ও মুসমমান নেতাদের আবির্ভাব ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯২৬-এর পর ভারতে বামপন্থী আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন ও যুব আন্দোলন এবং সাইমন কমিশন বিরোধী গণ-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে সাময়িক-ভাবে প্রশমিত করেছিল। তিরিশের দশকের আইন অমান্য আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানেরা ভারতীয় হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কারাবরণ করেছিল। এই আন্দোলনে মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব মুসলমান প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরে দ্রুত ছাড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি মুসলমান প্রজারা আলোয়ারের মহারাজার

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। ১৯৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রেখে ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার রাজনীতি শুরু হলেই সাম্প্রদায়িক নেতারা ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সময় ব্রিটিশ শাসক সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতীয় রাজনীতির প্রধান প্রশ্ন হিসাবে চিহ্নিত করে। শাসন সংস্কারের আগে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা করার মেকি আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ শাসক সাম্প্রদায়িক নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের জনসমক্ষে তুলে ধরে।

আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু হলে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আবার পিছু হটতে থাকে। ১৯৩৩-৩৪-এ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হলে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সংখ্যালঘু অংশ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য সমর্থক। কারণ এই সময়কাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের বহু নেতা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তখনও পর্যন্ত মুসলিম লীগের ভূস্বামী নেতৃত্বের সঙ্গে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের কিছু মতপার্থক্য ছিল।

সংগ্রামী ভাবমূর্তি সামনে রেখে কংগ্রেস ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের অসারতা তুলে ধরে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কংগ্রেস ১৯৩৭-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই সময় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি তেমন মাথা চাড়া দিতে পারে নি। সেজন্য দেখা যায় ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস-লীগ অথবা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সাম্প্রদায়িক তিক্ততা নির্বাচনী প্রচারকে প্রভাবিত করতে পারে নি। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করে নি। এমনকি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ আশানুরূপ সমর্থন পায় নি। প্রদেশগুলিতে মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১০৮টি আসন লাভ করেছিল। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল তখনও পর্যন্ত এই দল মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমানের সমর্থন লাভ করে নি। অর্থাৎ, তখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন করে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম স্থগিত রাখে। এই সময় থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র

আকার ধারণ করতে থাকে। মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে (১৯৩৭) মহম্মদ আলি জিন্না ভারতের ৬টি প্রদেশে হিন্দু প্রধান মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির কর্মসূচী ও কার্যকলাপ ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায়বিচার লাভের সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছে।

কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরের বামপন্থী শক্তি তখনও পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল ছিল। এই শক্তি গণ-আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের কাছে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন সম্পর্কে সমঝোতা করার প্রস্তাব দেয়। বংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। জওহরলাল নেহেরু জিন্নাকে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন যে ভারতে দু'টি শক্তি বিদ্যমান। একটি হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরটি হল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তিনি ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম লীগকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সচেতন করার সক্রিয় ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। জওহরলাল কংগ্রেসকে মুসলমান জনগণের প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস মুসলমান জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয় নি।

জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক সংগঠন-রূপে স্বীকার না করলেও ১৯৩৭-এর পর থেকে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মহম্মদ আলি জিন্নার সুদক্ষ নেতৃত্বে মুসলিম লীগ উত্তরোত্তর ভারতীয় মুসলমান জনগণের সমর্থন পেতে শুরু করে। উত্তর প্রদেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমান, পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট দল এবং বাংলার কৃষক প্রজা সমিতি মুসলিম লীগের মধ্যে চলে আসে। ১৯২৭-এ মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩০০-এর মত। ভারতীয় মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও সংগঠনগুলিকে মহম্মদ আলি জিন্না ঐক্যবদ্ধ করে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা কয়েক লক্ষে দাঁড় করালেন। ফলে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনরূপে সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করল।

'দুই জাতি তত্ত্ব' ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

উনিশ শতকে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জাগরণবাদী আন্দোলন ভারতীয় মুসলমান-

দের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনা জাগরণে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়। মৌলবী আব্দুল হক গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন, বৈদিক সংস্কৃতি, বৈদিক ঐতিহ্য, বৈদিক ধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা রক্ষার জন্য দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ আন্দোলন 'দুই জাতি তত্ত্ব' উদ্ভবে সাহায্য করেছিল। স্বদেশী যুগের বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ থেকে শুরু করে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের কাল পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রতীক ও অনুষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে গান্ধীজী তখন নিজেকে একজন 'সনাতন হিন্দু' রূপে (a Sanatanist Hindu) বর্ণনা করলেন। কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রভাবশীল নেতা প্রকাশ্যে হিন্দু পুনরুজ্জাগরণবাদ প্রচার করলেন। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বরাবরই কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা সংকীর্ণতাবাদবিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'দুই জাতি তত্ত্বে'র সমর্থনে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করলেন। 'দুই জাতি তত্ত্ব' মহম্মদ আলি জিন্নার নতুন আবিষ্কার নয়। ১৯৩০-এর মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কবি ও দার্শনিক মহম্মদ ইকবাল ঘোষণা করলেন পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বালুচিস্তান প্রদেশগুলি একত্রিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হোক। তিনি বললেন ঃ 'উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের নিয়ে সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করাই আমার মতে মুসলমানের চূড়ান্ত নিয়তি (final destinity)।' তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে অথবা বাইরে মুসলমানদের জন্য স্বশাসিত পৃথক রাষ্ট্র দাবি করলেন। রহমত আলির নেতৃত্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা "*Now or Never*" (1933) নামক পুস্তিকায় ভারত বিভাগের একটি খসড়া প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল ঃ 'India is not the name of one single country, nor the house of one single nation'. সেজন্য তাঁরা মুসলমানের জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বিভক্ত করে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করেছিলেন।

মুসলিম লীগের নেতারা তখনও পর্যন্ত ইকবাল এবং রহমত আলির দাবির প্রতি কর্ণপাত করেন নি। ১৯৩৩-এ শাসন সংস্কার কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মুসলিম লীগের নেতারা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবিকে 'ছাত্রের

স্বপ্ন' ('students dream') এবং 'অসার ও অবাস্তব' ('chimerical and impracticable') দাবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭-এর নির্বাচন এবং ৬টি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠন মুসলিম লীগ নেতাদের 'দুই জাতি তত্ত্ব' প্রয়োগে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরদার করে।

মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের (১৯৪০) সভাপতির ভাষণে মহম্মদ আলি জিন্না 'দুই জাতি তত্ত্বে'র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ 'ভারতের সমস্যা আন্তঃসাম্প্রদায়িক ধরণের নয়, দৃশ্যত এই সমস্যা হ'ল আন্তর্জাতিক এবং আমাদের সামনে উন্মুক্ত একমাত্র পথ হ'ল প্রধান জাতিগুলির স্বতন্ত্র মাতৃভূমি গঠনে সহায়তা ক'রে ভারতকে "দু'টি স্ব-শাসিত জাতীয় রাষ্ট্রে" বিভক্ত করা।' তিনি ঘোষণা করলেন, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান কখনো একটি জাতি ছিল না।

জিন্না বললেন, হিন্দু ও মুসলমান স্বতন্ত্র দু'টি জাতি। কারণ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক প্রথা এবং সাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ঐতিহাসিক সূত্র থেকে ভাবগত অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। কারণ তাঁদের মহাকাব্য, জাতীয় বীর, ঐতিহাসিক জয় পরাজয় কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সেজন্য তিনি বললেন ঃ 'সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি জাতিকে একটি রাষ্ট্রে একত্রিত করে রাখলে ; ক্রমবর্দ্ধমান ধূমায়িত বিক্ষোভ, রাষ্ট্র সরকারের যে কাঠামো নির্মাণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করবে।' কারণ তিনি বললেন, যে সংবিধান হিন্দু প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার সৃষ্টি করবে সেই সংবিধানকে ভারতের মুসলমানেরা কখনো মেনে নিতে পারে না। তিনি হিন্দু প্রধান সরকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'হিন্দু রাজ' (Hindu Raj) বলে বর্ণনা করলেন।

জিন্না দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন ঃ 'জাতি সম্পর্কিত যে কোন সংজ্ঞায় মুসলমানেরা একটি জাতি ; তাদের স্বদেশ, তাদের ভূখণ্ড এবং তাদের রাষ্ট্র অবশ্যই থাকবে।' ধর্মভিত্তিক জাতি তত্ত্বকে প্রয়োগ করে তিনি মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র মাতৃভূমি ও রাষ্ট্র দাবি করলেন। লাহোর অধিবেশনে তিনি মুসলমানের জন্য পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবি করলেন। ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলির জন্য স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কর্মসূচী তিনি পেশ করলেন।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ

ভারতের সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রচারের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তার স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ শাসক সাম্প্রদায়িক দাবিকে মদত দেয়। সেজন্য দেখা যায় ধর্মের ভিত্তিতে 'দুই জাতি তত্ত্ব' ভারতের রাজনীতিতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জিন্না ও মুসলিম লীগের কৃতিত্ব হল তাঁরা 'দুই জাতি তত্ত্বে'র সমর্থনে তিরিশের দশকের শেষের দিক থেকে ভারতের মুসলমান জনগণকে সমবেত করতে পেরেছিলেন। 'জিন্নার প্রধান বক্তব্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য অত্যন্ত গভীর ও একান্ত-ভাবে ঐতিহাসিক। এই পার্থক্যের কোন সাংবিধানিক সমাধান নেই। একমাত্র সমাধান হল মুসলমানদের একটি পৃথক জাতিরূপে স্বীকার করে এবং সেই ভিত্তিতে তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া।'

ধর্মীয় উপাদানকে ভিত্তি করে জিন্না 'দুই জাতি তত্ত্ব' প্রচার করলেন। ধর্মকে একমাত্র জাতি গঠনের উপাদান মনে করা জাতি গঠন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা মাত্র। ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে ভারতে 'দুই জাতি তত্ত্ব' প্রয়োগ করলে কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়। সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা ছড়িয়ে আছে। উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য প্রাচ্য পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমানদের বসবাস। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একটি মাত্র রাষ্ট্রে কেন সমবেত হবে না? জাতি গঠনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র ধর্মকে প্রাধান্য দিলে এই ধরণের অদ্ভুত ও অবাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

জাতি গঠন সম্পর্কে যে-কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করলে ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের কখনো একটি স্বতন্ত্র জাতি বলা যায় না। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের ভাষা, ভৌগলিক সীমানা বা অঞ্চল ও সংস্কৃতি বোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ভাষাগতভাবে পূর্বাঞ্চলের মুসলমানের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের কোন সাদৃশ্য নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান এবং বাঙালী মুসলমানের মধ্যে শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোন ব্যাপারে মিল নেই। অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। একই কারখানায় হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক কাজ করে। জমিদার, ও মহাজনের অত্যাচার থেকে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ মানুষ রেহাই পায় না। হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্র মানুষ সমানভাবে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করে।

ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন হিন্দু ও মুসলমানকে সমান ভাবে দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই ঐক্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করেছিল ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক পরিচয় (geographical expression), জাতি নয়। কারণ এখানে আছে অসংখ্য জাত-পাত (caste), ধর্মীয় সম্প্রদায়, উপজাতি এবং ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা সাম্রাজ্যবাদী যুক্তির বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন, ভারতবর্ষ একটি জাতি। 'ভারতবাসী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি' ধ্বনি দিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। 'দুই জাতি তত্ত্ব' ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদীবিরোধী জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল।

জাতি গঠন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা জিন্না ও মুসলিম লীগের 'দুই জাতি তত্ত্বকে' সমর্থন করে না। 'দুই জাতি তত্ত্ব' সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতিকে শক্তিশালী করেছিল। মনে রাখতে হবে, ভারতের ভাষা-সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীগুলির জাতি-চেতনা এবং মুসলিম লীগের ধর্ম-ভিত্তিক 'দুই জাতি তত্ত্ব' কখনো এক নয়। ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতি-চেতনার বিকাশ স্বভাবিক ও ঐতিহাসিক; ধর্মভিত্তিক 'দুই জাতি তত্ত্বের' দাবি অস্বাভাবিক ও বিভেদমূলক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গণ-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকলেও সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের মূল কাঠামোটি দুর্বল হয়ে পড়ে। বড় বড় ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতির স্বার্থে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির বহু কোটি মানুষকে নিপীড়ন ও শোষণের নতুন উপায় ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার সংকটকে দূর করতে খুবই সচেষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পশ্চিম ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়, ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সংকটাপন্ন করে। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি প্রবল আকার ধারণ করে। জরুরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও ব্রিটেন বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হয় নি। এই ঘাটতি সাম্রাজ্যের অর্থনীতিকে প্রায় দেউলিয়া করে তোলে।

ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে শোষণ ব্যবস্থাকে তীব্রতর করেও ব্রিটেন সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে নি। সাগর পারের দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য ব্রিটেনকে আরো অধিক পরিমাণে সামরিক খাতে ব্যয় করতে হয়, অধিকতর অস্ত্র উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, তার ফলে সামগ্রিকভাবে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ঘাটতি ও সংকট আরো বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মানুষের মধ্যে প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও উপনিবেশবিরোধী বিদ্রোহের মনোভাব জাগরিত হয়। তার ফলে সমগ্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সাধারণ সংকট দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের 'সামরিক দুর্ভেদ্যতার অতিকথাকে' চূর্ণ করে দেয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে ইউরোপীয় জাতিগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শেষে স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে, কেন তারা

নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী ফ্যাসিশক্তি অধিকৃত দেশগুলির মানুষেরা নিজেদের উদ্যোগেই জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ও গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি জাপানী হানাদার সমেত সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। যুদ্ধ শেষে জাপানী অধিকৃত দেশগুলিতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ পুনরায় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে গেলে সেখানকার মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করে।)

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমেত সমগ্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংকট তীব্রতর করে। চীন বিপ্লবের সাফল্য এবং জনগণতান্ত্রিক চীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সমগ্র এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পরাধীন দেশগুলির সপক্ষে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য পরিবর্তন করে দেয়। – সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র ও ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক সাহায্যপুষ্ট আরব লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দূর প্রাচ্যে কোরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম উত্তর কোরিয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যসহ বিশ্বের ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংকট ত্বরান্বিত করে।)

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্রিটেনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।, তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করে।) যুদ্ধশেষে পুঁজিবাদী বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থায় মার্কিন পুঁজি ৬০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন পুঁজি ৭৩ শতাংশে দাঁড়ায়। যুদ্ধশেষে ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যের বিশ্ব বাজার সংকুচিত হয়। ১৯৪৭ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ দাঁড়ায় ৩২·৬ শতাংশ এবং ব্রিটেনের অংশ দাঁড়ায় ১০·৩ শতাংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সূতীবস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অংশ ছিল ২৮ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল ৪ শতাংশ। ১৯৪৭ সালে বিশ্বে সূতীবস্ত্র রপ্তানি বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশভাগ দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ, ব্রিটেনের মোট রপ্তানি ১৪ শতাংশে নেমে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাহাজী শিল্পের

রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২ মিলিয়ন টনের বেশি জাহাজী শিল্পপণ্য রপ্তানি করে, ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ নেমে দাঁড়ায় প্রায় ১৮ মিলিয়ন টনে। বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাহাজী শিল্পের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রিটেনের একচ্ছত্র প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ায় সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বাজার, বিশ্ব বাণিজ্য পথ, কাঁচামালের উৎস এবং মূলধন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের শক্তি হ্রাস পায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন পুঁজিপতিরা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে তাদের অনুকূলে ব্যবহার করে ভারতীয় বাজারের সর্বত্র অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নেয়। এই সময় ভারতে জাপানী প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি মার্কিন পুঁজিকে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধ শেষে ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ প্রায় ৪ গুণ বেড়েছিল। বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমেত ভারতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকে তীব্র করায় সহায়ক হয়েছিল।

২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯৪৫-এর মে মাসে জার্মানী এবং আগস্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান সারা বিশ্বে গণ অভ্যুত্থানের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত সামরিক পরাজয় যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র বিশ্ব শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলে ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রবর্গের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্য হ্রাস পায়। ফ্যাসিবাদী শক্তির কবলমুক্ত হয়ে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলিতে প্রবল সংকট শুরু হয়। এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী গণ অভ্যুত্থান তীব্রতর আকার ধারণ করে। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার জনগণ সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম চালায়। ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লব চূড়ান্তভাবে জয়ী হয় এবং ঐ বছর প্রজাতান্ত্রিক চীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

যুদ্ধশেষে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক কারণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আফ্রিকা ও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির দুর্বলতা সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। জাপানী দখলদারীদের উৎখাতের সংগ্রাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়। এই সব ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে।

যুদ্ধ শেষে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনাবলী ভারতের রাজনীতিতে গতিবেগ সঞ্চার করলেও ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশের অনুসৃত ভারতনীতিতে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও প্রাধান্য বজায় রাখার যুদ্ধপূর্ব ব্রিটিশ নীতির পুনরাবৃত্তি দেখা গেল ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকার লর্ড লিনলিথগোকে সরিয়ে নিয়ে ১৯৪৩ সালে লর্ড ওয়াভেলকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত করে। ওয়াভেল ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ আরো কিছুদিন চলতে পারে মনে করে ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষকে ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। এশিয়ায় যুদ্ধ চলার অর্থ হল ভারতীয় যুদ্ধ ঘাঁটি ও অর্থ সম্পদের ব্যবহার অব্যাহত রাখা। ওয়াভেল বুঝেছিলেন যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে গেলে ভারতীয় জনগণ ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য রক্ষার মূলনীতিকে অপরিবর্তিত রেখে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা লাভে তিনি উদ্যোগী হন।

১৯৪৪-এর মে মাসে ওয়াভেল গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আটক আদেশ তুলে নেন। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশের নীতি প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে; যুদ্ধ শেষে একটি কমিশন গঠন করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে গণভোট নিতে হবে; ভারত বিভাগের প্রশ্নটি গণভোটের দ্বারা ঠিক করতে হবে। রাজাজীর প্রস্তাব অনুসারে গান্ধী ও

জিন্নার মধ্যে পত্রালাপ হয় এবং এই দু'ই নেতার মধ্যে সরাসরি আলোচনা হয়। গান্ধী-জিন্না আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্বাধীনতা লাভের রাজনৈতিক মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে জিন্না ভারত-বিভাগের সূত্রটি মেনে নেবার জন্য দাবি জানান। তাঁর অনমনীয় মনোভাব এবং অযৌক্তিক দাবির জন্য আলোচনাটি ভেঙ্গে যায়। এই আলোচনা চলাকালে ব্রিটিশ শাসক জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আরো ব্যবধান সৃষ্টি করায় সফল হয়।

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে ব্রিটিশ শাসক জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্যের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে পরামর্শ করার জন্য লণ্ডনে যান। তিনি জুন মাসে 'ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা' নিরসনে একটি ঘোষণা করেন। ওয়াভেলের ঘোষণাটি ১৯৪২ সালে ক্রিপ্স প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ওয়াভেলের প্রস্তাবে ভাইসরয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের পুনর্গঠনের কথা বলা হয়। পুনর্গঠিত কার্যকরী পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং এই পরিষদে ভাইসরয় ও সেনাধ্যক্ষ এই দু'জন ব্রিটিশ সদস্য থাকবেন ও বাকি সদস্যরা সবাই ভারতীয় হবেন। সর্বসম্মত নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ভারতের শাসনকার্য চালাবে।

নতুন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য ওয়াভেল ১৯৪৫-এর জুন মাসে সিমলায় ভারতীয় নেতাদের একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। ভাইসরয়ের কার্যকরী পরিষদের পুনর্গঠন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সিমলা বৈঠক ভেঙে যায়। জিন্না একগুঁয়েমি দেখিয়ে দাবি করলেন, পরিষদের মুসলমান সদস্যদের মুসলিম লীগের সভ্য হতে হবে। জাতীয় কংগ্রেস জিন্নার এই দাবি গ্রহণ করে নি। কারণ কংগ্রেস নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সংগঠন বলে বরাবর দাবি করে এসেছে। জিন্নার ভেটো প্রয়োগের ফলে নতুন প্রস্তাবের উপর আলোচনা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। জিন্নাকে অযৌক্তিক প্রস্তাব পেশের সুযোগ দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে জাতীয়তাবাদী নেতারা সমালোচনা করেন। সিমলার বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকেই এর জন্য দায়ী করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবৈষম্য বৃদ্ধি করে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েই ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখার পরিকল্পনা আপাতত সফল হয়।

যুদ্ধ শেষে গ্রেটব্রিটেনে ১৯৪৫ সালে সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়লাভ

করে ক্ষমতায় আসে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের সামরিক শক্তি ও অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তর ভারতের বিস্ফোরক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরোণো কায়দায় সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভব নয় অনুমান করে প্রধানমন্ত্রী এটলী ওয়াভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান। লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পর ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরে লর্ড ওয়াভেল এটলী সরকারের প্রথম ভারতনীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়ঃ ১. ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুসারে আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন হবে এবং দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হবে; ২. সংবিধান-প্রণয়ণ যথাসম্ভব শীঘ্র ডাকা হবে; ৩ ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে ভাইসরয় সংবিধান-প্রণয়ন সভা গঠন করবেন।

ভারতের জাতীয় আকাংখা ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর এই দলের প্রথম ভারতনীতি ঘোষিত হয়। এই নীতিতে নতুন কিছুই ছিল না। ১৯৪২ সাল থেকে ঘোষিত ব্রিটিশ শাসকের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার নীতি ১৯৪৫ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। লর্ড ওয়াভেলের মারফত ঘোষিত লেবার পার্টির ভারতনীতি পূর্বেকার সাম্রাজ্য রক্ষার ব্রিটিশ নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার সাক্ষ্য বহন করে।

৩ ক্যাবিনেট মিশন, অন্তর্বর্ত্তীকালীন সরকার ও ভারতের রাজনীতি

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর ভারতে ব্রিটিশবিরোধী গণ-আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে ব্রিটিশ সরকার তার ভারত সংক্রান্ত পরিকল্পনা রদবদলে বাধ্য হয়। ১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ভারতে একটি বিশেষ সরকারি প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা কমন্স সভায় ঘোষণা করেন। ভারতসচিব পেথিক লরেন্স, নৌবাহিনীর প্রধান লর্ড আলেকজাণ্ডার ও বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট মিশনকে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়গুলিকে আলোচনার জন্য ভারতে প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ বেশির ভাগ মুসলমান আসনগুলিতে জয়ী হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ (অমুসলমান) আসনগুলিতে জয়ী হয়। কংগ্রেস বাংলাদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। পাঞ্জাবে কংগ্রেস, শিখ এবং অন্যান্য দলগুলি মিলিতভাবে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সমর্থক খান আবদুল গফুর খানের দল মুসলমান আসনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ১৩ শতাংশের কম মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। এই নির্বাচনের রায় প্রমাণ করল যে ঃ ১ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী ; ২ অমুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির বেশির ভাগ মুসলমান ভোটদাতা মুসলিম লীগের সমর্থক ; ৩ মুসলিম লীগ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এই নির্বাচনের সাফল্যে মুসলিম লীগ তার ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অপরদিকে প্রায় সমস্ত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন করে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় ঐক্যের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে মুসলিম লীগ এককভাবে প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে পারে নি। এই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে যোগ দেয় এবং ৯টি আসনে জয়ী হয়।

লেবার পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী এটলীর ভারত সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে। মিশনের সদস্যরা ভাইসরয়, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ভারতের ভবিষ্যত সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে নেতারা শেষ পর্যন্ত ঐকামতে পৌঁছতে পারেন নি। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে অটল ছিল, অপরদিকে জাতীয় কংগ্রেস জিন্নার 'দুই-জাতি তত্ত্বকে' প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছিল। ক্যাবিনেট মিশন জিন্নার পাকিস্তানের দাবিকে খারিজ করে দেয়। কারণ ক্যাবিনেট মিশনের মতে ঃ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান নয় ; পাকিস্তানের মধ্যে বাংলা, আসাম এবং পাঞ্জাবের অমুসলমান জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় ; দেশবিভাগ ভারতের ডাক-তার, পরিবহন বিভাগ ও সামরিক বাহিনীকে অযৌক্তিকভাবে বিভক্ত করবে।

ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টি ঐক্যমতে আসতে না পারলে ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের মে মাসে নিজে থেকেই ভারতের সাংবিধানিক বিষয়ের উপর সুপারিশ করে। ভারতীয় ঐক্য বজায় রাখা এবং সেই সঙ্গে মুসলিম লীগের দাবিকে যথাসম্ভব মেনে নেওয়ার নীতি ক্যাবিনেট মিশন গ্রহণ করে। ক্যাবিনেট

মিশনের সুপারিশে ভারত বিভাগের দাবি প্রত্যাখ্যাত হলেও সাম্প্রদায়িকতার মূল দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাখ্যাত হয় নি। এই সুপারিশে ভারতে ফেডারেল ইউনিয়ন গঠনের কথা বলা হয়। ভারত ডোমিনিয়ন সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হবে। কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। বাকি সমস্ত ক্ষমতাগুলি প্রদেশগুলির হাতে থাকবে। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি এলাকাভুক্ত করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে প্রথম এলাকা ; মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে দ্বিতীয় এলাকা এবং বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত হবে তৃতীয় এলাকা।

চীফ কমিশনার শাসিত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি প্রথম এলাকায় এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি দ্বিতীয় এলাকায় যোগ দেবে। ধর্মভিত্তিক ভারতে তিনটি এলাকা গঠনের প্রস্তাব মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির মর্মবস্তুকে প্রতিফলিত করে। সংবিধান-প্রণয়ন সভা যতদিন না পর্যন্ত একটি নতুন সংবিধান প্রস্তুত করছে ততদিন একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। সংবিধান-প্রণয়ন সভার সদস্যরা ধর্মীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ এই তিন ধর্মভিত্তিক নির্বাচনী এলাকা গঠন করে সংবিধান-প্রণয়ন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে খুবই অসুবিধায় পড়ে যায়। এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেও মুসলিম লীগ সার্বভৌম পাকিস্তান গঠনের দাবিতে অবিচল থাকে। অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের সদস্য নির্ধারণের নীতিকে কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু নতুন সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান-প্রণয়ন সভায় যোগদানে সম্মত হয়। মুসলিম লীগ ভাইসরয়কে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করে। জাতীয় কংগ্রেস অংশগ্রহণ না করলে ভাইসরয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে অসম্মত হন। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার আইনগত ব্যাখ্যা সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণে অসম্মতি জানায়।

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকৃত হলে ভাইসরয় কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুকে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের

জন্য আহবান জানান। এই সরকার গঠন সম্পর্কে মুসলিম লীগ তার তীব্র প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে। জিন্নার মতে এটি হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তিনি ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগষ্টকে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির সমর্থনে' প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) বলে ঘোষণা করেন। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে। ব্যাপক হারে হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা জাতীয় ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে।

জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার ১৯৪৬ সালে ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করে। ভাইসরয় মুসলিম লীগকে এই সরকারে যোগ দিতে রাজী করান। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শুরু থেকেই সংকটে পড়ে। মুসলিম লীগ প্রকাশ্যেই যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতিকে অস্বীকার করে। এই সময়ে পূর্ব বাংলার নোয়াখালি এবং পরে বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র আকার ধারণ করে। অচিরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মহামারীর মত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা প্রশমণে গান্ধীজী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালে সাময়িকভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরে আসে। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত প্রয়াস ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে আছে।

মুসলিম লীগের সদস্যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেওয়ার পর মনে হয়েছিল তাঁরা সংবিধান-প্রণয়ন সভায় অংশগ্রহণ করবেন। সবাইকে বিস্মিত করে মুসলিম লীগ জানালো যে সংবিধান-প্রণয়ন সভায় তাঁদের সদস্যারা যোগ দিচ্ছেন না। অনেক আলাপ আলোচনার পর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল, সংবিধান-প্রণয়ন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় নতুন সংবিধান মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে প্রযোজ্য হবে না। এই ঘোষণায় মুসলিম লীগ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয় এবং জিন্না সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠেন।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বরে সংবিধান-প্রণয়ন সভা প্রথম মিলিত হয়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি নির্বাচিত করে। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই এই সভা গঠিত হয়। সংবিধান-প্রণয়ন সভা বয়কট করার জন্য কংগ্রেস মুসলিম লীগের সদস্যদের অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার থেকে পদত্যাগ দাবি করে। অপরদিকে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির স্বপক্ষে তীব্র প্রচার চালায়। জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায়

বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়।

লেবার পার্টির ভারত সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘোষণার পর ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এলে প্রধান দু'টি দলের নেতারা ঐক্যমতে পেঁছিতে পারেন নি। মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের দাবিতে অবিচল থাকলে সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনার সুষ্ঠ মীমাংসা সম্ভবপর হয় নি। ফলে ক্যাবিনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে নি। ব্রিটিশ সরকার বিশ্বে প্রচার করেছিল যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসা হয় নি বলেই জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় কতকগুলি সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। জাতীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি সম্পর্কে কোন ঘোষণা এতে ছিল না। সংবিধান-প্রণয়ণ সভা গঠনের ভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের সীমিত ভোটাধিকার ব্যবস্থা। সর্বজনীন ভোটাধিকারের গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করে ক্যাবিনেট মিশন সংবিধান-প্রণয়ণ সভা গঠনের প্রস্তাব দেয় নি। রাজন্যবর্গ শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশীয় রাজ্য-গুলিতে নামমাত্র গণতন্ত্র ছিল না। রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা সংবিধান প্রণয়ণ-সভায় যোগদানের অধিকার পেলেন। ভারতকে ধর্মভিত্তিক তিনটি এলাকায় বিভক্ত করার পরিকল্পনা সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন দিয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য বজায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পেলে নতুন সংবিধান বলবৎ করার কথা বলা হয়েছিল।

মুসলিম লীগের দাবি ও কর্মসূচীর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতির অভাব ছিল না। ব্রিটিশের পক্ষে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন পুরানো কায়দায় চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না জেনে তারা এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজছিল যাতে দেশটি অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা দীর্ঘকাল বজায় থাকে।

৪. গণ-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি

চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের গণ-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ ও প্রাণসঞ্চার ঘটে। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিস লীগের নেতারা ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এবং সংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ

আলোচনা চালিয়েছিলেন। এই সময় সংগ্রামমুখী গণ-আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করে। শুধুমাত্র জাতীয় নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের উচ্চ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষি ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র কারণ ছিল না। সুভাষচন্দ্র বসু গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং সেই বিচারের প্রহসনকে কেন্দ্র করে গণ-জাগরণ ও ছাত্র আন্দোলন, ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর ঐতিহাসিক বিদ্রোহ এবং তাকে কেন্দ্র করে অভূতপূর্ব শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলন, সারা ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় কৃষক আন্দোলন এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

ক আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার : গণ জাগরণ ও ছাত্র আন্দোলন

জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যখন আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তাঁর প্রচারকার্য চালাচ্ছে সেই সময় ব্রিটিশ সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও অফিসারদের রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁদের বিচার শুরু করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় সায়গল, শাহনওয়াজ ও ধীলনের বিচার শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসক আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দু মুসলমান ও শিখ অফিসারদের বিচার শুরু করে দেয়। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থন করে আদালতে আইনের সব রকম সাহায্য দেয়। জওহরলাল নেহরু, তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ নেতারা আদালতে ব্যবহারজীবীরূপে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও অফিসারদের সমর্থন করেন।

প্রকাশ্য আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার সারা ভারতে অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঘৃণা এবং দেশপ্রেমের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। এই বিচারের ববরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ভারতীয়রা আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক সংগঠন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের কথা জানতে পারে। ১৯৪৫-এর নভেম্বরে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করে। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার সহানুভূতি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করলে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃত্ব খুবই বিব্রত

বোধ করে। ভারতীয় সৈনিকদের ফরাসী এবং পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন রক্ষায় ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরণ করা হলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দেয়। সেজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন বোধ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহানুভূতি ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে অবশ্য কারাদণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত নেতাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু সংখ্যক নেতাকে ব্রিটিশ সরকার মুক্তি দিতে অস্বীকৃত হলে প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশে সর্বত্র বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী ঘৃণা প্রকাশ পায়। কলকাতায় ২১শে অক্টোবর তারিখটি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে পালিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্ত করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের নেতা জওহরলাল নেহরুর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কংগ্রেস নেতারা গণ-আন্দোলন এবং বিক্ষোভ মিছিল সমর্থন করেন নি। তাঁরা মনে করেছিলেন আলাপ আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ যখন এসেছে তখন বিক্ষোভ ও আন্দোলনে শক্তি অপচয় করা সঙ্গত নয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে সংগ্রামমুখী ছাত্র আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। ফরোওয়ার্ড ব্লক সংগঠিত এক ছাত্র মিছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দীদের মুক্তি দাবি করে সারা রাত ধর্মতলা স্ট্রীটে বসে থাকে। এই ছাত্র মিছিলে ছাত্র ফেডারেশন পরিচালিত বিপুল সংখ্যক ছাত্র যোগ দেয়। মুসলিম লীগ পরিচালিত ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট সমর্থক ছাত্রদের বিরাট মিছিলে ধর্মতলা স্ট্রীট মুখর হয়ে ওঠে। ছাত্র জমায়েতে পুলিশ গুলি চালালে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ছাত্র নিহত হন। পরের দিন শিখ ট্যাক্সি চালক এবং ট্রাম শ্রমিকরা সম্পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৪৫ সালের ২১ থেকে ২৩ শে নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দী মুক্তি আন্দোলন ছাত্র ও শ্রমিকের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগিয়েছিল।

১৯৪৫-এর ১-লা ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও নেতাদের ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগ পরিবর্তন করে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এনে বিচারের কথা ঘোষণা করে। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আজাদ

হিন্দ ফৌজের নেতাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ১৯৪৬-এর জানুয়ারি মাসে কমিয়ে দেওয়া হয়। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আজাদ হিন্দ ফৌজের আবদুল রসিদের মুক্তির দাবিতে মুসলিম লীগের ছাত্রশাখা ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই ধর্মঘট ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সমর্থনে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। কলকাতার হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্য সাধারাণ ধর্মঘটের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আবদুল রসিদের মুক্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিস্থিতি ব্রিটিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে ৮৪ জন নিহত এবং ৩০০ জন ব্যক্তি আহত হন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও নেতাদের বিচার ভারতে গণ-জাগরণ ঘটায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিক ও নেতাদের মুক্তির দাবিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য মানুষেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

খ. নৌ-বিদ্রোহ

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর রাজকীয় আনুগত্যকে দুর্বল করে দেয়। সামরিক বাহিনীর আনুগত্য দুর্বল হয়ে পড়লে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আর কিছু থাকে না। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের মূল স্তম্ভ হল সামরিক বাহিনী। আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম এবং লালকেল্লায় তাদের বিচার ভারতীয় পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সৈনিকদের প্রভাবিত করে। কলকাতার কাছে দমদম বিমান ঘাঁটিতে সর্বপ্রথম রাজকীয় বিমান বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা ইংরেজ অফিসারদের কাছ থেকে হুকুম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যুদ্ধশেষে এটাই ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকার করার ঘটনা।

এর পরেই ১৯৪৬ সালে ১৮ই থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে প্রকৃতপক্ষে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই ঘাঁটিটিতে ব্যাপকভাবে

বর্ণবৈষম্য অনুসৃত হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নাবিকরা বিশ্বের বহু বন্দরে গিয়ে নৌবাহিনীর স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং যুদ্ধোত্তর ভারতের গণ-অভ্যুত্থান ভারতীয় নাবিকদের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে সচেতন করে, এবং ব্রিটিশের বর্ণবৈষম্য নীতি সমগ্র নৌবাহিনীতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাই বন্দরের 'তলোয়ার' নামে নৌ-প্রশিক্ষণ জাহাজে নাবিকেরা খারাপ খাদ্য ও বর্ণগত অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনশন ধর্মঘট শুরু করে দেয়। পরের দিন এই ধর্মঘট বোম্বাই বন্দরে নোঙর করা ২২টি জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘটী নাবিকরা জাহাজের মাস্তুলে ত্রিবর্ণ, সবুজ এবং কাস্তে-হাতুড়ির লাল পতাকা তুলে দেয়। নৌ-প্রশিক্ষণ জাহাজের শিক্ষার্থী নাবিকেরা এম এস খানের নেতৃত্বে একটি ন্যাভাল সেণ্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি গঠন করেন। তাঁরা ভাল খাদ্য, ব্রিটিশ নাবিকের মত ভারতীয় নৌবাহিনীতে সমান হারে বেতন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর প্রত্যাহার ইত্যাদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিগুলি পেশ করেন।

নৌ-প্রশিক্ষণ জাহাজের নাবিকেরা তখনও পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের পথে অথবা ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহের পথের কোনটিতে যাবে তা স্থির করতে পারেন নি। তাঁরা ২০শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নের মধ্যে জাহাজগুলির ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার সরকারী হুকুম অমান্য করেছিলেন। শীঘ্রই তাঁরা দেখলেন যে সশস্ত্র সামরিক পাহারাদাররা জাহাজগুলিকে ঘিরে ফেলেছে। পরের দিন অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি নাবিকেরা সশস্ত্র পাহারার ব্যূহ ভেদ করে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। জাহাজ থেকে বিদ্রোহীদের সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়। বিদ্রোহ দমনে এ্যাডমিরাল গডফ্রে বোমারু বিমানে ঘটনাস্থলে চলে আসে এবং বিদ্রোহী নাবিকদের জাহাজগুলি ধ্বংস করার হুমকি দেয়।

বোম্বাই বন্দরের নোঙর রত জাহাজের ভারতীয় নাবিকদের ধর্মঘট এবং পাহারাদার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ বোম্বাই শহরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। শহরের দোকানীরা ধর্মঘটী নাবিকদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে থাকে। বোম্বাইয়ের সর্বস্তরের মানুষ বিদ্রোহী নাবিকদের সমর্থন জানায়। ২২শে ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট দেশের সমস্ত ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সমুদ্রে চলমান কয়েকটি জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। করাচী বন্দরে

গোলা যুদ্ধের পর 'হিন্দুস্তান' জাহাজটি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে। বিদ্রোহী নাবিকদের সমর্থনে হিন্দু ও মুসলমান, ছাত্র ও শ্রমিক শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

বোম্বাই ও করাচী বন্দরের ভারতীয় নাবিকদের ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ এবং সশস্ত্র যুদ্ধ সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন গতিবেগ ও প্রাণ সঞ্চার করে। নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অরুণা আসফ আলি এবং অচ্যুত পটবর্ধন প্রমুখ নেতারা তাকে সমর্থন জানান। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নৌ-বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বোম্বাইতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের ফলে শহরের পরিস্থিতি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে শ্রমিক ও জনতার খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসককে দুই ব্যাটেলিয়ান সেনাবাহিনী রাস্তায় নামাতে হয়। সরকারি হিসাব মত পুলিশ-সামরিক বাহিনীর সঙ্গে জনতার খণ্ড যুদ্ধে ২২৮ জন নিহত এবং ১000 জনের বেশি মানুষ আহত হয়।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের জাতীয় নেতৃত্ব নৌ-বাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম সমর্থন করেন নি। বল্লভভাই প্যাটেল এবং মহম্মদ আলি জিন্না বিদ্রোহী নাবিকদের অচিরে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেন। তাঁরা বিদ্রোহী নাবিকদের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা যাতে না নেওয়া হয় তার আশ্বাস দেন। অবশ্য এই আশ্বাস ব্রিটিশ সরকারকে বিদ্রোহী নাবিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় নিবৃত্ত করে নি। গান্ধীজী শিক্ষার্থী নাবিকদের ধর্মঘটকে নিন্দা করেছিলেন। তিনি এই বিদ্রোহকে ভারতে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের রাজকীয় নৌ-বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গৌরোবজ্জ্বল অধ্যায়। আশ্চর্যের বিষয় নৌ-বিদ্রোহের নায়কদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নৌবাহিনীর নাবিকরা বোম্বাই ও করাচীর রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রামরত সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করেছে ও রক্ত দান করেছে। ধর্মঘটী নাবিকদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শেষ বারের

মত বলা হল: 'আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের এই ধর্মঘট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রথম সামরিক বাহিনীর জওয়ানের সঙ্গে রাস্তার মানুষের রক্ত একত্রিত হয়ে একই উদ্দেশ্যে গড়িয়ে পড়ল।'

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর ১৯৪৬-এ প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি অংশ প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে গণ-আন্দোলন এবং ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসককে নিদারুণ শংকিত করেছিল। সাম্রাজ্যের প্রধান ভিত্তি ভূমি হল সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্বিচার আনুগত্য। ভারতের নৌ-বিদ্রোহ সেই আনুগত্যকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। ব্রিটিশ শাসক বুঝতে শুরু করল শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর আনুগত্যের উপর নির্ভর আর সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না। বিপ্লব বা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য একেবারে হাতছাড়া হবার আগেই আলাপ আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করার উপর তারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

গ. শ্রমিক আন্দোলন : ১৯৪৫-৪৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি ও রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ফ্যাসি-বাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগ থেকে শ্রমিক ধর্মঘটে পুনরায় নতুন গতিবেগের সৃষ্টি হয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। এই সময় শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম ছাত্র ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে একীভূত হয়ে একটি সর্বাঙ্গীন ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৪৫ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়েছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠী-

গুলির নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বরাবরই অংশগ্রহণ করে এসেছে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সাইমন-কমিশন বিরোধী আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। চল্লিশের দশকের মধ্য ভাগ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট ও বিক্ষোভগুলি অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল।

কলকাতা, বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য শহরগুলিতে শ্রমিক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে সারা দেশে ইন্দোনেশিয়া দিবস পালন করা হয়। এই সময়ে ডক শ্রমিকরা ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরণের জন্য সামরিক পণ্যসামগ্রী জাহাজে বোঝাই করতে অস্বীকৃত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দেয়। পরিবহন ও পৌরকর্মীরা ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় শহরে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বহুক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুসলমান অফিসার আব্দুল রসিদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছাত্র ধর্মঘট হলে শ্রমিক শ্রেণী তাতে যোগ দেয় এবং রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে ব্রিটিশের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর নাবিকরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নাবিকদের কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটি ধর্মঘটের ডাক দিলে ২২শে ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণী এবং জনগণের অন্যান্য অংশ উদ্দীপনার সঙ্গে ঐ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নাভিশ্বাস ঘটায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘটী নাবিকদের সমর্থনে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে সারা ভারতে গণ-আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করে সেই সময় শ্রমিক শ্রেণীকে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখা যায়। যুদ্ধ শেষে সামরিক পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত হ্রাস পেলে উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয় এবং তার ফলে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা প্রাক্-যুদ্ধকালের

তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধশেষে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে ছাঁটাই এবং মজুরি হ্রাসের মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধের সময় শ্রমিকরা আন্দোলন করে জীবনযাত্রা ভিত্তিক বোনাস আদায়ে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য এই বোনাস যুদ্ধকালীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চড়া হারের অনেক নীচে ছিল। যুদ্ধ শেষে দেশী ও বিদেশী শিল্প মালিকরা মূল্য বৃদ্ধির জন্য বোনাস ও মহার্ঘ ভাতা দিতে অস্বীকার করে। তারা সমস্ত অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিতে চায়। বাজারে যুদ্ধসামগ্রীর চাহিদা না থাকায় ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থার শ্রমিকরা খুবই অসুবিধায় পড়ে যায়। ১৯৪৩-৪৪-সালে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় মজুতদার-মুনাফালোভীদের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষের ফলে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত গ্রামের মানুষ শহরে ভিড় করলে শ্রমিক শ্রেণী মজুরির উপর তার প্রতিকূল প্রভাব পড়ে।

যুদ্ধোত্তর ভারতের এই পরিস্থিতিতে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ছাঁটাই বন্ধ, ন্যূনতম বেতন ধার্য, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ, মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতা জুড়ে দেওয়া প্রভৃতি দাবি-গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু করে দেয়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা-গুলির শিল্পাঞ্চল, বিহার, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য শ্রমিকেরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালে দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত সহ কলকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের কলকারখানায় কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। এই বছর ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে নারিকেল প্রসেসিং শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তার ফলে পুলিশের গুলিতে বহু শ্রমিক ও কর্মী নিহত হয়। এই সব ধর্মঘটগুলি ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম হিসাবেই জনমানসকে প্রভাবিত করে।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দেয়। এই তরঙ্গ-গুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হিসাবে ভারতের ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকার ডাক ও তার বিভাগে বেতনের কাঠামো ও চাকুরির

শর্তাবলীর দীর্ঘকাল কোন পরিবর্তন করে নি। তার ফলে ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়। ১৯৪৬ সালে ডাক ও তার বিভাগের লোয়ার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়ন ১৬-দফা দাবির ভিত্তিতে ১১ই জুলাই থেকে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দাবির বিষয়গুলিকে সালিশীতে প্রেরণ করে এবং প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে ধর্মঘটে যোগ দিলে শ্রমিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে দমন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়। সরকারের হুমকি, দমননীতি ও প্ররোচনা অগ্রাহ্য করে ১১ই জুলাই সারা ভারতের ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু হয়।

ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে সারা ভারত টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ১১ই জুলাই-এ লোয়ার গ্রেড ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন প্রবল আকার ধারণ করেছে ঠিক সেই সময় ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট সারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক উৎসাহের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই ঐ ধর্মঘট সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সমর্থন করার জন্য ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে আহ্বান জানালে বাংলা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজে সহানুভূতিসূচক সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়।

যুদ্ধশেষে শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্রিটিশ শাসককে প্রবলভাবে আতঙ্কিত করে। এই সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাত শুরু হয়ে যায়। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থী নেতৃত্ব সংগ্রামমুখী শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব শান্তিপূর্ণ ও আপোষের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার উপর সমধিক গুরুত্ব দেন। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় কংগ্রেস সমর্থক নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন। তার ফলে ১৯৪৭ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়।

১৯৪৭-এর ৩রা ও ৪ঠা মে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি জে. বি. কৃপালনী, হিন্দুস্তান মজদুর সেবক সংঘের সভাপতি

সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল, সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসেরই অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল।

ঘ. কৃষক আন্দোলন

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতের কৃষক আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ শাসনের বনিয়াদকে দুর্বল করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৫ সালে বোম্বাই-এর থানা জেলার অন্তর্গত দহনু এবং উমবারগাঁ তালুকে ভারলিস আদিবাসীদের বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালে বাংলার কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলন, উত্তর-দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা-ভায়ালার অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহ এবং হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতকে আঘাত করেছিল।

১৯৪৫ সালে বোম্বাই-এর দহনু ও উমবারগাঁ তালুক দু'টিতে জঙ্গলের ঠিকাদারদের শোষণ ও উৎপীড়ন এবং ব্রিটিশ আমলা সমর্থিত দেশীয় সুদখোর মহাজন, জমিদার ও ধনী কৃষকদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ভারলিস আদিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভারলিস আদিবাসীরা এই সর্বপ্রথম তীব্র শোষণ ও ক্রীতদাসের মত জীবনধারণের প্রতিবাদে জঙ্গলের কাঠ ব্যবসায়ী এবং জমিদারের বিরুদ্ধে দু'মাসের বেশি কাজ বন্ধ করে লাগাতার ধর্মঘট চালায়। ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও অনুন্নত আদিবাসীদের শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা ও ঐক্য সম্যকরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে সারা ভারতে কৃষির অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, কৃষিক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন ১০ কোটি মানুষের এলাকায় আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করে। খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের দর ফাটকাবাজির জন্য বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের দুর্গতি, আর্থিক অনটন ও বিক্ষোভ খুবই বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সারা ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের বোঝা ভারতের কৃষকদের বহন করতে হয়। সেজন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সংগঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ফ্লাউড কমিশনের (Floud Commission) সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ফ্লাউড কমিশন ভাগচাষীকে উৎপন্ন

শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ দেবার জন্য সুপারিশ করে। কৃষক সভা জোতদারের জমিতে কর্মরত বর্গাদার, ভাগচাষী অথবা আধিয়ারকে উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তে-ভাগা আন্দোলন নামে সমধিক পরিচিত। দুর্ভিক্ষ এবং অর্থনৈতিক মন্দার জন্য বাংলার গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র চাষী ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছিল। যেসব অঞ্চলে ভাগচাষীর সংখ্যা ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল সেইসব অঞ্চলগুলিতে তে-ভাগা আন্দোলন জোরদার হয়। নভেম্বর মাসে ধান কাটার পর ভাগচাষী জোতদারের খামারে ধান না তুলে নিজেদের গোলায় দুই-তৃতীয়াংশ ধান তুলে নেয়।

১৯৪৬-এর শীতকালে তে-ভাগা আন্দোলন আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরণ ঘটায়। কৃষক সভা তে-ভাগা দাবির সঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং বর্গাচাষীকে জমির মালিক করার দাবিকে যুক্ত করে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে বাঙলার ১৯টি জেলায় তে-ভাগা আন্দোলন প্রসারিত হয়। তার মধ্যে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, যশোর, চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনী-পুর জেলায় ৩ ভাগ ফসলের দাবিতে কৃষকের আন্দালন অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। একই সময়ে ময়মনসিং-এর উপজাতি কৃষকেরা 'টাংকা' আন্দোলন শুরু করে দেয়। সামুদ্রিক ঢেউ-এর মত জেলায় জেলায় তে-ভাগা ছড়িয়ে পড়ে ভাগ-চাষীদের মধ্যে। তাদের প্রধান সহযোদ্ধা হল ক্ষেতমজুররা। প্রায় ৭০ লক্ষ কৃষক সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেয়। যেখানে জোতদারী শোষণ তীব্র হয়েছিল এবং ভাগচাষীদের সংখ্যা খুব বেড়েছিল প্রধানত সেই সব অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলন তীব্র সংগ্রামের আকার ধারণ করেছিল।

উত্তরবঙ্গে তে-ভাগা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দিনাজপুরের ঠাকুর-গ্রাম মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও মালদা জেলাগুলিতে প্রায় প্রত্যেকটি ভাগচাষী তে-ভাগা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ময়মনসিংহ, মেদিনীপুরের মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম এবং চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপে তে-ভাগা আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাজ-বংশী ভাগচাষীরা তে-ভাগা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তে-ভাগা আন্দোলনের ফলে বড় বড় জোতদাররা খুবই আতংকিত হয়ে পড়ে। ভাগচাষীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ধান আদায়ের আন্দোলন খুবই জনপ্রিয় হয়। তে-ভাগা আন্দোলন ভাগচাষীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের রূপ নেয়। তে-ভাগা আন্দোলনে মোট প্রায় ৭০ জন কৃষক—হিন্দু, মুসলমান ও

আদিবাসী পুরুষ ও নারী—প্রধানত পুলিশের গুলিতে এবং জোতদারের গুলিতে নিহত হন। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই শহীদ হলেন ৪০ জন কৃষক। ১২০০ কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আহত হল প্রায় ১০০০০ কৃষক।

কলকাতা এবং নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার ঊর্ধ্বে উঠে হাজী মহম্মদ ধানেশ, নিয়ামৎ আলি প্রমুখ মুসলমান ভাগচাষী তে-ভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এমনকি মৌলভীরা পর্যন্ত কোরাণ উদ্ধৃত করে জোতদারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের সমর্থন করেন। ব্রিটিশ শাসক ও জোতদারের উৎপীড়ন ও হিংসাত্মক আক্রমণের ফলে বহু ভাগচাষী তে-ভাগা আন্দোলনে শহীদ হন। দুই-তৃতীয়াংশ ধান আদায়ের তে-ভাগা আন্দোলন মূলতঃ অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও জোতদার ও ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনটি পরিচালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক-যুবক-কৃষক-ছাত্র-মহিলাদের মত বাঙলার হিন্দু-মুসলমান উপজাতির কৃষকেরা কৃষকসভার নেতৃত্বে সামন্তবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে, ব্রিটিশ শাসককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তীব্র গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা-ভায়ালার অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে কমিউনিস্টরা কৃষিকার্যে নিযুক্ত দিন মজুরদের সংগঠিত করে। ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান রামস্বামী আয়ার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর অনুকরণে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক আইনসভা এবং এই দেশীয় রাজ্যের মহারাজার মনোনীত ব্যাক্তিকে প্রধান প্রশাসক নিয়োগ করার একটি খসড়া সংবিধান প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলে ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যটি যাতে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চাভিলাষী দেওয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করাই ছিল তার একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলেপ্পি অঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন ও দমননীতি চালানো হয়।

আত্মরক্ষার জন্য আলেপ্পি অঞ্চলের কৃষকরা শিবির গড়ে তোলে। এই শিবিরে স্বেচ্ছাসেবকদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অক্টোবর মাসে সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হবার পর আত্মরক্ষার শিবিরের স্বেচ্ছাসেবকরা লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পুন্নাপ্রা থানা আক্রমণ করে। পুলিশের সঙ্গে কৃষক স্বেচ্ছাসেবকের

সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। কয়েকদিন পর সামরিক আইন জারি করা হয় এবং ভায়ালার স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে বহু শত কৃষককে হত্যা করে।

পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের কৃষক বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ত্রিবাংকুর দেশীয় রাজ্যকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেয়। সশস্ত্র বিদ্রোহের পর দেওয়ান রামস্বামী আয়ার ত্রিবাংকুরকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে বিদ্রোহ এমন এক ব্যাপক রূপ নেবে যাকে তিনি কখনও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত ত্রিবাংকুর দেশীয় রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নে যোগ দেয়।

দেশীয় রাজ্যগুলির কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি উৎপীড়ন, অত্যাচার ও শোষণের নির্মম বোঝা বহন করেছিল। ব্রিটিশের আমলাতন্ত্র, নিজামের সামন্ত শাসন, দেশ-মুখ-জায়গীরদারদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকেরা সর্ববৃহৎ সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যে উর্দু ভাষাভাষী অল্প-সংখ্যক ধনী মুসলমান বিরাট সংখ্যক তেলেগু-মারাঠী-কানাড়ী ভাষাভাষী হিন্দু অধিবাসীদের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে মধ্যযুগীয় সামন্ত শোষণ অব্যাহত ছিল। এই অঞ্চলে ব্যাক্তি স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার লেশ মাত্র ছিল না। হিন্দু দেশমুখ এবং মুসলমান জায়গীরদারেরা দরিদ্র কৃষকদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানে বাধ্য করত। দরিদ্র কৃষকের অবস্থা প্রায় শ্রমদাসের মত ছিল।

মধ্যযুগীয় সামন্ত শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষক ৩০০০ গ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং তার সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষকেরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়। হায়দ্রাবাদে অস্ত্র আইনের তেমন কড়াকড়ি ছিল না। খোলা বাজারে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনাবেচা হত। তেলেঙ্গানার কৃষকেরা এই সুযোগে অর্থ সংগ্রহ করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে। নিজামের রক্ষী বাহীনী, রাজাকার সশস্ত্র বাহিনী, এবং দেশমুখ জায়গীর-দারের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষকেরা বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কমিউনিস্টরা অন্ধ্র মহাসভা, প্রজামণ্ডল প্রভৃতি সংগঠনের সহযোগিতায় তেলেঙ্গানা অঞ্চলের গ্রামগুলিতে অত্যধিক খাজনা, বিনা পারিশ্রমিকে বলপূর্বক শ্রমদান প্রভৃতি উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করে। এই সংগঠন ১৯৪৬ সালে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। নালগোণ্ডা জেলার জনগাঁ, সূর্যপাত এবং হুজুরনগর তালুকগুলিতে কৃষক আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলে খুব শীঘ্র সে আন্দোলন পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকরা সংগঠন তৈরী করে। প্রায় ১০,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের রক্ষীবাহিনী গড়ে ওঠে। নিজাম-বিরোধী এবং রাজাকার-বিরোধী ধ্বনি দিয়ে কৃষকেরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড ধ্বংস করার আহবান জানায়।

তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের প্রভাবাধীন গ্রামগুলিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান প্রথার অবসান, কৃষি-শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, পতিত ও উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়। নিজাম ও রাজাকারের শাসনমুক্ত গ্রামগুলিতে সেচব্যবস্থার উন্নতি, মীমাংসার মধ্য দিয়ে কৃষক পরিবারের বিরোধ নিষ্পত্তি, নারীর মর্যাদা রক্ষা, অস্পৃশ্যতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা হয়। মুক্ত গ্রামগুলিতে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে সামন্তবিরোধী মতাদর্শ প্রচার করা হয়।

তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ পরোক্ষে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন আন্দোলনকে শক্তিশালী করে ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক চেতনাকে জনপ্রিয় করে। সামন্ত-স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের শাসনকে দুর্বল করেছিল। তেলেঙ্গানার আন্দোলনের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠিত করে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে তেলেঙ্গানা কৃষকদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামন্তবিরোধী ও উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে তেলেঙ্গানার কৃষকরা ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

৫। ভারত বিভাগের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পটভূমি এবং ক্ষমতা হস্তান্তর

শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসকের সদিচ্ছা অথবা জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের

নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আকাংখা ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করে নি। ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সেভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক জয়লাভ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও ছাত্র আন্দোলন, ভারতীয় রাজকীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, এবং দেশীয় রাজ্য-গুলিতে তীব্র প্রজা আন্দোলন যুদ্ধোত্তর ভারতে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৫-৪৭-এর বছরগুলিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিভূমিকে প্রবলভাবে কাঁপিয়েছিল। গণ-আন্দোলনের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এবং ১৯৪৫-৪৭-এ দেশব্যাপী দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম লীগ সংবিধান-প্রণয়ন সভায় যোগ দিতে এবং অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত হলে, জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করলে, ভারতে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়। রাজনৈতিক সংকটের এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ভারত সংক্রান্ত তৃতীয় ঘোষণাটি প্রচার করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগে করবে এবং দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ্যাটলির ঘোষণায় ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়।

মুসলিম লীগের আহবানে ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হলে অতি দ্রুত তার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বোম্বাই, নোয়াখালি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে মর্মান্তিক আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে। বোম্বাই শহরে শুরু থেকেই আচমকা ছুরিকাঘাতের ঘটনায় বহু হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায়। ১৯৪৬-এর অক্টোবরে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু লোকের প্রাণহানি হয় এবং বহু কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়। একই সময়ে অবিশ্বাস্যভাবে বিহারের হিন্দু কৃষকেরা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ শুরু করে। উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে হিন্দু-মুসলমানের হিংসাত্মক কার্যকলাপে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা ঘোষিত হলে মুসলিম লীগ মুসলমান জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করায় খুবই সচেষ্ট হয়। পাকিস্তানের দাবিকে সর্বসমক্ষে প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য মুসলিম লীগ পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। তার ফলে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও হত্যাকান্ড চরম আকার ধারণ করে। এবারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর, মুলতান এবং রাওয়ালপিণ্ডির জেলাগুলিতে ব্যাপক নরহত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পাঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে শিখ ও হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলায় মুসলমানের প্রাণহাণি এবং হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। তদানীন্তন পাঞ্জাবের ক্ষীজার হায়াৎ খাঁর মন্ত্রীসভা দেশবিভাগের বিরোধী হওয়ায় মুসলিম লীগ এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ পরিচালনা করে, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

সারা দেশে এবং বিশেষত উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ প্রবল আকার ধারণ করে। এই সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় অচলাবস্থা দেখা দিলে জাতীয় কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা রাজনৈতিক সমাধানের সূত্র হিসাবে দেশ বিভাগের কথা ভাবতে শুরু করলেন। হিন্দু এবং শিখ সাম্প্রদায়িক নেতারা বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দু'টিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৪৬-১৯৪৭-এর বছর দু'টিতে গান্ধীজী সর্বশক্তি দিয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা প্রশমিত করার চেষ্টা করেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত বেলেঘাটায় অবস্থান করে তিনি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। গান্ধীজীর এই প্রয়াস ১৯৪৮-এর জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়াস সত্ত্বেও দেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার অবসান ঘটে নি। বেলেঘাটা এবং দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজীর আমরণ অনশন শেষ পর্যন্ত এই সব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করে দেন। তিনি সর্দার প্যাটেল, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন। ভারতের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি, বিশেষ করে সারা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনাগুলি বিবেচনা করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি যাচাই করতে শুরু করেন। তখনও পর্যন্ত তাঁদের সবাই এই পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন না। ১৯৪৭-এর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য মনে না করে একটি বিকল্প প্রস্তাব দিলেন। এই প্রস্তাবে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলা হয়; বাংলা এবং পাঞ্জাবের আইনসভা ভোটের মাধ্যমে প্রদেশ দু'টিকে বিভক্ত করতে পারবে, ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলে দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন হয়ে যাবে। এক কথায়, প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের পছন্দ অনুসারে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে; অথবা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। ভারতকে টুকরো টুকরো করার এই পরিকল্পনাকে জওহরলাল নেহরু সরাসরি নাকচ করে দিলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দানের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের দু'টি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিকল্পনা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রকাশ করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া আর প্রায় সবাই দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনাটি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ আর কোন বিকল্প পরিকল্পনা ও প্রস্তাব তাঁরা দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেল দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি গ্রহণের অনুকূলে মত দেন। গান্ধীজী দেশ বিভাগ পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'So long as I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it, allow Congress to accept it'. তিনি আরও বললেন, তাঁর মৃতদেহের উপর কেবলমাত্র ভারত বিভাগ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী তাঁর মত পরিবর্তন করে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের' ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানে দু'টি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পরিকল্পনা লর্ড মাউন্টব্যাটেন পেশ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ নেতৃবৃন্দ সেটি গ্রহণ করলে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে একই সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন এবং ব্রিটিশ কমন্স-সভার প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি পরিকল্পনাটিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। পরের দিন

মাউন্টব্যাটেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পরিকল্পনাটি ১৯৪৭-সালের ১৫ই আগষ্ট নাগাদ কার্যকর করা হবে।

ভারত বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তর কেমনভাবে বাস্তবায়িত হবে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তা প্রকাশ করা হল: ১. মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলের মানুষেরা ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ান্ গঠন করতে পারবেন। স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে একটি নূতন সংবিধান-প্রণয়ন সভা গঠিত হবে; ২ দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে বাঙলা প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুটিকে বিভক্ত করা হবে। ধর্মীয় ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির আইনসভার সদস্যরা আলাদা ভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ করবেন; ৩ সিন্ধুর প্রাদেশিক আইনসভাকে ভোটের মাধ্যমে তার সাংবিধানিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করার অধিকার দেওয়া হবে; ৪ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলার মানুষেরা গণভোটের মাধ্যমে ভারত অথবা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগদানের বিষয়টি নির্ধারণ করবেন; ৫. পাঞ্জাব ও বাঙলা প্রদেশ দু'টিকে বিভক্ত করা হলে সীমানা কমিশন (Boundary Commission) নিয়োগ করে সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা হবে; ৬ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনে (১৯৪৭) 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দানের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিলটি পেশ করা হবে। ডোমিনিয়নের সংবিধান-প্রণয়ণ সভা (Constituent Assumbly) ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগ দেওয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হবে।

জাতীয় কংগ্রেস এবং জওহরলাল নেহরু সখেদে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। জওহরলাল নেহরু বললেন, আনন্দের সঙ্গে তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন নি। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে তিনি মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেন। শরৎচন্দ্র বসু, শারওয়ার্বার্দি প্রমুখরা বাংলা প্রদেশ বিভাগের বিরোধিতা করে স্ব-শাসিত অবিভক্ত বাংলা দাবি করেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনায় মুসলমানের স্বার্থ রক্ষিত হয় নি বলে মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফফুর খানের লাল কুর্তাদল (Red Shirt) ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে। খান আবদুল গফফর খান এবং তাঁর ভ্রাতা ডঃ খান সাহেব গণভোটের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকতুনিস্তান রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে মতামত গ্রহণের দাবি করেন। খান ভ্রাতাদের

লাল কুর্তাদল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বিভাগের জন্য আয়োজিত গণভোট বয়কট করতে পাঠানদের আহবান জানান। শেষ পর্যন্ত গণভোটের রায়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেয়।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাব ভারতে যোগ দেবার অনুকূলে মত প্রকাশ করে। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বালুচিস্তান পাকিস্তানে যোগ দেবার অভিপ্রায় ঘোষণা করে। আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগ দেবার অনুকূলে মত দেয়। ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়ান 'ইণ্ডিপেন্ডেনস বিল' পেশ করা হয়। দ্রুততার সঙ্গে 'ভারত স্বাধীনতা বিলটি' গৃহীত হবার পর আইনে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখটিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ বলে ঘোষণা করা হয়। 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেনস এ্যাক্ট' ভারত ও পাকিস্তানে দু'টি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ ভারতের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে বলে ঘোষণা করা হয়।

ভৌগলিকভাবে কাছাকাছি অবস্থিত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দেয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দক্ষ পরিচালনায় দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্তি সম্পূর্ণ হয়। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড় দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে হায়দ্রাবাদ এবং শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর ও জুনাগড় ভারত ডোমিনিয়নে যোগ দেয়। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশ-বিভাগের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়।

বাংলা প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের উদারনীতিক এবং চরমপন্থী নেতারা সংগ্রাম করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার জনমত ও গণ-আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে অখন্ড ভারতের জন্য সংগ্রাম করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিকল্প হিসাবে তীব্র গণ-আন্দোলন পরিচালনা করাই ছিল একমাত্র পথ। ১৯৪৫-৪৭-এর বছরগুলির

সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা বোধ হয় গণ সংগ্রামের অনুকূল ছিল না। গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত বামপন্থী দলগুলির কাছে চলে যেতে পারে এই আশংকায় হয়তো জাতীয় নেতৃবৃন্দ পুনরায় তীব্র গণ-আন্দোলন পরিচালনা করার কথা চিন্তা করেন নি।

অনেক ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল গণ-আন্দোলন পরিচালনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশবিভাগের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রধানতম রাজনৈতিক সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারত ত্যাগে বাধ্য হওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদেশে নিজেদের অর্থনৈতিক অধিকারটুকু টিঁকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলিম লীগের সমর্থন পুষ্ট দেশ বিভাগের দাবির উপরেই তাদের শেষ আশা ন্যস্ত করেছিল। তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম লীগের ধর্মীয় ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে নবোদিত মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা খুবই সক্রিয় ছিল। ইস্পাহানি, আদমজী প্রমুখ মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা পাকিস্তান দাবির সমর্থনে জিন্নাকে অর্থ সাহায্য করেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগ কলকাতা এবং দিল্লীতে দু'টি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবিগুলিকে প্রচার করে। ১৯৪৫ সালে জিন্নার আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে 'ফেডারেশন অব মুসলিম চেম্বারস অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি' গঠিত হয়। মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসলিম লীগের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ভারতের হিন্দু ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা দেখা দিলে হিন্দু ব্যবসায়ীরা ভারত বিভাগকে একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান বলে মনে করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পপতিদের অগ্রগণ্য জি. ডি. বিড়লা ১৯৪২ সালে ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য ও ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা। শেষ পর্যন্ত তা বিপর্যস্ত হ'ল; ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিনিময়ে, দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে, দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

১৭৫৭ —পলাশীর যুদ্ধ ও বঙ্গবিজয়

১৭৬৯-১৭৭০ — ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু

১৭৭২—রামমোহন রায়ের জন্ম

১৭৭৩—'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আইন' বা নিয়ন্ত্রণকারী আইন

১৭৭৪—ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭৮৩ – রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ

১৭৮৪—পিটের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আইন' বা পিটের ভারত আইন

১৭৮৬—ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ

১৭৯৩ – সনদ আইন (চার্টার এ্যাক্ট); বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু

১৭৯৮ — ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ওয়েলেসলি

১৭৯৯-১৮৩৯ – পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের রাষ্ট্র

১৮০৭—দিল্লী অঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থান

১৮১৩ –সনদ আইন

১৮১৫—আর্যসভা প্রতিষ্ঠা

১৮১৭—সৈয়দ আহমদ খাঁর জন্ম

১৮১৭ – ওড়িষ্যার খুরদা জেলায় পাইক বিদ্রোহ

১৮২৫—দাদাভাই নৌরজীর জন্ম

১৮২৮—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

১৮২৮ —ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক

১৮৩১—ওয়াহবী আন্দোলনের সূচনা; আদিবাসী মুণ্ডা বিদ্রোহ

১৮৩৩—সনদ আইন

১৮৩৭ — জমিদারী এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা

১৮৩৮ – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম

১৮৩৮ — ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

১৮৩৮-১৮৪৬—ফরাজী বিদ্রোহ

১৮৪৩—বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

১৮৪৮-১৮৪৯—দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ; ব্রিটিশ শক্তির দখলে সারা ভারত

১৮৫১—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা

১৮৫৩ –সনদ আইন

১৮৫৩—ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপন

১৮৫৩ –বোম্বাইয়ে প্রথম বস্ত্র কারখানা নির্মাণ

১৮৫৫-১৮৫৬—সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৮৫৬—বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম

১৮৫৭-১৮৫৯ — সিপাহীদের নেতৃত্বে মহান অভ্যুত্থান

১৮৫৭—কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

১৮৫৭, ১১ মে—বিদ্রোহী সিপাহীদের দিল্লী দখল

১৮৫৭, ১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশদের দিল্লী দখল

১৮৫৮, ২ আগস্ট—'ভারতে সুশাসন প্রবর্তনের আইন' ঃ ভারত শাসন আইন

১৮৫৮, ১ নভেম্বর — ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলোপ সাধন ; ব্রিটিশ রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণের ঘোষণাপত্র

১৮৫৯—ভারতে প্রথম প্রজাস্বত্ব আইন (বাংলার ভূমিরাজস্ব আইন)

১৮৫৯-১৮৬২—নীলচাষীদের বিদ্রোহ

১৮৬১ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম

১৮৬১ — ভারতীয় পরিষদ আইন (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট)

১৮৬১—আমেদাবাদে বস্ত্রকল নির্মাণ

১৮৬১ — আসামের নওগাঁ জেলার ফুলগুড়ি অঞ্চলে খাজনাবিরোধী আন্দোলন

১৮৬২—স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম

১৮৬৯ – মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম

১৮৭০—পুণা সার্বজনিক সভার প্রতিষ্ঠা

১৮৭২ – পাঞ্জাবে নামধারী বিদ্রোহ

১৮৭২-১৮৭৩ – বাংলার পাবনা ও বগুড়া জেলায় কৃষক বিদ্রোহ

১৮৭৩-১৮৭৫ — মহাজনদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহ

১৮৭৫—শিশির কুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠা

১৮৭৬ — সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা

১৮৭৭, ১ জানুয়ারি—ব্রিটিশ রাণীকে ভারতের মহারাণী হিসাবে ঘোষণা

১৮৭৭—নাগপুরের বস্ত্রকলে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট

১৮৭৭ — কলকাতায় জাতীয় মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা

১৮৭৯ — মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিদ্রোহ

১৮৭৯— সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক আলিগড়ে এ্যাংলো - ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৮৭৯-১৮৮৩—রাম্পার কৃষক অভ্যুত্থান

১৮৮১ প্রথম ভারতীয় কারখানা আইন

১৮৮২ বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিচার ও নির্বাসন দণ্ড

১৮৮৩—কলকাতায় প্রথম 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'

১৮৮৪—বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদের প্রথম জনসভা ও লোখাণ্ডে কর্তৃক প্রথম ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন

১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৯ জওহরলাল নেহেরুর জন্ম

১৮৯১ – মণিপুর রাজ্যে গণ-অভ্যুত্থান

১৮৯২ – ভারতীয় পরিষদ আইন

১৮৯৬-১৯০৬—রাজবন্দীদের নির্যাতনের জন্য আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে সেলুলার জেল নির্মাণ

১৮৯৭—সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম

১৮৯৭, ১৫ জুন—'কেশরী' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিচার ও কারাদণ্ড

১৮৯৭, ২২ জুন দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার কর্তৃক পুণার কালেক্টর র‍্যাণ্ড ও সামরিক অফিসার আয়ার্স্টকে হত্যা

১৯০২—অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

১৯০৩—বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা

১৯০৫, ১৬ অক্টোবর—বঙ্গভঙ্গ ও 'পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' সৃষ্টি

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন

১৯০৫—শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা কর্তৃক বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

১৯০৬—জাতীয়-বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' সাপ্তাহিকের প্রকাশ

১৯০৬ ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

১৯০৬-১৯০৭—পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা

১৯০৬, অক্টোবর—সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৭—সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভাঙন

১৯০৭ পাঞ্জাবে হিন্দুসভা গঠন

১৯০৮, ৩রা এপ্রিল মজফফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর রাজনৈতিক হত্যা

১৯০৮, ২ মে—অরবিন্দ ঘোষ, বারীণ ঘোষ প্রমুখ জাতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার; আলিপুরে বোমা মামলা দায়ের

১৯০৮, ১৩-২২ জুলাই—রাজদ্রোহের অভিযোগে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিচার ও কারাদণ্ড

১৯০৮, ২৩ জুলাই—তিলকের কারা-দণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে শ্রমিক-দের রাজনৈতিক ধর্মঘট

১৯০৮, ২৪ জুলাই—তিলকের মুক্তির দাবিতে বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘট

১৯০৯—লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়ার ব্রিটিশ অফিসার কার্জন-উইলিকে হত্যা

১৯০৯—মর্লি মিন্টো সংস্কার ও ভারতীয় সংসদ আইন

১৯১১ জামসেদপুরে প্রথম ভারতীয় ধাতুশিল্প কারখানা নির্মাণ

১৯১১, ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ

১৯১২, মার্চ 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লালা হরদয়ালের কার্ল মার্কস সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ

১৯১২, ২৩ ডিসেম্বর—রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বড়লাট হার্ডিঞ্জের

উপর বোমা নিক্ষেপ

১৯১৩ — মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে 'গদর' আন্দোলনের সূচনা

১৯১৪, আগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু

১৯১৪, সেপ্টেম্বর—'গদর' আন্দোলনের প্রবাসী শিখদের নিয়ে 'কোমাগাতামারু' জাহাজ বজবজ বন্দরে নোঙর

১৯১৫, ১৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারী — রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনা জনৈক সহযোগীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত

১৯১৫— গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন

১৯১৫ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, লালা হরদয়াল প্রমুখ প্রবাসী জাতীয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে বার্লিনে 'ভারত স্বাধীনতা কমিটি' গঠন

১৯১৫, সেপ্টম্বর - বালেশ্বরের জঙ্গলে ব্রিটিশ পুলিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যতীন মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) মৃত্যু

১৯১৫, নভেম্বর সিঙ্গাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ

১৯১৫, ডিসেম্বর - মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লাহ ও ওবেদুল্লাহের উদ্যোগে কাবুলে নির্বাসিত 'অস্থায়ী ভারত সরকার' প্রতিষ্ঠা

১৯১৫ - সারা ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা

১৯১৫—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন. রায়) ও অবনী মুখোপাধ্যায় অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে ভারত ত্যাগ ও বিদেশ যাত্রা

১৯১৬— সারা ভারত হোমরুল লীগ গঠন ; জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ চুক্তি

১৯১৭, অক্টোবর বিহারে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা

১৯১৭, নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্ব জারশাসিত রাশিয়ায় বিপ্লব এবং বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

১৯১৮—মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা

১৯১৮ - গান্ধীজীর 'আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবর এ্যাসোসিয়েশন' গঠন

১৯১৮ জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন ; সারা ভারত লিবারেল ফেডারেশন গঠন

১৯১৯—স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলন দমনে 'রাওলাট আইন'

১৯১৯, ৬ এপ্রিল সারা ভারতে 'রাওলাট আইন' বিরোধী হরতাল ; সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা

১৯১৯, ১৩ এপ্রিল—পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ ও সামরিক বাহিনীর নির্মম হত্যাকান্ড

১৯১৯ সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাবে হিজরৎ আন্দোলন এবং আঠারো হাজার

মুসলমানের আফগানিস্তান যাত্রা

১৯১৯ — মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ; ভারত সরকার আইন

১৯২০—কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশের জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন

১৯২০, মে—সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯২০—খিলাফত আন্দোলন

১৯২০, ১৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখণ্ড শহরে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন

১৯২০ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেসের পরিষদ নির্বাচন বর্জন

১৯২১-২২ গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন

১৯২১—মোপলা কৃষক অভ্যুত্থানের সূচনা

১৯২১, ১৭ নভেম্বর—যুবরাজ ওয়েলস-এর বোম্বাইয়ে আগমন ও সারা ভারতে হরতাল প্রতিপালন

১৯২১-২২ গুরুদ্বারগুলির গণতন্ত্রী-করণের জন্য শিখদের আকালী আন্দোলন

১৯২১-২২—দক্ষিণ ভারত, উত্তর প্রদেশ ও মেদিনীপুরে কৃষক আন্দোলন ; [illegible]গপুর ও ওড়িষ্যায় আদিবাসী [illegible] রেল কর্মচারী ধর্ম[illegible] আসাম-বেঙ্গল [illegible]সামে চা মজুর ধর্মঘট

১৯২২, ৫ ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা গ্রামে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত কৃষক-জনতার থানায় অগ্নি-সংযোগ ও পুলিশ হত্যা

১৯২২, ১২ ফেব্রুয়ারী — জাতীয় কংগ্রেসের বারদোলী প্রস্তাব ; গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত

১৯২২ জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রবাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদ সংস্রব বর্জিত পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবি সম্বলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী বিতরণ

১৯২২-২৩ কমিউনিস্টবিরোধী পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২২, ৩১ ডিসেম্বর - চিত্তরঞ্জন দাশের কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা

১৯২৩, ১ জানুয়ারী—চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন

১৯২৩-২৭—উত্তর প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কলকাতা, ঢাকা,

পাটনা, রাওয়ালপিণ্ডি ও দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা

১৯২৩ - শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের বারাণসীতে রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' গঠন

১৯২৪ — কমিউনিস্টবিরোধী কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২৫, ডিসেম্বর কানপুরে সর্বভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রথম সম্মেলন ; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

১৯২৬-২৭ ওয়ার্কার্স ও পেজাণ্টস পার্টি গঠন

১৯২৭, মে ভারতে সংগঠিতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মে দিবস পালনের সূচনা

১৯২৭, নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ

১৯২৭—ব্রাসেলসে 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘে' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তি

১৯২৮ ভগত সিং-এর 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' গঠন

১৯২৮, ১৭ নভেম্বর 'সাইমন কমিশন' বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দানের সময়ে পুলিশের লাঠিতে নিদারুণভাবে আহত হওয়ায় লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু

১৯২৮ মতিলাল নেহেরু কমিটির ভারতের খসড়া সংবিধান প্রকাশ

১৯২৮-১৯২৯ মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালিতে ফ্যাসিস্ত শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল

১৯২৮, ডিসেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের মণ্ডপে মিছিল করে আগত বহু সহস্র শ্রমিকের সমাবেশে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবি পেশ

১৯২৯, ৪ এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনসভার কক্ষে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপ

১৯২৯, এপ্রিল · কমিউনিস্ট-বিরোধী মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু (১৯২৯-১৯৩৩)

১৯২৯, সেপ্টেম্বর ৬৪ দিন অনশন ধর্মঘট চালিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে যতীন দাসের মৃত্যু

১৯২৯ - সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্ব

১৯২৯ জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ

১৯২৯-৩৩ - পুঁজিবাদী বিশ্বে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা

১৯৩০, ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন

১৯৩০, মার্চ গান্ধীজীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র ১১-দফা দাবি প্রকাশ

১৯৩০, মার্চ-এপ্রিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা ; লবণ সত্যাগ্রহ ও ডাণ্ডি অভিযান

১৯৩০ গারোয়ালী সৈন্যদের সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি বর্ষণে অস্বীকৃতি

১৯৩০—সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ; পেশোয়ার ও শোলাপুরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান

১৯৩০ — সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্ব

১৯৩০-৩২—লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক সমূহ

১৯৩১-৩২— কাশ্মীরে সামন্তবিরোধী আন্দোলন

১৯৩১, ৫ মার্চ—'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি

১৯৩১, ২৩ মার্চ—ভগৎ সিং ও আরো দু'জন জাতীয় বিপ্লবীর ফাঁসি

১৯৩১, মার্চ— করাচীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ

১৯৩১—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশ

১৯৩২—সর্বদলীয় ঐক্য সম্মেলন ও পুণা চুক্তি

১৯৩২-৩৪ — গান্ধীজীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩৪ - কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

১৯৩৪, ২ আগস্ট—হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে নাৎসী শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল

১৯৩৫—নতুন ভারত শাসন আইন

১৯৩৫—কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহবান

১৯৩৬, এপ্রিল - সারা ভারত কিষাণ সভা গঠন

১৯৩৬ জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের আগ্রাসন নীতির নিন্দা

১৯৩৬, মে কংগ্রেস সভাপতি পদে জওহরলাল নেহেরু

১৯৩৬ – ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে' জাতীয় কংগ্রেসের অংশ-গ্রহণ

১৯৩৬—ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ ও সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠন

১৯৩৭—১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন

১৯৩৭ –মুসলিম লীগের অধিবেশনে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ

১৯৩৮, জানুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৩৯, জানুয়ারী— গান্ধীজী মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করে সুভাষ-

চন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত

১৯৩৯, এপ্রিল - তীব্র মতভেদের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা

১৯৩৯, ৩ মে — সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন

১৯৩৯, ১১ আগস্ট—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর অপসারণ

১৯৩৯, ৩ সেপ্টেম্বর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু

১৯৩৯, সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনমত ও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে পরামর্শ না করেই বড়লাট লিনলিথগোর ভারত ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা

১৯৩৯, ১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ফ্যাসিবাদী-নাৎসী-বাদী যুদ্ধকে নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ

১৯৩৯, ২ অক্টোবর—বোম্বাইয়ে ৯০,০০০ শ্রমিকের যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট

১৯৪০, মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ

১৯৪০, আগস্ট বড়লাট লিনলিথগোর 'আগস্ট প্রস্তাব'

১৯৪০, অক্টোবর—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে বহু সহস্র কংগ্রেস কর্মীর কারাবরণ

১৯৪১, জানুয়ারী—গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসুর আত্ম-গোপন করে ভারত ত্যাগ ও জার্মানী অভিমুখে যাত্রা

১৯৪১, ২২ জুন—নাৎসী জার্মানীর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও আক্রমণ

১৯৪২, মার্চ রেঙ্গুনে ব্রিটিশ শক্তির পতন

১৯৪২, মার্চ — ১৯৪৫ অক্টোবর - - জাপানীদের অধিকারে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

১৯৪২, মার্চ ভারতে ক্রীপস মিশন ও 'ক্রীপস প্রস্তাব'

১৯৪২, এপ্রিল - গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আহবান

১৯৪২, আগষ্ট--গান্ধীজী সমেত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার ; জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ; 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

১৯৪৩, জুলাই-- সাবমেরিনযোগে সুভাষচন্দ্র বসুর জার্মানী থেকে সিঙ্গাপুরে আগমন ; আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন

১৯৪৩ -- পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু

১৯৪৩, ২৯-৩১ ডিসেম্বর অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রধান হিসাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আন্দামানে আগমন ও সেলুলার জেল পরিদর্শন

১৯৪৪—রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে 'চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী সূত্র'

১৯৪৫—বাংলায় কৃষকদের 'তেভাগা' আন্দোলন

১৯৪৫, ২ মে—সোভিয়েট ইউনিয়নের লাল ফৌজের বার্লিন দখল ; ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়

১৯৪৫, জুন—বড়লাট ওয়াভেলের ঘোষণা ও সিমলা সম্মেলন

১৯৪৫, আগষ্ট -হিরোসিমা শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপ এবং জাপানের আত্মসমর্পন

১৯৪৫, আগষ্ট –দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ; ফ্যাসিস্ত-নাৎসী শক্তিবর্গের চূড়ান্ত সামরিক পরাজয়

১৯৪৫, আগষ্ট ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয় ; রক্ষণশীল দলের পরাজয়

১৯৪৫, ২৫ অক্টোবর সারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস পালন ; ডক শ্রমিকদের জাহাজে সামরিক সম্ভার তুলতে অস্বীকার

১৯৪৫, নভেম্বর—দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার শেগল, শাহনওয়াজ ও ধীলনের বিচার শুরু

১৯৪৫, ২১ নভেম্বর—আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট

১৯৪৬, ১১-১৪ ফেব্রুয়ারী -আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট

১৯৪৬, ১৮-২৩ ফেব্রুয়ারী—বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ ; বোম্বাই শহরে নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট

১৯৪৬, মার্চ ভারতে ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৬, এপ্রিল আইনসভার নির্বাচন

১৯৪৬, জুলাই সারা ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট

১৯৪৬, ১৬ আগষ্ট-১৯৪৭ কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা

১৯৪৬, নভেম্বর-জানুয়ারী ১৯৪৭ — পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা প্রশমনে গান্ধীজীর নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা

১৯৪৬ তেলেঙ্গানায় কৃষক অভ্যুত্থান

১৯৪৬ 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলন

১৯৪৬—উত্তর-পশ্চিম ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যের পুন্নাপ্রাভায়লার অঞ্চলের শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের সামন্ত শাসন বিরোধী আন্দোলন

১৯৪৬, ৯ ডিসেম্বর— সংবিধান-প্রণয়ন সভায় প্রথম অধিবেশন

১৯৪৭, ২০ ফেব্রুয়ারী -- প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলীর ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের

সংকল্প ঘোষণা

১৯৪৭, মার্চ— গভর্ণর-জেনারেল পদে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ

১৯৪৭, জুন— ভারতকে দু'টি ডোমিনিয়নে বিভক্ত করার 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' প্রকাশ

১৯৪৭, জুন - কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুমোদন

১৯৪৭, ১৪ জুন —গান্ধীজীর সারা ভারত কংগ্রেস কমিটিকে ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুপারিশ

১৯৪৭, জুলাই— ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ

১৯৪৭, মে— ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন

১৯৪৭, ৪-১৭ জুলাই—আব্দুল গফ্ফর খান এবং তাঁর সহযোগীদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুষ্ঠিত গণভোট বর্জন

১৯৪৭, ১৫ আগষ্ট—ভারতের স্বাধীনতা লাভ ; ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম

১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারী—দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী আততায়ীর গুলিতে নিহত।

আন্দামানে নির্বাসিত ও আটক রাজবন্দীদের তালিকা

ক. ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানে ধৃত ও আন্দামানে নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামী

আসাম

১. বাহাদুর গণবরুয়াহ
২. দুতিরাম বরুয়া
৩ মধু মালিক
৪. শেখ ফরমুদ আলি

বিহার

১. শ্রীনারায়ণ

গুজরাট

১ গরবদাস প্যাটেল

হায়দ্রাবাদ

১. মৌলভী সৈয়দ আলাউদ্দিন

মধ্যপ্রদেশ

১. বাহাদুর সিং
২ ভীম নায়েক
৩ দেবী
৪ ফাত্তা
৫. গুলাব খান
৬ জওহর সিং
৭ মহিবুল্লাহ
৮ মঞ্জু শাহ
৯ মায়া রাম
১০. নুরা
১১. কুইম খান
১২. সিরাজুদ্দিন
১৩. ভেংকট রাও

ওড়িষ্যা

১ হাত্তে সিং

ইউনাইটেড প্রভিন্স

১. আলামা ফজল হক
২. হিমানোয়াল সিং
৩. কুরা সিং
৪ লিয়াকত আলি
৫. লোনি সিং
৬. দুধনাথ তেওয়ারি
৭. মীরজাফর আলি থানেশ্বরী
৮ নিরঞ্জন সিং

খ আন্দামানে নির্বাসিত ওয়াহবী বিদ্রোহী ১৮৬০-১৮৭০)

১ আহমদুল্লাহ (পাটনা মামলা, ১৮৬৫)
২ আমিরুদ্দিন (মালদা মামলা, ১৮৭০)
৩ ইব্রাহিম মণ্ডল রাজমহল মামলা, ১৮৭০)
৪ মহম্মদ শের আলি
৫ ইয়াহিয়া আলি (আমবালা মামলা, ১৮৬৪)

গ. সেলুলার জেলে নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামী (১৯০৯-১৯২১

বোম্বাই

১. দাজি নারায়ণ যোশী
২. গণেশ দামোদর সাভারকার
৩. বিনায়ক দামোদর সাভারকার

পাঞ্জাব

১. আলি আহমেদ সিদ্দিকী
২ অমর সিং
৩ ভাই পরমানন্দ
৪ ভান সিং
৫ বিষেন সিং, জওলা সিং-এর পুত্র
৬ বিষেন সিং, কুসুর সিং-এর পুত্র
৭. বিষেন সিং, নং ৩
৮. বিষেন সিং, নং ৪
৯. চান্নান সিং
১০. চাত্তার সিং, নং ১
১১. চাত্তার সিং, নং ২
১২. চেত রাম
১৩. চুহের সিং
১৪ গুরুদাস সিং
১৫. গুরুদিত সিং
১৬. গুরুমুখ সিং, নং ১ (১৯৩২ থেকে ১৯৩৮-এ ও আটক ছিলেন)
১৭. গুরুমুখ সিং, নং ১
১৮. হারদিত সিং
১৯. হারনাম সিং
২০. হাজারা সিং
২১. হিদারাম
২২. হির্দা সিং
২৩ ইন্দর সিং, নং ১
২৪. ইন্দর সিং, নং ২
২৫ জগত রাম
২৬. জওয়ান্দ সিং
২৭. জাওলা সিং
২৮. জিওয়ান সিং
২৯. কলা সিং, মাসিতা সিং-এর পুত্র
৩০. কলা সিং, গুলাব সিং-এর পুত্র
৩১. কাপুর সিং
৩২. কর্তার সিং
৩৩. কেহর সিং, নেহাল সিং-এর পুত্র
৩৪ কেহর সিং, ভান সিং-এর পুত্র
৩৫. কেসর সিং
৩৬. কির্পা সিং
৩৭. কির্পাল সিং
৩৮. কুসল সিং
৩৯. লখন সিং
৪০. লাল সিং, নং ১
৪১. লাল সিং, নং ২
৪২. মদন সিং
৪৩. মঙ্গল সিং
৪৪. মনোহর সিং
৪৫. মুনশা সিং
৪৬. নন্দ সিং, নং ১
৪৭. নন্দ সিং, নং ২
৪৮. নাথা সিং
৪৯. মেহের সিং

৫০. নিধান সিং
৫১. পিয়ারা সিং
৫২ পৃথ্বী সিং আজাদ
৫৩. রাজা রাম
৫৪. রাম রক্ষা ভালে
৫৫. রাম শরণ দাস
৫৬. রণধীর সিং
৫৭. রোদা সিং জাট
৫৮. রুল্লা সিং
৫৯. রুরহ সিং
৬০. সজ্জন সিং
৬১. সাওন সিং
৬২. শের সিং
৬৩. সিঙ্গারা সিং
৬৪. শিব সিং
৬৫. মোহন সিং
৬৬. সুচা সিং
৬৭. সুরাইন সিং
৬৮. সুরজন সিং
৬৯. তেজা সিং
৭০. ঠক্কর সিং
৭১. উধেম সিং
৭২. ওয়াসাখা সিং
৭৩. ওয়াস্বা সিং

ইউনাইটেড প্রভিন্স

১ গোবিন্দ রাম
২. হোতি লাল
৩. লাধা রাম
৪. মুখাদা বাবু
৫. মুজতবা হুসেন
৬. নন্দগোপাল
৭ পরমানন্দ (ঝাঁসি)
৮. রামহরি
৯. রোশনলাল
১০. শচীন্দ্র নাথ সান্যাল

বাংলা দেশ

১. অবণীভূষণ চক্রবর্তী
২. অবিনাশ ভট্টাচার্য
৩. অমৃতলাল হাজরা
৪. আশুতোষ লাহিড়ী
৫. অশ্বিনীকুমার বসু
৬. বারীন্দ্রনাথ ঘোষ
৭. ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮. বিভূতিভূষণ সরকার
৯. বিধুভূষণ দে
১০. বিধুভূষণ সরকার
১১. বীরেন সেন
১২. ব্রজেন্দ্র নাথ দত্ত
১৩. গোবিন্দ চন্দ্র কর
১৪. গোপেন্দ্রলাল রায়
১৫. হরেন্দ্র ভট্টাচার্য
১৬. হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)
১৭. হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল
১৮. ইন্দুভূষণ রায়
১৯. সতীন্দ্রনাথ নন্দী
২০ জ্যোতিষচন্দ্র পাল
২১. কালিদাস ঘোষ
২২. খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ওরফে সুরেশচন্দ্র
২৩. কিনুরাম পাল, ওরফে প্রিয়নাথ

২৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল
২৫. মদন মোহন ভৌমিক
২৬ নৃগেন্দ্রনাথ চন্দ্র
২৭. নগেন্দ্রনাথ সরকার
২৮ ননীগোপাল মুখার্জী
২৯. নরেন ঘোষচৌধুরী
৩০. নিখিলরঞ্জন গুহরায়, (১৯৩২ থেকে ১৯৩৮-এ ও আটক ছিলেন)
৩১ নিকুঞ্জবিহারী পাল
৩২ নিরাপদ রায়
৩৩ ফণীভূষণ রায়
৩৪ পুলিনবিহারী দাস
৩৫ শচীন্দ্রনাথ দত্ত
৩৬ শচীন্দ্রলাল মিত্র
৩৭ সানুকুল চ্যাটার্জী
৩৮ সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী (ভট্টাচার্য)
৩৯. সত্যরঞ্জন বসু
৪০. সুধীরচন্দ্র দে
৪১ সুধীরকুমার সরকার
৪২. সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৪৩ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
৪৪. ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী
৪৫ উল্লাসকর দত্ত
৪৬ উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

ঘ. সেলুলার জেলে নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামী (১৯২২-১৯৩২)

ইউনাইটেড প্রভিন্স

১. লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা
২. বিষ্ণুশরণ দুবলিস

মাদ্রাজ

১. কোটায়া করুরাবু
২. পাণ্ডু পাদল বোনাঙ্গী
৩ সন্যাসায়া গলিভিল্লি
৪. সন্ন্যাসী কুনছত্তি
৫. সত্যনারায়ণ রাজু
৬. বীরায়া দোরা তাগ্গি

ঙ. সেলুলার জেলে নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামী (১৯৩২-১৯৩৮)

পাঞ্জাব

১. হাজারী সিং
২. কুশীরাম মেহতা

দিল্লী

১. ধওয়ানতরী
২. হরবন্ধু সমাজদার

ইউনাইটেড প্রভিন্স

১. বাচ্চুলাল
২. বটুকেশ্বর দত্ত
৩. বিজয়কুমার সিংহ
৪. গয়াপ্রসাদ
৫. জয়দেব কাপুর
৬. কুন্দনলাল গুপ্ত
৭. মহাবীর সিং
৮. প্রেম প্রকাশ
৯. রামসিং ডোগরা
১০. শম্ভুনাথ আজাদ
১১. শিও ভারমা

বিহার

১ বিশ্বনাথ মাথুর
২ চন্দ্রিকা সিং
৩ গৌরীশংকর দুবে
৪. গুলাবচাঁদ গুপ্ত
৫ যোগেন্দ্র শুকুল
৬. কমলনাথ তেওয়ারি
৭. কানহাইয়ালাল মিসির
৮. কেদারমণি শুকুল
৯. কেশো প্রসাদ
১০. মহাবীর মিসির
১১ মলয় ব্রহ্মচারী
১২ মোহিত অধিকারী
১৩ নানকু সিং
১৪. প্রথমনাথ ঘোষ
১৫. রামপ্রতাপ সিং
১৬ শ্যামকৃষ্ণ আগরওয়াল
১৭ শ্যামাচরণ ভারতওয়ার
১৮. শ্যামদেও নারায়ণ ওরফে রাম সিং
১৯. সুরযনাথ চৌরে

বাংলাদেশ

১. অবনীরঞ্জন ঘোষ
২ অবনী মুখার্জী
৩. আবদুল কাদের চৌধুরী
৪. অভয়পদ মুখার্জী
৫. অচ্যুত ঘটক
৬. অধীররঞ্জন নাগ
৭ অধীরচন্দ্র সিংহ
৮. অজয় সিংহ
৯ অজিতকুমার মিত্র
১০. অক্ষয় কুমার চৌধুরী
১১. অমলেন্দু বাগচী
১২ অমর মুখার্জী
১৩. অমর সূত্রধর
১৪. অমৃতেন্দু মুখার্জী
১৫. অমূল্য কুমার মিত্র
১৬ অমূল্য রায়
১৭. অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত
১৮. আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত
১৯. অনন্ত ভট্টাচার্য
২০. অনন্ত (ভোলা) চক্রবর্তী
২১. অনন্ত কুমার চক্রবর্তী
২২. অনন্ত দে
২৩. অনন্ত মুখার্জী
২৪. অনন্তলাল সিং
২৫ অনন্ত বন্ধু সাহা
২৬ অনিল মুখার্জী
২৭. আনন্দচরণ পাল
২৮. অনুকূল চ্যাটার্জী
২৯. অরবিন্দ দে
৩০. অতুলচন্দ্র দত্ত
৩১. বঙ্গেশ্বর রায়
৩২. বঙ্কিম চক্রবর্তী
৩৩. বারীন্দ্র কুমার ঘোষ
৩৪. বিনয় কুমার বসু
৩৫. বিনয়ভূষণ রায়
৩৬. বিনয় তরফদার

৩৭. ভবরঞ্জন পাঁতিতুণ্ড
৩৮. ভবতোষ কর্মকার
৩৯. ভবেশ তালুকদার
৪০. ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস
৪১. ভারত শর্মা রায়
৪২. ভোলানাথ রায়
৪৩. ভুবনমোহণ চন্দ্র
৪৪. ভূপাল চন্দ্র বসু
৪৫. ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা
৪৬. ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪৭. ভূপেশচন্দ্র ব্যানার্জী
৪৮. ভূপেশচন্দ্র গুহ
৪৯. ভূপেশচন্দ্র সাহা
৫০. বিভূতিভূষণ ব্যানার্জী
৫১. বিধুভূষণ গুহবিশ্বাস
৫২. বিধুভূষণ সেন
৫৩. বিদ্যাধর সাহা
৫৪. বিজনকুমার সেন
৫৫. বিজয়কুমার ঘোষ
৫৬. বিজয়কৃষ্ণ ব্যানার্জী
৫৭. বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫৮. বিমল ভৌমিক
৫৯. বিমল দাশগুপ্ত
৬০. বিমলকুমার সরকার
৬১. বিমলেন্দু চক্রবর্তী
৬২ বিরাজ দেব
৬৩. বীরেন চৌধুরী
৬৪. বীরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
৬৫. বীরেন রায়
৬৬. বীরভূষণ চক্রবর্তী
৬৭. চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য
৬৮. চিত্ত বিশ্বাস
৬৯. চিত্তরঞ্জন দত্ত
৭০. চিন্তাহরণ দাস
৭১. চুনীলাল দেব
৭২. দেবকুমার দাস
৭৩. দেবেন্দ্র তালুকদার
৭৪. ধরণী বণিক
৭৫ ধরণী বিশ্বাস
৭৬. ধরণী চক্রবর্তী
৭৭. ধরণীধর রায়
৭৮. ধীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস
৭৯ ধীরেন চৌধুরী
৮০ ধীরেন দত্ত
৮১. ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৮২. ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা)
৮৩. ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)
৮৪ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস
৮৫. ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী
৮৬. দীনেশ বণিক
৮৭. দীনেশচন্দ্র দাস (ময়মনসিংহ)
৮৮. দীনেশচন্দ্র দাস ওরফে টগর
৮৯. দীনেশ দাশগুপ্ত
৯০. দীনেশ ধর
৯১. দীনেশচন্দ্র সাহা
৯২. দুর্গাশংকর দাস
৯৩. দ্বিজেন্দ্রনাথ নাহা
৯৪. দ্বিজেন্দ্রনাথ তলাপাত্র
৯৫. ফকিরচন্দ্র সেনগুপ্ত
৯৬. গগনচন্দ্র দে

৯৭. গণেশচন্দ্র ঘোষ
৯৮. গোবিন্দ কর
৯৯. গোবিন্দ প্রসাদ বেরা
১০০. গোমিরুদ্দিন সরকার
১০১ গোপাল আচার্য
১০২ গোপালচন্দ্র দেব
১০৩ গোপীমোহন সাহা
১০৪ গৌরগোপাল দত্ত
১০৫ হারানচন্দ্র খাঙ্গার
১০৬ হরেকৃষ্ণ কোঙার
১০৭ হরেন্দ্রনাথ দাস (মণ্ডল)
১০৮ হরিবোল চক্রবর্তী
১০৯ হরিদাস সাহা
১১০ হরিহর দত্ত
১১১ হরিপদ ব্যানার্জী
১১২ হরিপদ বসু
১১৩ হরিপদ ভট্টাচার্য
১১৪ হরিপদ চৌধুরী
১১৫ হরিপদ দে
১১৬ হেমচন্দ্র বক্সী
১১৭ হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১১৮ হেমচন্দ্র দত্ত
১১৯ হিমাংশু ভৌমিক
১২০ হীরামোহন চ্যাটার্জী
১২১ হৃদয় দাস (ফরিদপুর)
১২২. হৃদয় দাস (চট্টগ্রাম)
১২৩ হৃষীকেশ বসু
১২৪ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য
১২৫ হৃষীকেশ দত্ত
১২৬. ইন্দুভূষণ দাস
১২৭. জগদানন্দ মুখার্জী
১২৮ জগৎ বসু
১২৯ জগৎ রায়
১৩০ যামিনীকুমার দে
১৩১ যজ্ঞেশ্বর দাস
১৩২ জানকীনাথ দাস
১৩৩ যতীন্দ্র দে
১৩৪ জয়েশচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৩৫ জীবন গুহঠাকুরতা
১৩৬ জীবন মোল্লা
১৩৭ জীবেন্দ্রকুমার দাস
১৩৮ জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৩৯ জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৪০ জীতেন্দ্র মজুমদার
১৪১ জ্ঞানদাগোবিন্দ গুপ্ত
১৪২ যোগেন্দ্র চক্রবর্তী
১৪৩. যোগেন্দ্রমোহন গুহ
১৪৪ যোগেন্দ্র চক্রবর্তী
১৪৫ যোগেশচন্দ্র দাস
১৪৬. জ্যোতির্ময় রায়
১৪৭ জ্যোতিষ মজুমদার
১৪৮ কালাচাঁদ চক্রবর্তী
১৪৯ কালীমোহন ব্যানার্জী
১৫০ কালীপদ ভট্টাচার্য
১৫১ কালীকিংকর দে
১৫২ কালীপদ চক্রবর্তী
১৫৩ কালীপদ রায়
১৫৪ কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
১৫৫ কামাখ্যাচরণ ঘোষ
১৫৬ কমল শ্রীমানী

১৫৭. কামিনী দে
১৫৮. কার্তিক (পরেশ) চন্দ্র দে
১৫৯ কার্তিক সরকার
১৬০ কৌমুদীকান্ত ভট্টাচার্য
১৬১ কেশবলাল চ্যাটার্জী
১৬২. কেশব সমাজদার
১৬৩ কিরণ দে
১৬৪ কিরীটিভূষণ মজুমদার
১৬৫ খোকা (সুধীন্দ্র কুমার) রাও
১৬৬. কৃপানাথ দে
১৬৭ কৃষ্ণ বিশ্বাস
১৬৮. কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী
১৬৯ ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
১৭০ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়
১৭১. কুমুদ মুখার্জী
১৭২. কুমুদিনী ঘোষ
১৭৩ লোকনাথ বল
১৭৪. ললিত চক্রবর্তী
১৭৫. ললিতচন্দ্র রাহা
১৭৬. ললিত সিং
১৭৭. লালমোহন সেন
১৭৮. মদন রায়চৌধুরী
১৭৯. মধু ব্যানার্জী
১৮০ মধুসূদন দত্ত
১৮১. মহম্মদ ইব্রাহিম ওরফে তারাপদ
১৮২. মহেন্দ্র ভৌমিক
১৮৩. মহেশ বড়ুয়া
১৮৪. মাখন দে
১৮৫. মণিলাল দত্ত
১৮৬ মণি (রমনী) গাঙ্গুলী
১৮৭. মনীন্দ্রলাল চৌধুরী
১৮৮ মনীন্দ্রচন্দ্র সেন
১৮৯ মন্মথ দত্ত
১৯০ মনমোহন সাহা
১৯১. মনোরঞ্জন ব্যানার্জী
১৯২. মনোরঞ্জন চৌধুরী
১৯৩. মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
১৯৪. মথুরা নাথ দত্ত
১৯৫ মোহনলাল নাগ
১৯৬. মোহনকিশোর নামদাস
১৯৭. মোহিতমোহন মৈত্র
১৯৮ মোক্ষদারঞ্জন চক্রবর্তী
১৯৯ মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী
২০০. মুকুলরঞ্জন সেন
২০১. মুরারি গোস্বামী
২০২. নগেন দাসগুপ্ত
২০৩ নগেন্দ্র দেব
২০৪ নগেন্দ্রনাথ দেব
২০৫. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২০৬. নগেন মোদক
২০৭ নগেন্দ্রমোহন মুস্তাফি
২০৮ নলিনী দাস
২০৯. নলিনী সেনগুপ্ত
২১০. নন্দলাল দাশগুপ্ত
২১১. নন্দদুলাল সিং
২১২. ননীগোপাল দাস
২১৩. ননী দাশগুপ্ত
২১৪ ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়
২১৫. নরেন্দ্রনাথ দাস
২১৬. নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

২১৭. নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
২১৮. নেপাল সরকার
২১৯. নিবারণ চক্রবর্তী
২২০. নিরঞ্জন সেন
২২১. নীরেন্দ্র বড়ুয়া
২২২. নির্মলেন্দু গুহ
২২৩. নিশাকান্ত রায়চৌধুরী
২২৪. নিত্যরঞ্জন চৌধুরী
২২৫ নৃপেন্দ্র দত্তরায়
২২৬. পরেশচন্দ্র চৌধুরী
২২৭. পরেশচন্দ্র গুহ
২২৮. পরিমলচন্দ্র ঘোষ
২২৯. ফণীভূষণ দাশগুপ্ত
২৩০. ফণী নন্দী
২৩১. প্রবীরকুমার গোস্বামী
২৩২. প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস
২৩৩. প্রফুল্ল ভৌমিক
২৩৪. প্রফুল্লকুমার মজুমদার
২৩৫ প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল
২৩৬. প্রকাশচন্দ্র শেঠ
২৩৭. প্রাণগোপাল মুখার্জী
২৩৮ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী
২৩৯. প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী
২৪০. প্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত
২৪১ প্রভাসকুমার রায়
২৪২. প্রিয়দারঞ্জন চক্রবর্তী
২৪৩. প্রবোধকুমার রায়
২৪৪. প্রদ্যোত রায়চৌধুরী
২৪৫. প্রমোদরঞ্জন বসু
২৪৬. প্রভাকর বিরুণী
২৪৭. প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী
২৪৮. প্রভাতকুমার ঘোষ
২৪৯- প্রভাত মিত্র
২৫০. পূর্ণ গোস্বমী
২৫১. পূর্ণশেখর গুহ
২৫২. রবীন্দ্র ব্যানার্জী
২৫৩. রবীন্দ্রনাথ গুহরায়
২৫৪. রবীন্দ্রচন্দ্র নেগী
২৫৫. রাধাবল্লভ গোপ
২৫৬. রাধিকা দে (দাস)
২৫৭. রজনীকান্ত সরকার
২৫৮. রজতভূষণ দত্ত
২৫৯. রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২৬০. রাজমোহন করগুাই
২৬১. রাখালচন্দ্র দে
২৬২. রাখালদাস মল্লিক
২৬৩. রামচন্দ্র দাস
২৬৪. রামেন্দ্রনাথ সমাজদার
২৬৫. রমেশ চ্যাটার্জী
২৬৬. রমেশচন্দ্র (দাস) রায়
২৬৭. রামকৃষ্ণ (মণ্ডল) সরকার
২৬৮. রণধীর দাশগুপ্ত
২৬৯ রেবতীমোহন সাহা
২৭০. শচীন্দ্রচন্দ্র হোম
২৭১. শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত
২৭২. শচীন্দ্রনাথ মিত্র
২৭৩. শচীন্দ্র নন্দী
২৭৪. শৈলেশ দত্ত
২৭৫ সমাদীশ চন্দ্র বায়
২৭৬ সমাদীশ চন্দ্র রায়

২৭৭. সমরেন্দ্র ঘোষ
২৭৮. সনাতন রায়
২৭৯. শান্তিপদ চক্রবর্তী
২৮০ শান্তিগোপাল ঘোষ
২৮১ সন্তোষকুমার দত্ত
২৮২. সারদাপ্রসন্ন বসু
২৮৩. শরদিন্দু ভট্টাচার্য
২৮৪. শরৎধূপি দাস
২৮৫ সরোজকুমার বসু
২৮৬. সরোজ গুহ
২৮৭. সরোজ রায়
২৮৮. সরসীমোহন মৈত্র
২৮৯ শশীমোহন ভট্টাচার্য
২৯০. সতীশচন্দ্র বসু
২৯১ সতীশচন্দ্র পাকড়াশী
২৯২. সত্যব্রত চক্রবর্তী
২৯৩. সত্যরঞ্জন ঘোষ
২৯৪. সত্যেন্দ্রকুমার বসু
২৯৫. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
২৯৬. সিরাজুল হক
২৯৭ সহায়রাম দাস
২৯৮. শচীন চক্রবর্তী
২৯৯. শিতাংশু দত্তরায়
৩০০ শ্রীধর গোস্বামী
৩০১ সুবলচন্দ্র রায়
৩০২. সুবোধ চৌধুরী
৩০৩ সুবোধ রায়
৩০৪. সুধাংশু (বাসু) দাশগুপ্ত
৩০৫ সুধাংশু (মানু) দাশগুপ্ত
৩০৬. সুধাংশু দাশগুপ্ত (বাঁকুড়া)
৩০৭. সুধাংশু লাহিড়ী
৩০৮. সুধাংশু সেনগুপ্ত
৩০৯. সুখেন্দুচন্দ্র দাস
৩১০ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৩১১ সুধীন্দ্র রায়
৩১২ সুধীর ভট্টাচার্য
৩১৩ সুধীর চৌধুরী
৩১৪ সুধীরকুমার রায়
৩১৫ সুধীরকুমার সমাজদার
৩১৬ সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার
৩১৭ সুকুমার ঘোষ
৩১৮ সুকুমার সেনগুপ্ত
৩১৯. সুনীলকুমার চ্যাটার্জী
৩২০ সুনির্মল সেন
৩২১ সুরেন আচারি
৩২২ সুরেন বণিক
৩২৩. সুরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩২৪ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩২৫. সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী
৩২৬ সুরেন্দ্রমোহন কর রায়
২২৭ সুরেন সরখেল
৩২৮ সুরেশচন্দ্র দাস
৩২৯. সুশীলকুমার ব্যানার্জী
৩৩০ সুশীলকুমার চক্রবর্তী
৩৩১, সুশীল দাশগুপ্ত
৩৩২ সুশীলকুমার দে
৩৩৩. উমাশংকর কোনা
৩৩৪. উমেশ (ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য)
৩৩৫. উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৩৩৬. উপেন সাহা

৩৩৭. উষারঞ্জন দে

আসাম

১ বিনয় লস্কর
২. গোপেন রায়
৩ গৌরাঙ্গমোহন দাস
৪. মতিলাল রায়
৫. সত্যেন্দ্র রায়

মাদ্রাজ

১. প্রতিবাদী ভয়ংকর ভেঙ্কটচারী
২. টি সচ্চিদানন্দ শিবম

চ আন্দামানে নির্বাসিত মোপলা বিদ্রোহী (১৯২২-১৯২৪)

১. এন কে হাজী
২. কে কুঞ্জলাভী
৩ কে কে কুট্টী
৪. এ. সৈয়দালিপ্পা
৫. কে পি. কুঞ্জেনী
৬. এম. রেইন
৭ কে কুঞ্চারা
৮ সি আটহান
৯. ভি ভি. এ কুট্টি
১০. এম এ কুট্টি
১১ পি মোরাকর
১২. এম. আলাভি
১৩ পি কন্নামী
১৪. পি. কে. মোল্লা
১৫. এম. কুঞ্জায়াম্মু
১৬ পি. কে. এম. কুট্টি
১৭. পি আলাভি
১৮ এন. কুঞ্জিদু
১৯. এ পোকার
২০ এম. মরাক্কা
২১ সি কে. হাসান